পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ-রচনা

মীরা অধিকারী

পরিবেশক
সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

Parasuram & Trailokyanather Byanga-Rachana
By : MIRA ADHIKARI

প্রথম সংস্করণ, ১৩ই আশ্বিন, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক : শ্রীসাধন কুমার অধিকারী
২২/২সি, রাজা মণীন্দ্র রোড্
কলিকাতা-৩৭

মুদ্রাকর : শ্রীঅজিত কুমার সাবই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

করকমলেষু

ভূমিকা

অধ্যাপিকা শ্রীমতী মীরা অধিকারী এম, এ ডি-ফিল্ লিখিত এই গ্রন্থখানি ডি-ফিলের থিসিস হিসাবে রচিত হলেও একে থিসিস শ্রেণীর রচনা মনে করা উচিত হবে না। সাধারণ শিক্ষিত পাঠক কোন গ্রন্থকার সম্বন্ধে যে রকম আলোচনা প্রত্যাশা করে থাকেন এই শ্রেণীর রচনা। অর্থাৎ এ গ্রন্থের প্রেরণা আনন্দের মধ্যে তবে সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করা উচিত যে জ্ঞানের দিকটাকেও অগ্রাহ্য করা হয়নি, তবে তাকে মুখ্যতা না দিয়ে রসের গৌণ করে রেখে লেখিকা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। জ্ঞানের কথা পুরাতন হয়, রসের কথা চিরনূতন।

ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠতম ব্যঙ্গ সাহিত্যিক। কে আগে কে পিছে সেটা ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। তবে কাল হিসাবে ত্রৈলোক্যনাথ আগে বলেই তাঁর প্রভাব পরবর্তী কালের পরশুরামের উপরে সুপ্রচুর। দুজনের মধ্যে অগ্রজ, অনুজের সম্বন্ধ, কাউকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। এঁদের রচনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান দিক সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যাওয়ার আশঙ্কা।

বর্তমান গ্রন্থ সমগ্র আলোচনার প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড পরে প্রকাশিত হবে। খণ্ড প্রকাশে গ্রন্থের স্বাদহানি হয়নি, যেহেতু দুটি খণ্ডই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আশাকরি গ্রন্থখানি বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ পাঠকের সহানুভূতি লাভ করবে। এই ভূমিকার একটি প্রধান উদ্দেশ্য রচনাটির প্রতি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ও ছাত্রগণের দৃষ্টি আকর্ষণ।

কলিকাতা-৪৫ } শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

নিবেদন

সাহিত্য অনেকেই সৃষ্টি করেন, তবে সাহিত্যের জগতে এক একজন যেন বেশী ভাগ্যবান বলে মনে হয়। খ্যাতি আর, তারই সঙ্গে প্রতিপত্তি দুই-ই তারা সহজেই লাভ করেন। সাহিত্যিক স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে মানি। কিন্তু স্বীকৃতি মানেই পূজা নয়। বাঙালীর যে বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তাতে দেখি সে ভাবপ্রবণ। একবার সে যা নিয়ে মাতে তা' থেকে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারে না, চায়ও না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের সমালোচনা—প্রশস্তি। প্রশস্তির পরের পর্ব পূজা। এরই ফলে সব লেখকের মূল্য আমাদের কাছে সবসময় সমানভাবে ধরা পড়ে না। ফলে দীর্ঘদিন ধরে কেউ কেউ অপরিচিত, অজ্ঞাত থাকেন ইতিহাসের ধারার দীর্ঘ পরিসরে হয় একটা নাম হয়ে, নয়তো একটা stanzaর অধিকারী হয়ে মাত্র। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এমনই একটি স্বল্প-পরিচিত নাম।

আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী আগে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর লেখা শুরু করেন। কিন্তু যে যুগে তিনি লিখলেন সে যুগ তাঁর লেখার মূল্য দিল না। তাঁর লেখার সঙ্গে সহিতত্ব ঘটল না বাঙালী মনের। তাতে তাঁর খুব বেশী আক্ষেপ নেই। তবু বলি, সাহিত্যিক সমাজের ও সুধী সাহিত্য পাঠকের লেখকের প্রতি যথেষ্ট কর্তব্য আছে। দীর্ঘদিন পরে আজ আমরা ত্রৈলোক্যনাথ সম্বন্ধে কিছুটা আগ্রহী হয়েছি। হাস্যরস অথবা ব্যঙ্গ-সৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথ যে স্মরণীয়, এ কথা কেউ কেউ বলছেন। অবশ্য তাঁর স্থান যে কতটুকু, বা কি মানের কি পর্যায়ের তা' নিয়ে খুব বেশী ভাবা হয়নি। তবে তাঁর যে একটা স্থান আছে—এ স্বীকৃতি বহু দেরীতে এলেও যে এসেছে, তা' সবদিক থেকে আশার কথা।

আমার এই গ্রন্থে আমি ত্রৈলোক্যনাথকে যতটুকু অনুভব করেছি তাকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি মাত্র। আমরা সবাই জানি বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের আমদানী খুব বেশী দিনের নয়। আর হাস্যরসের অতি নিকট সঙ্গী ব্যঙ্গ, সুতরাং ব্যঙ্গও খুব বেশী দিনের নয়। ব্যঙ্গ উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য-মাধ্যম হলেও, অত্যুচ্চ শ্রেণীর কি না তা নিয়ে সংশয়ও আছে। সুতরাং ব্যঙ্গ-সাহিত্যকে যুগ কালের গণ্ডী পেরিয়ে এসে টিকে থাকতে হলে যথেষ্ট

বলিষ্ঠ হতে হবে। ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য দীর্ঘদিন অবজ্ঞাত থেকে আজ যে নতুন করে আমাদের ভাবাচ্ছে, রসাবেদন জাগাচ্ছে—এ থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাঁর লেখা যথেষ্ট শক্তির অধিকারী, কিন্তু দীর্ঘদিন আমরা তাঁকে যোগ্য স্থান দিইনি।

সে যা হোক, হাস্যরস ও ব্যঙ্গ স্রষ্টারূপে বাংলা সাহিত্যের জগতে ত্রৈলোক্যনাথকে আমরা নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থান দিতে পারি। তাঁর সাহিত্যে সে যুগ, তার ক্রটী-দুর্বলতা নিয়ে যেমন সহজ স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত, তেমনি এমনও অনেক দিক আছে যা' যুগ-কাল-উত্তীর্ণকারী। তাঁর সাহিত্যে কোন কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নেই। জীবনের জানালায় বসে জীবনকে দেখে, তারই পরে কল্পনার রং বুলিয়ে মার্জিত, শিক্ষিত পাঠকের জন্য তাঁর সাহিত্য নয়। অশিক্ষিত গ্রাম বাংলার অমার্জিত জীবনরূপ ত্রৈলোক্য-সাহিত্য। সর্বোপরি সেখানে পাই এক সহানুভূতিশীল শিল্পী-হৃদয়। ত্রৈলোক্যনাথের সব রচনাই যে উচ্চাঙ্গের এ কথা আমি বলছি না। কোন লেখকেরই সব লেখাই সমান শক্তির হয় না, ত্রৈলোক্যনাথেরও হয়নি। সে কাথাকে বাদ দিয়েই বলতে পারি যে তাঁর লেখার যে বৈঠকী আমেজ পাই, তা' কারও কাছ থেকে ধার করা নয়। হাল্‌কা চালে হাস্য ও ব্যঙ্গের দ্বিমুখী ধারায়, রূপক আর উদ্ভট কল্পনার সংশয়ময় পরিবেশে, সহজ ভাষায় ও সাদামাঠা চরিত্র রচনায় ত্রৈলোক্যনাথ সিদ্ধহস্ত। ব্যঙ্গ-সৃষ্টিতে তাঁর যে নিরাসক্ত মনটি পাই তাই-ই তাঁর সাহিত্যে খাঁটি ব্যঙ্গরসের যোগান দিয়েছে। "ডমরু-চরিত" বাংলা সাহিত্যে এমন এক পূর্ণাঙ্গ চরিত যাকে আগেও দেখিনি, পরেও দেখিনি। বিপদে-সম্পদে, লাভে-লোকসানে, সুখে-দুঃখে, পাপে-পুণ্যে, সবলতায়-দুর্বলতায়—এমন নির্বিকার, সহজ, সাবলীল ও চিত্তহরণকারী দৃঢ়চরিত্র সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ। মিথ্যাভাষণ, চুরি, লোভ, লালসা,—এ সবের মধ্যে থেকেও সে আমাদের ভালবাসা হারায় না। ত্রৈলোক্যনাথ এই চরিত্র সৃষ্টি করে হাস্য ও ব্যঙ্গের জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করে নিয়েছেন, তাঁকে স্থানচ্যুত করা সম্ভব নয়।

এটি একটি গবেষণা গ্রন্থ। প্রথম খণ্ডে ত্রৈলোক্যনাথ ও দ্বিতীয় খণ্ডে পরশুরাম ব্যঙ্গশিল্পীরূপে আলোচিত হয়েছে। এই খণ্ডে ত্রৈলোক্যনাথের জীবন ও সাহিত্য এবং এই প্রসঙ্গে কেদারনাথ ও প্রভাতকুমারের উপর তাঁর প্রভাবকে দেখিয়েছি, দ্বিতীয় খণ্ডে দীর্ঘদিন পরে আধুনিক কালের ব্যঙ্গ-শিল্পী

পরশুরামের সৃষ্টিতেও সে প্রভাব কতদূর প্রসারিত তা' তাঁর জীবন ও সাহিত্য আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে। আমার সাধ্যমত আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করতে চেষ্টা করেছি। কতটুকু সে চেষ্টা সফল হয়েছে, তা' পাঠকের বিচার সাপেক্ষ। এই কাজে যাঁরা আমাকে সাহায্য দান করেছেন তাঁদের সকলের জন্য রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

মীরা অধিকারী

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

ত্রৈ লো ক্য না থ

ব্যঙ্গ-রচনা ও তার মূলপ্রেরণা

চলমান জগতে কেবলই চলেছে রূপবদলের পালা। এক যায় আর এক আসে। এই আসা-যাওয়ার অন্তবর্তীকালটা বড় দুঃসময়। সাহিত্যের জগতেও এই পরিবর্তন আসে। সাহিত্যের জগতে এক একটা সময় দেখা দেয় যাকে আমরা বলতে পারি creative যুগ। এই যুগের সাহিত্য নানাভাবে নানারূপে উৎকর্ষ লাভ করে। ফসলে ফসলে ভরে ওঠে চারিধার। এই যুগেই জন্মগ্রহণ করেন বড় বড় কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকারের দল। এ যুগ সমৃদ্ধির যুগ, স্থিরতার যুগ, আশার যুগ, বিশ্বাসের যুগ। এই আত্মপ্রত্যয়ী যুগেই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। বাংলা সাহিত্যের অষ্টাদশ শতাব্দী এমনি একটি সময়। তারপরে আধুনিক যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দী প্রাচীন (মধ্য) আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ এবং সে হিসাবে সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের পক্ষে দুঃসময়। এ দুঃসময় প্রত্যেক দেশের সাহিত্য জগতেই দেখা দেয়। ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল এই রকম একটি যুগ। প্রকৃতির নিয়মচক্রেই এ দুঃসময়ের পদধ্বনি। এ যুগটা সংশয়ের যুগ, নাস্তিক্যের যুগ। একে আমরা বলতে পারি critical যুগ। এই critical যুগেই রচিত হয় ব্যঙ্গসাহিত্য। অর্থাৎ এই যুগই ব্যঙ্গ-রচনার পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল। এ যুগে অন্য সাহিত্য সৃষ্টি যে না হয়, এ কথা বলছি না, তবে ব্যঙ্গই এ যুগের প্রধানতম শিল্প। মানুষের সমাজে এমন এক একটা যুগ আসে, ব্যঙ্গ-রচনার পক্ষে যা একান্তভাবে উপযোগী। আমাদের দেশেও অষ্টাদশ শতাব্দীও এইরকম একটি কাল। এই যুগেই অন্যতম ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক ভারতচন্দ্রকে আমরা পেয়েছি। ইউরোপে তেমনিই ভলটেয়ার, সুইফ্‌ট্। এইরকম এক critical যুগেরই কবি, পোপ, ড্রাইডেন। "সাধারণত দেখা যায় যে কোন মহৎ আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত যুগের অবসান কালই ব্যঙ্গের প্রাদুর্ভাবের সময়। রেনেসাঁসের স্তিমিত প্রভাবের যুগে ভলটেয়ার, বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মাদনার পরে বিদ্যাসুন্দর, (যা) রাধাকৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন স্যাটায়ার মাত্র।"[১] তেমনি

১। বাংলার লেখক—প্রমথনাথ বিশী।

বঙ্কিমচন্দ্রের মহৎ সৃষ্টির পরে ত্রৈলোক্যনাথের আবির্ভাব এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ী সৃষ্টির অধিকাংশ ফসল ঘরে উঠবার পরে পরশুরামের আবির্ভাব।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগপ্রভাব যেমন একটা দিক, ঠিক তেমনি অপর দিকটি হচ্ছে বিশিষ্ট ব্যক্তিপ্রভাব। বিশিষ্ট ব্যক্তিপ্রভাব বলতে আমরা বিশিষ্ট কবিমানসকেই বুঝি। নিরবচ্ছিন্ন ভাল বা নিরবচ্ছিন্ন মন্দ সংসারে নেই। মানুষ ভাল ও মন্দের মিশ্রণে সৃষ্ট জীব। সে শুধু ভালও নয়, আবার শুধু মন্দও নয়। তাই তার কার্যকলাপেও এই দুই এর প্রকাশ সূচিত হয়। তবে এক একটা বিশেষ যুগে এসে মানুষ যখন তার আদর্শের সুউচ্চ শিখর থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে তখন তার জীবনেও মন্দের প্রভাব বেশী হয়ে পড়ে। সব সময় এই অশুভ হাওয়া না বইলেও কখন কখন যে আসে তা আমরা দেখেছি। যাঁরা কবি, সাহিত্যিক তাঁরাও এই ভাল-মন্দ আবহাওয়ার মধ্যে থেকেই তাঁদের সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন। এক একজন সাহিত্যিক এমনই আছেন যাঁরা সংসারের এই দুটো দিককেই সমানভাবে দেখেন। তাঁরা শিল্পী হিসাবে, সুন্দর ও অসুন্দরকে সমান চোখে দেখেন। এঁদের শক্তি ও সাধনা অতি দুর্লভ। এটা তাঁদের পক্ষে যেমন সৌভাগ্যের কারণ তেমনি আমাদের পক্ষেও। এইরূপ অনন্ত প্রতিভাধর হলেন সেক্সপীয়ার। সকলে এভাবে সংসারের শুভ-অশুভকে সমানভাবে দেখতে পারেন না। অনেকের চোখে শুধুই জগতের কল্যাণরূপই প্রতিভাত হয়। তাঁরা এই কল্যাণরূপের সাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জমান থেকে আর কিছু দেখবার বা খুঁজবার অবসর পান না। এঁরা রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতনের অন্বেষণ করতে করতেই সমস্ত জীবন শেষ করে দেন। তাই তাঁদের সৃষ্টি হয় সুন্দরের, প্রেমের, আনন্দেরই জয়গাথা। এই দলে হলেন রবীন্দ্রনাথ, গ্যেটে, শেলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে ব্যঙ্গ সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেননি এমন নয়, কিন্তু তা' সার্থক হয়নি। যুগধর্ম বা ব্যক্তিমানস কোনটিই যে সে সৃষ্টির অনুকূল নয়। তাই স্বভাবগতভাবেই ব্যর্থতা এসেছে। কিন্তু আর এক ধরনের ব্যক্তি মানস প্রত্যক্ষ করা যায় যা জগতের প্রধানত অসুন্দর রূপকেই প্রত্যক্ষ করে। মানবের অকল্যাণী মূর্তিতে এই শ্রেণীর সাহিত্যিক আতঙ্কিত, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের সেই আতঙ্ক, ক্ষিপ্ততা, জ্বালাই ব্যঙ্গের জন্ম দেয়। নিজ নিজ শক্তির প্রভাবে ক্রোধ বা জ্বালার তেজটুকু সরসতার আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখে, ব্যঙ্গ-শিল্পী অসুন্দরের প্রতিকারে আত্মনিয়োগ করেন। এদিক থেকে

ভাবলে তাঁদেরও সুন্দরের পূজারী বলা চলে। তাঁরা অসুন্দরের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে সুন্দরেরই আরতি করেন। এই শ্রেণীতেই পড়েন ভলটেয়ার। তাঁর ব্যঙ্গাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তৎকালীন ধর্মান্ধতা ও বুদ্ধিমূঢ়তার বিরুদ্ধে। তিনি বুঝেছিলেন ধর্মান্ধতা ও মূঢ়বুদ্ধিতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ শত্রু। ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের ব্যক্তিমানস এমনভাবে গঠিত যে তাঁদের ব্যঙ্গ-শিল্পী না হয়ে উপায় নেই।

এখন বোঝা গেল যে ব্যঙ্গ একটি বিশেষ যুগে, বিশেষ ব্যক্তিমানস দ্বারাই সৃষ্ট হওয়া সম্ভব। কেননা ব্যঙ্গ-শিল্পী নিছক শিল্প সৃষ্টির আনন্দময় প্রেরণাতেই সাহিত্য রচনা করেন না, তাঁদের যে বড় দায়। মানুষকে ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের কামনা। তাই কোনরূপ অনাচার, অত্যাচার, ভণ্ডামি বা মিথ্যাকে দেখলেই তাকে যে দূর করে দেওয়ার জন্যে তাঁরা অন্তরে অন্তরে অস্থির হয়ে ওঠেন। তাঁরা এ পৃথিবীকে নিষ্কলঙ্ক, সুন্দর করে তুলতে চান। পৃথিবীর ক্লেদ, গ্লানিতে তাঁদের চিত্ত ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু রোমান্টিক লেখক বা কবির মতো তাঁরা এই ধুলামাটির পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে কোন কল্পনার লীলাময় লোকে উধাও হতে চান না, অথবা কোন মিস্টিক চেতনা দিয়ে জগৎ ও সংসারকে দেখতে পারেন না। তাঁরা যেন বড্ড বেশী স্থূল। হোক স্থূল, তবু তাঁরা মানবহিতার্থী, মানবদরদী। শুধু অকারণ পুলকে গান গাওয়া তাঁদের হয় না। কেননা ব্যঙ্গ-শিল্পীগণ তাঁদের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। হৃদয় বা emotion-এর প্রাধান্য না দিয়ে তাঁরা বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রাখেন। বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেন বলে যে তাঁদের রচনা নীরস, তা নয়। হাস্যরসই তাঁদের রচনার মুখ্যতম রস। ব্যঙ্গ যে হাস্যরস বিতরণ করে তা থেকে আমরা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করি। তবে হাসতে হাসতে, আনন্দ পেতে পেতে, আমরা হঠাৎ থেমে যাই, ব্যঙ্গ-দর্পণের বুকের পরে যেন আমাদেরই নানারূপ অসঙ্গতির ছবি ফুটে ওঠে। এ ঠিক সুখ অনুভবের মায়াময় ক্ষণটিতে হঠাৎ দুঃখ অনুভব। সে যাই হোক, ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য হলেও, তা' আমাদের যেমন ভাবায়, তেমনি হাসায়, আনন্দ দেয়।

তবে এই আনন্দদানের সঙ্গে আর অন্যান্য সাহিত্যের আনন্দদানের রীতি আলাদা। ব্যঙ্গ-রচনার থেকে আমরা যে আনন্দ পাই তা' আমাদের মনকে কোন সৌন্দর্যের অলকাপুরীর দ্বারে পৌঁছে দেয় না, অথবা কোন ঊর্ধ্বতম

সত্যলোকের পথ দেখিয়ে বিশ্বসত্তার সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে না। সাহিত্যের জগতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্যে হলেও আমরা আমাদের বদ্ধ-সত্তার মুক্তি দিতে পারি। এমন এক জগতে মুক্তি দিতে পারি যেখানে দ্বেষ, হিংসা, লাভক্ষতির টানাটানি নেই। কবির কবিতা আমাদের মনের যে উদার প্রসন্নতা, যে মুক্ত-আনন্দ এনে দেয় তা' ব্যঙ্গ কখনই পারে না। ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক কেবল যা আছে তাই-ই দেখান, যা নেই তা দেখাতে যান না। ব্যঙ্গ-রচনার উদ্দেশ্যমূলকতার দিকটিই ব্যঙ্গকে সীমায়িত করে রেখেছে। এটা একাধারে যেমন তার গুণ, তেমনি তার সীমাও। আমাদের কর্ম যখন কর্তব্যের প্রাচীর বেষ্টিত হয় তখন তাতে সুবিধা অনেক থাকলেও আনন্দের ধারটা ভোঁতা হয়ে আসে। ব্যঙ্গ-শিল্পীও তেমনি কাউকে হাস্যকর করে তুলতে, তার ভুল-ভণ্ডামিগুলোকে প্রকাশ করে দিতে—জনসমাজের চোখের সামনে এই নগ্ন-প্রকাশের মধ্যে দিয়েই তাকে শিক্ষা দিতে এগিয়ে যান। উদ্দেশ্য স্পষ্ট; তাই তাঁর পথও সোজা। একটা বলতে গিয়ে আর একটা বলার তাঁর উপায় নেই। নির্দিষ্ট পথে, নির্দিষ্ট গতিতে স্থির লক্ষ্যে তিনি অতি সহজে পৌঁছান। তাই ব্যঙ্গসাহিত্যের আনন্দও সুনির্দিষ্ট। বাঁধনহারা গতিতে ভেসে চলার তাঁর কোন উপায়ও নেই। তিনি তা চানও না। ব্যঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টির দিক থেকে ও আনন্দদানের দিক থেকে দেখতে গেলে ব্যঙ্গ অত্যুচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য হলেও আমরা কোনমতেই তাকে উচ্চতম শ্রেণীর সাহিত্য বলতে পারি না।

ব্যঙ্গকে আমরা ইচ্ছে করলে প্রচারমূলক সাহিত্যও বলতে পারি। প্রচার কথাটা সঙ্কীর্ণভাবে কিম্বা কোন অবজ্ঞার্থে প্রয়োগ করতে চাইনি। প্রচার শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে এমন কতগুলো মনোভাব জেগে ওঠে যার মধ্যে অহমিকা, অহংকার, কখনও বা মিথ্যা, অতিরঞ্জন ইত্যাদি জড়িয়ে থেকে যায়। কিন্তু এখানে প্রচারকে ঐরূপ অর্থে দেখাতে চাইনি। ব্যঙ্গের বিষয়ই হচ্ছে সকল প্রকার সামাজিক অনাচার অব্যবস্থা কিম্বা ব্যবসায়িক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক প্রবঞ্চনা বা যে কোন রকমের ভণ্ডামিকে (Hypocracy) আক্রমণ করা। তাই এ যে একপ্রকার প্রচার তাতে সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন জাগে প্রচার কেমন করে সাহিত্যিক মহিমায় মণ্ডিত হ'ল। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। সাহিত্যিকের শক্তিতেই প্রচার প্রচারের সীমা ছাড়িয়ে রসের সীমায় পৌঁছে যায়। এইখানেই তাঁর প্রতিভার প্রকাশ। সাধারণের হাতে পড়লে যা শুধুই **Propaganda** হ'ত শক্তিধর সাহিত্যিকের

মায়াযাদু স্পর্শে তাই-ই হয়ে ওঠে রসপরিপূর্ণ। এই রসময়তায় ব্যঙ্গ সার্থক হ'য়ে ওঠে। তীব্রভাবে আক্রমণ করাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে সেই আক্রমণাত্মক মনের ভাবটিকে সামনে রেখে কৌতুক, রঙ্গ ব্যঙ্গ করার রীতিটি কম শিল্পকৃতিত্ব নয়। দোষীকে দোষী বলব, অথচ তাকেও রাগতে দেবো না, নিজেও রাগবো না, অতি সুচারুভাবে কার্যটি সম্পন্ন করতে হবে। ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক অতি সতর্কভাবে এই প্রচার কার্যে অগ্রসর হন। তিনি উদ্দেশ্য সিদ্ধও করেন, আবার রস সৃষ্টিও করেন। এ প্রচার নিন্দার্হ নয়, প্রশংসার্হ। এ প্রচার কল্যাণ আনে, শুভের প্রতিষ্ঠা করে।

ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যমূলকতা, ব্যঙ্গের প্রচার-ধর্মীতা, সীমা, সমস্ত কিছু সম্বন্ধেই ব্যঙ্গ-শিল্পী সচেতন। তিনি তাঁর ন্যূনতাকে বোঝেন, জানেন। একে তিনি অগৌরবের মনে করেন না। কেননা নিজের জন্যে তো তাঁর ভাবনা নয়। তাঁর ভাবনা যে সকলকে নিয়ে। সকলের কিঞ্চিৎ মঙ্গলসাধনেই যে তাঁর সকল সাধনার সিদ্ধি। প্রত্যেক সৎ সাহিত্যেরই একটা না একটা মূল্যবান বাণী থাকে। আর সে বাণী মানবকল্যাণমূলক। তবু অন্য সাহিত্যের সঙ্গে ব্যঙ্গের পার্থক্য এইখানে যে অন্য সাহিত্য যেখানে তার সুনির্দিষ্ট বাণীকে অতি সংগোপনে রেখে ছবির পরে ছবি, বর্ণনার পরে বর্ণনা দিয়ে ভাবের থেকে ভাবনার দিকে পদচারণা করে জীবনসত্যের মর্মমূলে স্থিতি লাভ করে, ব্যঙ্গ সেরূপ করে না। ব্যঙ্গ ঐ রেখেঢেকে চলবার ধার ধারে না। মানুষকে সংশোধন করে, তাকে ত্রুটি, দুর্বলতা, ভণ্ডামি থেকে মুক্ত করে, তার আদর্শ পথটিকে দেখিয়ে দেওয়াই যে তার কাজ। মূলতঃ ব্যঙ্গ-শিল্পী বিরাট কর্মী। কিন্তু কর্মের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে বলেই বোধহয় তাঁরা শিল্প-মাধ্যম খুঁজে নেন। পৃথিবীর ব্যঙ্গ-শিল্পীদের জীবনী দেখলে এর সত্যতা নিরূপিত হয়ে যায়। আমাদের আলোচ্য লেখক ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম উভয়েই ব্যক্তিজীবনে কর্মীপুরুষ ছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের ও পরশুরামের জীবনী-প্রসঙ্গে তাঁদের চরিত্রের এই কর্মময়তার দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু কর্মজগতে থেকেও তাঁদের যেন মনে হয়েছে যতটুকু করা দরকার তার অতি অল্পই যেন করা হয়েছে। তাই তাঁরা কর্মের পরিপূরকরূপে শিল্প মাধ্যমকে বেছে নিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম উভয়েরই সাহিত্যজগতে আবির্ভাব আকস্মিক। শারীরিক অক্ষমতা বা অসুস্থতার জন্যে বাইরের কাজে যোগ দেওয়া যখন সম্ভব হল না, তখনই ত্রৈলোক্যনাথ সাহিত্য

মাধ্যমকে বেছে নিলেন। পরশুরাম অবশ্য কাজ করতে করতেই মানব-স্বভাবের এমন সব দিকগুলোকে দিনের পর দিন দেখতে পেলেন, যেগুলোর অকিঞ্চিৎকরতা, অসঙ্গতি, ভ্রান্তি তাঁকে বিচলিত করে তুলতে লাগলো। বাধ্য হয়েই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাই তাঁর কর্মীসত্তার শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আসলে "ব্যঙ্গ-শিল্প সাহিত্যিকের কর্মশক্তিরই যেন একটা প্রক্ষেপ।"[২]

ব্যঙ্গ-শিল্পীগণ জানেন যা ব্যঙ্গের যোগ্য তৎপ্রতি ব্যঙ্গ প্রযুক্ত হওয়াতে অনিষ্ট নেই, বরং ইষ্ট আছে। তাই তাঁরা যেখানেই দুর্নীতি, অনাচার, দেখতে পেয়েছেন সেখানেই ব্যঙ্গ-বাণ নিক্ষেপ করেছেন। তাঁরা মানব-দরদী। মানুষের প্রতি ভালবাসাই তাঁদের কখন নির্মম করে তোলে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাঁরা বুঝি হৃদয়হীন। মানুষের দোষগুলোকে, অসঙ্গতিগুলোকে তাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করেন। আর ব্যঙ্গের-শাসনে নিপীড়িত করেন। মানুষের ত্রুটীতে তাঁদের হাসিকে অমানবিক বলে মনে হতে পারে। ব্যঙ্গ-শিল্পীদের যে নিষ্ঠুর হতেই হয়। Emotion-এর প্রাধান্য দিতে গেলে তাঁদের চলে না। স্নেহাধিক্যজাত অন্ধতা থেকে ব্যঙ্গ-শিল্পীকে মুক্ত হতে হয়, তাদের শাসন যে সোহাগেরই অপর পিঠ। তাঁদের ভালবাসা মোহমুক্ত। এজন্যই তো তাঁরা ব্যঙ্গ করতে পারেন।

ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষ প্রসূত হয়। তবে এ বিদ্বেষ যদি ব্যক্তিগত হয় তবে তা নিন্দার যোগ্য। কিন্তু যদি সমষ্টিগত হয়, তবে তা' আমাদের দুঃখ দিলেও, প্রতিবাদের কিছু নেই। কেননা দুঃখ দিয়েই হয়তো এ ধরনের ব্যঙ্গ আমাদের সমগ্র চেতনাকে জাগাতে চায়।

ব্যঙ্গের ভাষার প্রধান সম্পদ ঋজুতা। একমাত্র ভাষার ঋজুতাই বক্তব্যের ধারাকে তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট করে তুলতে পারে। নিরলঙ্কারতাই এ ভাষার প্রধান অলংকার। ভাবপ্রকাশের সুবিধার্থে যে উপমা প্রয়োগ করা হয় তা' হয় ঘনিষ্ঠভাবে বাস্তবনিষ্ঠ। বাস্তবনিষ্ঠ হলেও এ ধরনের উপমায় কোন চরিত্র বা পরিবেশ অনেকখানিই আলোকিত হয়ে ওঠে। শব্দ প্রয়োগের দিক থেকেও ঐ একই কথা আসে। সহজ সরল শব্দ প্রয়োগই ব্যঙ্গকে অধিকতর স্বচ্ছ করে তোলে। তা' ছাড়া উদ্দেশ্য যেখানে স্পষ্ট, ভাষার জন্যে তো সেখানে

২। বাংলার লেখক—প্রমথনাথ বিশী।

ভাবনাই নেই। ভাবের ইঙ্গিতে ভৃত্যবৎ ভাষার আগমন ঘটবেই। যদি তা না হয় তা হলে ব্যঙ্গের তীব্রতা যে মাঝপথেই অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়।

ভাব ও ভাষার মধ্যে একটা আত্মিক যোগাযোগ রয়েছে। ভাবের ঋজুতা ভাষার ঋজুতা এনে দেয়। তাই এই দুইয়ের পুষ্টির জন্যে ব্যঙ্গ-শিল্পীর থাকা চাই প্রচণ্ড পর্যবেক্ষণ শক্তি। এই পর্যবেক্ষণশক্তি-প্রভাবেই ব্যঙ্গ-শিল্পী একই যুগে, একই সমতলে দাঁড়িয়ে সেই যুগের দোষ, ক্রুটী, দুর্বলতাগুলোকে অতি স্পষ্ট করেই দেখতে পান। শুধু সেই যুগের দুর্বলতা নয় সর্বকালের, সর্বযুগের দুর্বলতাকে নিয়েও ব্যঙ্গ-শিল্পী ব্যঙ্গ করতে পারেন এবং নির্মল হাস্যরস বিতরণ করতে পারেন। যেমন পরশুরাম তাঁর "ভুশণ্ডীর মাঠে"-তে শিবুকে ও নিত্যকালীকে নিয়ে এবং তাদের তিন জন্মের স্ত্রী ও স্বামীকে নিয়ে লীলাখেলা দেখিয়েছেন। ব্যবসায়িক অসাধু শ্যামানন্দ বা গণ্ডেরিরাম তো আমাদেরই চারপাশে রয়েছে কিন্তু তাদের তো আমরা এতদিন এমন করে দেখিনি। পরশুরাম যেমন নিখুঁত করে আমাদের মর্মে মর্মে তাদের এঁকে দিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যেও এই পর্যবেক্ষণশক্তি সুতীব্রভাবে দেখা যায়। তাই তিনি ডমরুধরকে, নয়নচাঁদকে এমন স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছিলেন। ব্যঙ্গ-শিল্পী তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি জগতের প্রতি উন্মুখ করে রাখেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণ নিপুণ শিল্পীর। কাদা জলে ভাসমান চরিত্র-গুলোকে ঠিক যেমন তাঁরা দেখেন তেমনিভাবেই সাহিত্যজগতে প্রবেশাধিকার দেন। পরিমার্জনের কোন চেষ্টা করেন না। তাই চরিত্রগুলোর সর্বাঙ্গে জলের সঙ্গে সঙ্গে কাদার ছিটও লেগে থাকে। সযত্নে সেই কর্দমাক্ত স্থানগুলি ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার করে দেন না। ব্যঙ্গের আঘাতে ঐ কর্দমকে মুছিয়ে দেওয়াই যে তাঁর লক্ষ্য। সুতরাং ব্যঙ্গ যে বহুলাংশেই পর্যবেক্ষণশক্তি-নির্ভর এ সত্য অনস্বীকার্য। যাঁর যতখানি এই শক্তি আছে তিনি ততখানি ব্যঙ্গ সৃষ্টিতে সার্থক।

পর্যবেক্ষণ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ-শিল্পীর প্রচুর কল্পনাশক্তিও থাকা দরকার। অন্যান্য শিল্পসৃষ্টির মত ব্যঙ্গও অনেকাংশে কল্পনানির্ভর। "সত্য কথা বলিতে কি, অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-শিল্পী উচুদরের কবিও বটে। যেমন মলিয়ের, অ্যারিস্টফেনিস, হায়নে।"[৩] উচ্চ কল্পনাই আমাদের মনকে একটা

৩। বাংলার লেখক—প্রমথনাথ বিশী।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে পারে। কল্পনা ছাড়া কোন কিছুর চূড়ান্ত শেষ নির্ণয় করা যায় না। চোখের দেখার একটা সীমা আছে। এই সীমার রেখাকে অতিক্রম করতে হলেই চাই কল্পনা। কল্পনার দীনতা ব্যঙ্গকে কিছুটা ফিকে করে দিতে পারে। তাই শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গের বাস্তবনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনানিষ্ঠ হওয়াও একান্ত বাঞ্ছনীয়। জীবনের গভীরতর কোন সত্যের সন্ধান এই কল্পনাই এনে দিতে পারে। কবিতাতেও যেমন আমরা সেই সত্যকে পেতে পারি, ব্যঙ্গতেও পাই। জীবনতত্ত্ব বা জীবনসত্য বা জীবনের সমালোচনা যেমন কবিতায় আছে তেমনি ব্যঙ্গতেও আছে। কবির মত ব্যঙ্গ-শিল্পীও নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টিতে জীবন ও জগত দেখেন, সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, জীবন-মৃত্যু—সব কিছুকেই সমমূল্যে বিচার করেন। তবে কবিতাও ব্যঙ্গ এক স্তরের সৃষ্টি নয়, একটি কালজয়ী অপরটি কালবদ্ধ। তবে ব্যঙ্গশিল্পী যত বেশী কল্পনাশক্তিপ্রবণ হবেন ততই তার শিল্প যুগের গণ্ডী পেরিয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা সুইফ্‌ট-এর লেখা Gulliver's Travels-এর নাম করতে পারি। সুইফ্‌ট-এর এই সৃষ্টি বহু যুগ পার হয়ে এসেও আজও আমাদের কাছে সমান আবেদনধর্মী। রূপক রচনার আড়ালে মানব মনের অহং ভাবকেই যেন ব্যঙ্গ করে গেছেন শিল্পী। সুতরাং বলতে আর দ্বিধা থাকে না যে কথনও কথনও কবি ও ব্যঙ্গ-শিল্পী উচ্চ কল্পনাশক্তির প্রভাবেই সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠেন, আবার কথনও বা কবি ও ব্যঙ্গ-শিল্পী যেন একাত্ম হয়ে একের মধ্যে অপরজন একই সঙ্গে মিশে যান। এই একাত্ম হওয়া বা সমপর্যায়ভুক্ত হওয়া সবই সুউচ্চ কল্পনাশক্তিরই ফল।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবনকথা

"ব্যঙ্গ-শিল্প সাহিত্যিকের কর্ম শক্তিরই যেন একটা প্রক্ষেপ।" তাই আমি মনে করি কোন সাহিত্যিকের ব্যঙ্গ-রচনার আলোচনা, ব্যক্তি জীবনের পটভূমি-বহির্ভূত হলে তা' কিছুটা খণ্ডিত তথা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে। কোন্ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, কোন্ ব্যথা-হত হৃদয়ের হাহাকার—উত্থান-পতনপূর্ণ জীবনকথা কেমন করে যে লেখককে অস্থির করে তুলে এক বিশেষ মানসিকতার মধ্যে দিয়ে কর্মের দীক্ষা দেয় এবং কর্মের স্বভাবগত সীমাবদ্ধতাই শেষ পর্যন্ত শিল্পীকে লেখনীর আশ্রয় নিতে বাধ্য করে তা পাঠকের জানা দরকার। প্রত্যেক ব্যঙ্গ-শিল্পীর শিল্পজীবনের সাথে সাথে ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা উচিত। এ প্রসঙ্গে ব্যঙ্গশিল্পী ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য-পরিচয় প্রদানকালে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য। "কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।"—"গুরুতর লাভ" যে ঘটেই এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনে ও বিশুদ্ধ শিল্পজীবনের কর্মের মধ্যে শত বাধা দেখা দিয়েছে। তাই তাঁকে হাস্যরসিকের ক্ষেত্রে অবতরণ করতে হয়েছে, ছদ্মাবরণ নিতে হয়েছে "কমলাকান্তে"। উদ্দেশ্য দেশের জাতির জন্যে কিছু করা, যে কথা জাতির কানে বলি বলি করেও বলা হয়ে ওঠেনি তাকেই প্রকাশ করা। এ কর্মের মর্মমূলে হৃদয় আর বুদ্ধি একই সঙ্গে কাজ করে চলে। এক স্থানে তিনি বলেছেন, "যদি এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন।" তাঁর নিজের সৃষ্টিতেই এ-উক্তির সত্যতা বহুল পরিমাণে রয়েছে তা আর কাউকে দেখিয়ে দিতে হবে না। আমার আলোচ্য লেখকদ্বয়ের লেখার সর্বাঙ্গেই ঐ সত্য-নিহিত। নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তাঁরা তুষ্ট নন। তাঁরা কর্মী। একটা কিছু করতে হবে। ত্রৈলোক্যনাথের তো প্রায় সারা জীবনই কেটে গেল। চাকুরী থেকেও অবসর গ্রহণ করেছেন। নিঃশেষিত অন্তর, অবসন্ন দেহ। দেহের শক্তি যখন অবসিত প্রায়, অথচ অসমাপ্ত কর্মভার সম্পন্ন করবার তাগিদ পুরোমাত্রায় জাগ্রত—সেই পরম ক্ষণেই তাঁকে লেখার আশ্রয় নিতে

হয়েছে। পরশুরাম অবশ্য কিছু আগেই সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেছেন, তবে তা সুপক্ক হতে জীবনের শেষ দিন এসে গেছে। জীবনের পদে পদে যে দুঃখ-লাঞ্ছনা, অসঙ্গতি-বেদনা, অভাব-অনটনকে চিনেছেন তাকে দূর করার জন্যে কিছু করা দরকার—এই প্রয়োজনবোধই তাঁদের লেখকের ভূমিকায় নামিয়েছে। "দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন" করবার জন্যেই ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যঙ্গশিল্পী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। পুনরায় বলতে হয়, কেমন করে বা কোথা থেকে এই সঙ্কল্প গ্রহণের বাসনা তিল তিল করে তাঁদের প্রাণিত করেছে তা' বুঝতে হলেই তাঁদের জীবনী আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেননা, ব্যঙ্গশিল্পীর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবন একটি অপরটির পরিপূরক, অতি সঙ্গতভাবেই একটি অপরটির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

চারিদিকের অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে পরিপুষ্ট হয়ে নিটোলত্ব লাভ করার মধ্যে সৌন্দর্য থাকলেও বিস্ময় কোথাও নেই। ত্রৈলোক্যনাথের জীবনকাহিনী একাধারে সৌন্দর্য ও বিস্ময়। কেননা একান্ত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনধারাটি বয়ে চলেছে, তবু সেই প্রতিকূলতার আঘাত কখনও সেই ধারাটিকে ভেঙ্গে চুরে একাকার করে ফেলতে পারেনি। সারাটি জীবনে তিনি এক অবিচ্ছিন্ন দৃঢ় গতিকে ধরে রাখতে চেয়েছেন। কোনকিছুই তাঁকে ছন্দহীন, গতিহীন করতে পারে নি। তাই তাঁর জীবন যে একই সঙ্গে বিস্ময় ও সৌন্দর্যের আধার তা'তে আর সন্দেহ কোথায়? তবে তাঁর জীবনের এই সৌন্দর্য ও বিস্ময়ের কথা জানার আগে তাঁর বংশধারার কিছু পরিচয় জানা দরকার মনে হয়।

মুখোপাধ্যায় পরিবারের আদি বাসভূমি চব্বিশ পরগণার শ্যামনগরের রাহুতা গ্রামে।[১] ইহারা খড়দার মুকুটী, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান। ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়ের চার পুত্র ও এক কন্যা। চারপুত্রের নাম যথাক্রমে জয়নারায়ণ, উদয়নারায়ণ, রামনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ। উদয়নারায়ণের একমাত্র পুত্র-সন্তান, নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। এই বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়েরই দ্বিতীয় পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ত্রৈলোক্যনাথের ছয় ভাই—রঙ্গলাল, ত্রৈলোক্যনাথ, মহেন্দ্রনাথ, শ্যামলাল, হরিমোহন, রাজেন্দ্রনাথ।

১। পরিশিষ্ট. ত্রিকুলমুকুর।

ছোট ভাই রাজেন্দ্রনাথ সতেরো বছর বয়সেই মারা যান। তখনকার দিনে শিক্ষায়-দীক্ষায় এই পরিবারটি অতি সাধারণ ছিল। বিশেষ করে, উদয়-নারায়ণ ও বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন সাহিত্য চর্চা বা সাহিত্যিক রচনাপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় না।[২]

তবে জানা যায়, বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ব পুরুষগণ পণ্ডিত ছিলেন, এবং নানারূপ গান ও ছড়া মুখে মুখেই রচনা করার শক্তি ছিল। যদিও এখন এ-সবের কোন নিদর্শনই নেই। বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায় সৎ ও বিষয়ী মানুষ ছিলেন। বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে, বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়ের যে রচনা শক্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ ত্রৈলোক্যনাথের পুত্র শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীভূপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্যই এ' মতের বিরোধিতা করে। তবে দূর-পূর্বপুরুষগণের রচনাশক্তির কয়েকটি বিন্দু যে পরবর্তী বংশধারার মধ্যে অস্পষ্টভাবে সঞ্চারিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহই নেই। কেননা আমরা দেখেছি লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন সু-কবি ও শ্রুতিধর।[৩] ত্রৈলোক্যনাথের কনিষ্ঠ পিতামহ 'ইংরাজপর্ব' নামে একখানি বৃহৎ কাব্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। যদিও তার কোন চিহ্নই এখন আর পাওয়া যায় না। তবে তাঁর বড় ভাই রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় যে একজন কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন তার নিদর্শন তো রয়েছেই। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য স্বষ্টির দিকে ঝোঁক ছিল, কিছু কিছু রচনাও করেন তবে তা' আজ অবলুপ্ত। এইরূপ একটি গ্রাম্য, মধ্যবিত্ত, সাধারণ অথচ বিশেষ পরিবারে আনুমানিক ১২৫৪ বা ৫৫ সালের ৬ই শ্রাবণ[৪] ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়।

ত্রৈলোক্যনাথের ছেলেবেলা[৫] সম্বন্ধে অতি সামান্যই জানা যায়। যেটুকু জানা যায়, তা' থেকে আমরা শুধু অনুমান করতে পারি যে, এই বিশাল শক্তিধর ব্যক্তিটির শক্তির প্রকাশ ছেলেবেলা থেকেই ঘটেছে। শান্তশিষ্ট ভাল মানুষটি তিনি কোনদিনই ছিলেন না। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে তিনি একটি

২। শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায় ও ভূপতি মুখোপাধ্যায়।
৩। বঙ্গভাষার লেখক—রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়
৪। বঙ্গভাষার লেখক—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
৫। বঙ্গভাষার লেখক

দল তৈরী করেছিলেন। পরের বাগানের ফলপাড়া, লোককে ধরে মারা, কথায় কথায় টেক্স ধার্যকরা—ইত্যাদি কাজে এই দলটি সিদ্ধহস্ত ছিল। সমগ্র গ্রামটি এদের ভয়ে যেন তটস্থ হয়ে থাকতো। গুরু মহাশয়ের বেতের ভয় বা অভিভাবকগণের তাড়নের শঙ্কা থেকে মুক্তির পথ এই দলটি একটি নূতন পথে খুঁজেছিলো। মাটির নীচে গর্ত করে এক ধরনের "কেল্লা" প্রস্তুত করা হয়েছিল, বিপদের সময়ে সেইখানে লুকিয়ে এই দলটি আত্মরক্ষা করত। ত্রৈলোক্যনাথ বাল্যকালে দুষ্ট প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু পরীক্ষায় তিনি প্রথমই হতেন। কি খেলাধুলায়, কি দুষ্টমিতে, কি লেখাপড়ায় কোথাও তিনি শক্তিহীনতার পরিচয় দেননি। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে উদ্ভাবনীশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজেই মনগড়া একরূপ ভাষার সৃষ্টি ক'রে সম্পূর্ণতর এক বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। এই ধরনের সাংকেতিক বর্ণমালার সাহায্যে এক মিনিটে একশ' আশিটি কথা লেখা হ'ত। এই সময় ত্রৈলোক্যনাথের বয়স অনুমান নয় বৎসর। তাঁর এই উদ্ভাবনী বা সৃজনী শক্তিই পরবর্তী জীবনে কখনও শিল্পে, কখনও কৃষিতে, কখন বা সাহিত্যে—নানা সময়ে নানা ফসলে রূপায়িত হয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথের পড়াশুনা গ্রাম্য পাঠশালায় শুরু হয়। কিন্তু ১৮৫৯ সালে গ্রামের বিদ্যালয়টি উঠে যাওয়ায় পড়াশুনায় বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। এরপর তিনি হুগলী চুচুড়ার ডফ্ সাহেবের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। পর বৎসর ডবল প্রমোশন পেয়ে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই সময়ে ম্যালেরিয়ার করালছায়া সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামের বহু বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-যুবা, এই রোগে প্রাণ হারায়। এই সময় থেকেই ত্রৈলোক্যনাথের জীবনে একটানা করুণ অধ্যায় সূচিত হ'ল। এই ম্যালেরিয়া জ্বরে ত্রৈলোক্যনাথের পিতার, পিতামহীর মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যু পূর্বেই হয়েছিল। মাতৃপিতৃহীন বালক ত্রৈলোক্যনাথের এখন একমাত্র অভিভাবক হলেন পিতার পিসিমা। এই পিসিমা রাহুতা গ্রামেই বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর অতি নিকটেই থাকতেন। কেননা রাহুতা-গ্রামনিবাসী ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বম্ভরবাবুর গ্রাম সম্পর্কিত জ্যেঠামশাই ছিলেন। বিশ্বম্ভরবাবুর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। পৈতৃক জমি প্রজাবিলি দেওয়া ছিল। বাগান, বাগিচা, গাছপালা—সবই ১৮৬৪ সালের ঝড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

ত্রৈলোক্যনাথের ছোট ভাইরাও প্রত্যেকেই ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত। সংসারে বড়ই দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন। তিনি নিজেও জ্বরে পড়লেন। রোগে-শোকে, দুঃখে-কষ্টে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। চৌদ্দ পনের বছর বয়স্ক বালক ত্রৈলোক্যনাথের বিদ্রোহীমন আর কিছুতেই মুখ বুজে নীরব হয়ে থাকতে পারলো না, বেরিয়ে পড়লো অজানার পথে। অজানার হাতছানিতে তিনি এক যাদুকরী স্পর্শ অনুভব করলেন। এইখানেই ত্রৈলোক্যনাথের লেখাপড়ার সমাপ্তি, জগতের বৃহৎ পাঠশালার বুকে নূতন করে আরম্ভ হ'ল তাঁর হাতেখড়ি।

জীবনের যে সময় একান্তভাবেই ভারমুক্তির সময়, যে সময়ে মুক্ত বিহঙ্গের মত মনের খুসীতে উড়ে চলার সময়, সেই সময়েই ত্রৈলোক্যনাথকে কঠিন ভার বহন করবার আশায় পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। জীবনের কোন মহৎ ব্রত বা সংকল্প পালনের জন্যে নয়, শুধু টিকে থাকার জন্যে তাঁকে অশেষ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। মানভূম পুরুলিয়ায় তাঁর এক আত্মীয় ছিলেন, নাম শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৬৫ সালের জানুয়ারী মাস, তিনি এ' আত্মীয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। হাতে পয়সা অতি সামান্য। তাই রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলে গিয়ে হাটতে সংকল্প করলেন। বন, জঙ্গল, পাহাড় পার হয়ে যেতে হবে। রাণীগঞ্জে দামোদর নদী পার হলেন। এই সময় এক চাপরাসীর সাথে দেখা হয়। সে তাঁকে আসামে যাওয়ার পরামর্শ দেয়, সেখানে গেলেই চাকরী পাওয়া যাবে। তখন তাঁর এমন অবস্থা যে এই অপরিচিত ব্যক্তিটিকে অবিশ্বাস করতে পারলেন না। অথবা তাঁর সরল মন মানুষের নীচতার কথা কিছুই জানতো না। তাই তিনি রাণীগঞ্জে ফিরে এলেন। এখানে বলে রাখা ভালো, চাপরাসী তাঁর জন্যে যে চাকরীর কথা বলেছিল তা ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে করা খুব কষ্টকর। চা বাগানের কুলির কাজ ওইটুকু বাচ্চা কি করে পারবে—হয়তো এই কথাই মনে হয়েছিল চাপরাসীর রক্ষিতার। তাই তিনি ত্রৈলোক্যনাথকে আসামে যেতে নিষেধ করেন। তাঁরই কথামত পথিমধ্যে পালিয়ে এসে সে যাত্রা ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষা পান। কোথায় যান কিছুই বুঝতে পারছেন না। পুনরায় মানভূমে যাওয়াই স্থির করলেন। পায়ে হেঁটে, সামান্য গাছের ফুল খেয়ে, চলতে লাগলেন। বহুকষ্টে মানভূমের আত্মীয়ের কাছে এলেন। শশীশেখরবাবু তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। এই সময় ছোটনাগপুরের কমিশনারের আদেশে

স্কুলের প্রথম শ্রেণীর বালকদের রাঁচির মেলা দেখবার জন্যে যাত্রা করতে হয়। ত্রৈলোক্যবাবুও বালকদের সঙ্গে গেলেন। গরুর গাড়ীতে করে যাওয়া হল। মানভূমের ডেপুটী কমিশনার এবং আমলাবর্গ এই সঙ্গে অভিভাবক হয়ে চললেন। এই দলে ত্রৈলোক্যনাথ নূতন হলেও, দুই-চার দিনের মধ্যেই তিনি বালকদের কাপ্তেন হয়ে উঠলেন। দলের প্রধান হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ সেই রাহুতা গ্রামে থাকতেই তিনি এ' প্রকৃতির ছিলেন তা' আমরা জানি। জয়পুরে পৌঁছে বাঁদরের পালের মধ্যে থেকে গাছে উঠে, মার কোল থেকে বাঁদরছানা কেড়ে নিয়ে বেশ এক ধরনের সুখ অনুভব করা থেকে আরম্ভ করে, বালকদের দুর্গম গিরিপ্রদেশে নিয়ে গিয়ে গিরিগুহায় ভল্লুক অনুসন্ধান করা—ইত্যাদি নানা দুষ্টামি ও সাহসিকতায় ভরা গতিবিধিতে তিনি বালকগণকে উৎসাহিত করলেন। কিন্তু এতে অভিভাবকগণ বেশ বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। যা' হোক, যথা সময়ে তাঁরা রাঁচীতে এলেন। রাঁচীতে এলেন বটে কিন্তু স্থির হতে পারলেন না। বনের পথ অনুসরণ করে পথে বেরিয়ে পড়লেন। নাগপুরের বন্যপ্রদেশে দু'জন ঢাকাই মুসলমানের সঙ্গে দেখা হয়। তারা হাতী শিকারে চলেছে। ত্রৈলোক্যনাথ তাদের দলে যোগ দিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তিদ্বয়কে তিনি অত সহজে গ্রহণ করলেও তারা তাঁকে এ'ভাবে সহজ হৃদয়ে গ্রহণ করেনি। জঙ্গলের মধ্যে অসহায় অবস্থায় সেই কিশোরের গা থেকে গায়ের চাদরটি পর্যন্ত কেড়ে নিতে তাদের নিষ্ঠুর হৃদয়ে বাঁধেনি। নিরুপায় হয়ে ত্রৈলোক্যনাথ আবার রাঁচী ফিরে এলেন। পরে রাঁচী থেকে মানভূমে এসেছিলেন বটে, কিন্তু স্কুলে আর পড়া হয়নি। এই সময়ে রেফাকহুসেন নামে এক মৌলবীর কাছে তিনি পার্শী শিক্ষা করেন। অল্প সময়েই পার্শী ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ যেমন পন্দনামা, আমদনামা, গোলেস্তা, বোস্তা ইত্যাদি পাঠ শেষ হয়।

কিন্তু এভাবে কোনক্রমে নিজের দিন কাটিয়ে দিলেও প্রায়ই তাঁর বাড়ীর কথা মনে হত। বাড়ীর দুঃখ-কষ্ট, ছোট ছোট ভাইদের কথা, গ্রামের কথা— তাঁকে কেমন যেন ব্যাকুল করে তুলতো। তাই তিনি এবার দেশে ফিরে এলেন। এই সময় চার মাসের জন্যে তিনি ইছাপুর গ্রামে কোন একটি কাজ নেন। কিন্তু একাজ তো অস্থায়ী। তাই এই সময় অন্তে তিনি গ্রামের জনৈক আত্মীয়ের সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় যশোহর জেলায় গমন করেন। সেই আত্মীয়টি যশোহরে কণ্ট্রাকটরের কাজ করতেন। যশোহর কোটচাঁদপুর

তাঁর কার্যস্থান ছিল। ত্রৈলোক্যনাথ এবার তাঁর নিকটেই গেলেন। কিন্তু আত্মীয়ের ব্যবহার তাঁকে তৃপ্ত করেনি, বরং কিছুটা বিরক্ত হয়েই তিনি কোটচাঁদপুর পরিত্যাগ করে এলেন। গৃহেও স্থির হয়ে বসে থাকলে কোন মতেই সংসার চলে না। তাই আবার তাঁকে জীবিকার সন্ধানে ঘর-ছাড়া হতে হল। এবার এলেন বর্ধমানে। এখানেও তাঁর একটি আত্মীয়ের বাস ছিল, নাম হরকালী মুখোপাধ্যায়। তিনি ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলের কাজ করতেন। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর নিকটে গিয়ে শিক্ষকতার পদ প্রার্থনা করলেন। তাঁরই নির্দেশমত এবার তিনি বিভিন্নস্থানে ঘুরলেন। কাটোয়া থেকে কীর্ণাহার, কীর্ণাহার থেকে রামপুরহাট, সেখান থেকে সিউড়ী—নানাস্থানে ভাগ্যান্বেষণে ঘুরে বেড়ালেন।

একস্থান থেকে অপরস্থানে যাওয়ার সময় তাঁর ভাগ্যে যে অবর্ণনীয় দুঃখ জুটেছিলো তার কারণ তাঁর প্রখর আত্মাভিমান। তিনি নিজেই বলেছেন যে "আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রার্থনা করিলে অবশ্য তিনি কিছু দিতেন, কিন্তু চাহিতে পারিতাম না। লোকের বাড়ীতে অতিথি হইয়া পথ চলিতাম।" এই চাহিতে না পারা একদিক থেকে যেমন তাঁকে দুঃখের অতলে নিয়ে গেছে, তেমনি অপরদিকে দুঃখের দীক্ষা তাঁকে আরও এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছে। সেই পথ দিয়েই চলতে চলতে কখন যে তিনি দুঃখ সাগর পার হ'য়ে এসেছেন তা' তিনি নিজেই হয়তো বুঝতে পারেন নি।

১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। চারধারে হাহাকার, অন্নের জন্যে কাতর আর্তনাদ। এই সময় ত্রৈলোক্যনাথ পথে পথে। কোনদিন আহার জোটে, কোনদিন জোটে না। সারাদিন পথচলার পর ক্লান্ত, শ্রান্ত দেহে কাহারও বাড়ীতে যদি আশ্রয় না জোটে, তবে তিনি গাছতলায়, অনাহারে রাত্রি কাটাতেন। তাঁরই মুখে সেই নিদারুণ দিনগুলির মধ্যে একটিমাত্র দিনের ঘটনা শোনা যাক,—

"রামপুরহাট হইতে সিউড়ী ফিরিয়া আসিয়া দুইদিন আহার হয় নাই। সন্ধ্যার সময় সিউড়ী উপস্থিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। কোথায় যাই? ভাবিয়া চিন্তিয়া স্কুলের হেড-মাষ্টার নবীনচন্দ্র দাশের নিকট গেলাম। তাঁহাকে বলিলাম, 'মহাশয়। আমি ব্রাহ্মণ, দুইদিন অনাহারে আছি,—যদি আমায় কিছু খাইতে দেন।' তিনি আমাকে একটি দু'আনি দিতে আসিলেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'এরূপ পয়সা ভিক্ষা করিতে আপনার কাছে আসি নাই।' 'তবে তুমি এক কাজ কর। আমার অধীনে কুঞ্জ বলিয়া একটি জমিদার বালক আছে। সে ব্রাহ্মণ, তুমি আজ রাত্রি তাহার নিকট গিয়া অবস্থান কর।' কুঞ্জ আমার সমবয়সী। বীরভূম জেলায় পানাগড়ের নিকট ইছাপুর নামক গ্রামে কুঞ্জের বাস ছিল। সে একটি মেটেঘরে থাকে। সেই ঘরের ভিতর রান্না হয়। ঘরে কুঞ্জ ও আমি বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। ঘরের এককোণে ব্রাহ্মণ রাঁধিতে লাগিল। ঘোরতর আগ্রহের সহিত সেই রন্ধন কার্য দেখিতে লাগিলাম। এই হয়, এই হয়, কখন হয়,—সর্বদাই এই চিন্তা। ব্রাহ্মণ প্রথম ভাত নামাইল। উল্লাসে মন প্রফুল্ল হইল। তাহার পর ডাল হইল। এইবার মাছ রাঁধিলেই হয়, এই ভাবিয়া মনে অতিশয় আনন্দ উপস্থিত হইল। উত্তপ্ত তেলে ব্রাহ্মণ সেই মাছ ফেলিয়া দিল। তেল জ্বলিয়া ঘরের কোণের চালে, যাহা ঠিক উনুনের উপরে ছিল, তাহাতে আগুন লাগিয়া গেল। মহাগোল উঠিল। চারিদিক হইতে লোক আসিয়া আগুন নিবাইল। কিন্তু আমার জঠরানল নির্বাণ হইল না। যাহা কিছু রন্ধন হইয়াছিল সমুদয় নষ্ট হইয়া গেল। দুই পয়সার মুড়ি মুড়কি আনিয়া কুঞ্জ ও আমি খাইলাম। দুর্ভিক্ষের সময় তাহা এক গালেই ফুরাইয়া গেল। ক্ষুধার কিছুমাত্র নিবৃত্ত হইল না।"

রাত্রি শেষ হ'ল। দিনের আলোয় ত্রৈলোক্যনাথ বর্ধমানের পথে চলতে শুরু করলেন। পাঁচ, ছয় ক্রোশ চলবার পর আর চলতে পারেন না। তবু চলতে হয়। সমস্ত ক্লান্তিকে অস্বীকার করে কোনমতে একখানি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলেন। গ্রামে এক ব্যক্তির কাপড়ে চূণহলুদের দাগ দেখে তিনি অনুমান করলেন তাদের বাড়ীতে নিশ্চয়ই কোন শুভকার্য হবেই। এই শুভকার্যের কথা মনে হওয়ার সাথে সাথেই মনে হ'ল, হয়তো তাদের বাড়ীতে দুটি আহার জুটতে পারে। জানলেন এ' পরিবারটি জাতিতে সদ্গোপ। গৃহকর্তা বৃদ্ধ। এই বৃদ্ধের নিকট ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর সমস্ত দুঃখের কথা বললেন। বৃদ্ধ অতি দয়াবান। অতি যত্নের সঙ্গে তিনি অতিথিকে মুড়ি, গুড়, ঘোল খেতে দিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ নিজেই বলেছেন, "অমৃতের অপেক্ষা তাহা আমার মিষ্ট লাগিল, দেহ পুনর্জীবিত হইল। পুনরায় বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমি কেবল একদিনের ঘটনা বলিলাম, এইরূপ ঘটনা আমার জীবনে কত দিন কত রকমে ঘটিয়াছে, তাহা আমার মনেও নাই। আর

বলিবারও আবশ্যক নাই।" কপর্দকশূন্য হ'য়ে পথচলার করুণ কাহিনীগুলো সত্যিই মর্মস্পর্শী। আহার না হলে বাঁচা যায় না সত্যি, কিন্তু ভাত রাঁধা দেখে যে অপরিসীম উল্লাসের কথা তিনি বলেছেন আর তারই পরে যে হতাশার চিত্র আমরা দেখি তাকে মর্মস্পর্শী না বলে উপায় নেই। পরে মুড়ি গুড় ঘোলের মধ্যে অমৃতের সন্ধান পাওয়ার পেছনে যে কারুণ্য জড়ানো রয়েছে তাও সমানভাবেই সকলের চিত্তকে আর্দ্র করে দেয়।

এবার ত্রৈলোক্যনাথ বহুকষ্টে বর্ধমানে পৌঁছালেন। এসেই আত্মীয় হরকালীবাবুর কাছে শুনলেন যে তাঁর দিদিমা খুব পীড়িতা, ত্রৈলোক্যনাথকে দেখবার জন্যে কান্নাকাটি করছেন। এই কথা শোনামাত্র তিনি শারীরিক দুর্বলতার কথা ভুলে দেশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে তাঁর হাতে একটিও পয়সা ছিল না। সুতরাং এবারও যে কষ্টকে বরণ করে নিতে হবে তাতে আর সন্দেহ কি! সন্ধ্যেবেলা মেমারিতে পৌঁছালেন। স্টেশনের কাছে একটি পুষ্করিণীর সান-বাঁধানো ঘাটে পড়ে রইলেন। দুই দিন আহার হয়নি, শরীর অত্যন্ত দুর্বল। সে-রাতেও অনাহারে কাটালে শরীর আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। হয়তো সেইরূপ দুর্বলতা নিয়ে পথ চলা আরও অসম্ভব হয়ে পড়বে—এইকথা ভেবে তিনি আর শুলেন না, আবার পথ চলতে লাগলেন। "ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পা আর ওঠে না। একটি তেঁতুল গাছ হইতে তেঁতুল পাতা পাড়িয়া লইলাম। তাহাই চিবাইতে চিবাইতে পরদিন বেলা বারোটার সময়ে মগরায় আসিলাম। শরীর অবসন্ন,—আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। একটি পুরাতন ছাতা ছিল। একজন দোকানী সেই ছাতাটি বাঁধা রাখিয়া আমাকে ফলাহার করিতে দিল, আর গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত নগদ একটি পয়সা দিল। আমি বাড়ী আসিলাম।" এবারে দিদিমা সেই কঠিন পীড়া থেকে রক্ষা পান। তাঁর দেখা পেয়ে হয়তো ত্রৈলোক্যনাথ পথের সব ক্লেশকে ভুলতে পেরেছিলেন। কিছুদিন দেশে দিদিমার কাছেই কাটিয়ে আবার দেশ ছাড়লেন।

এই সময় থেকে ভাগ্যদেবী যেন ত্রৈলোক্যনাথের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে চাইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি একটি স্কুল মাষ্টারীর চাকরী পেলেন। তাঁর আত্মীয়ের চেষ্টাতেই তিনি এ কাজ পান। প্রথমে রাণীগঞ্জের উখড়ায় তিনি দ্বিতীয় শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। এবং পরে বীরভূম জেলার

দ্বারকায় তিনি প্রধান শিক্ষকরূপে বদলী হয়ে আসেন।[৬] এই শিক্ষকতার কার্যকাল ১৮৬৬—৬৭। বেতন আঠারো টাকা। এই সময় থেকেই ত্রৈলোক্যনাথের মনে একটি মহান ব্রত গ্রহণের বাসনা জাগতে থাকে। এতদিন শুধু নিজের কথা, নিজের দুঃখেই বিব্রত হয়ে তিনি পথে পথে ঘুরে মরেছেন। এখন থেকে নিজের দুঃখ থেকে অন্যের দুঃখে তাঁর অন্তর কাঁদতে লাগলো। এতদিন নিজেই পরের কাছে দয়া ভিক্ষা করেছেন, কখনও বা একটু আহারের, কখনও বা সামান্যতম চাকরীর। কিন্তু যখনই তাঁর সেই সামান্য প্রার্থনাটুকু পূর্ণ হয়েছে, সেই মুহূর্তে চারপাশের লোকগুলোর দিকে তিনি চোখ মেলে চাইলেন। দেখলেন শুধু অভাব, শুধু অভাব। চারদিকে দুর্ভিক্ষের মৃত্যুর ছায়া অস্থিচর্মসার ক্ষুধার্ত নর-নারী, বালক-বালিকা দু'মুঠো অন্নের প্রত্যাশায় কাতর। সেইসব পাণ্ডুর মুখচ্ছবি তাঁর সংবেদনশীল অন্তরের দ্বারে কঠিন আঘাত হানলো। একদিকে ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি অসীম মমতা, অন্য দিকে নিজের সীমিত সামর্থ—এ দুইয়ের মাঝখানে পড়ে তিনি ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন। মন চায় দুহাত ভরে উজাড় করে ঢেলে দিতে, সব অভাব, সব আর্তনাদ থেকে মৃত্যুপথযাত্রীদের মুক্ত করতে। দেশের লোকের সঙ্গে সঙ্গে নিজের শিশুভাইগুলির মুখগুলোও তাঁকে কম চঞ্চল করে তুলতো না। কিন্তু পারেন না। অসহায় ত্রৈলোক্যনাথ মনে মনে সঙ্কল্প গ্রহণ করেন—"যাহাতে এই স্বর্গভূমি ভারতভূমিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইতে পারে, এইরূপ কার্য্যে আমার মনকে আমি নিয়োজিত করিব। সেইদিন হইতে এই সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবার আবশ্যক শিখিতে লাগিলাম।"[৭] তাঁর এই অন্তরের শপথ গ্রহণ কোন ভাবাবেগজাত যে নয় তা' আমরা নিশ্চয় বলতে পারি। কেননা আঠারো টাকা মাহিনাজীবি শিক্ষক তখন হইতেই কঠিন কৃচ্ছ সাধনে আত্মনিয়োগ করেছেন। গেরুয়া বসন ধারণ করা, হবিষ্যান্ন খাওয়া সবকিছুর পিছনেই সকলের দুঃখ সাধ্যমত দূর করবার বিপুল অভিপ্রায় আত্মগোপন করেছিল। এইভাবে অর্থ বাঁচিয়ে তিনি কিছু অর্থ ভাইদের, আর বাকিটা দেশের ভাইবোনদের হাতে তুলে দিতেন। এই যে বিলিয়ে দেওয়ার,

৬। **Service Book, Page 1**
Serial No. 1
Babu Harakali Mukherjee.

৭। বঙ্গভাষার লেখক।

অন্যের জন্য উৎসর্গ করার তীব্র আকুলতার পরিচয় তাঁর মধ্যে একটু একটু করে অঙ্কুরিত হতে লাগলো, তাই সমগ্র জীবন-ব্যাপী প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবার জন্যে পথ খুঁজে বেড়িয়েছে। টাকা থাকলেই দান করা যায় না তার জন্যে চাই একটা সহানুভূতিশীল অন্তর। ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে এমনি একটি দয়াপ্রাণ অন্তর ছিল। যে অন্তর নিজের দুঃখে কাঁদতো কিনা জানি না, তবে পরের দুঃখে যে নিরন্তর কাঁদতো তা' স্পষ্টতই দেখতে পাই। আঠারো টাকার যে সামান্য অংশ তিনি সেই সময় দান করতেন তা' অঙ্কের হিসাবে যত সামান্যই হোক, মানবতার দিক থেকে তার ভার অনেক বেশী। ত্রৈলোক্যনাথ নিজেই বলে গেছেন, "ভারতের লোক যদি নিজে নিজে একটু যত্ন করে, তাহা হইলে এ দেশের অন্তত অর্ধেক দুঃখও দূর হইতে পারে। আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মিলিত করিতে যত্ন পাইতেছি। কিন্তু কি করিব, সকলেই আপনার নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত। যাহাতে দেশের দুঃখ মোচন হয়, এইরূপ চিন্তা অল্পলোকেই করিয়া থাকেন, বড়জোর না হয়, ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে কতকগুলি লোককে বৎসরের মধ্যে একদিন না দুইদিন আহার দিয়া থাকেন। কিন্তু গরীব দুঃখী লোকেরা চিরকালের জন্য যাহাতে একমুঠা অন্ন পায় এরূপ কার্যে কয়জনের দৃষ্টি থাকে?" এই গরীব দুঃখীর জন্যেই তাঁর অন্তর চিরদিন কেঁদেছে।

উখড়ায় চাকরী করবার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হ'তে ত্রৈলোক্যনাথ একখানি চিঠি পান। চিঠিতে জানতে পারলেন যে সাহাজাদপুরে, তাঁর জমিদারীতে একটি স্কুল মাষ্টারীর পদ খালি আছে, বেতন ২৫৲ টাকা। ত্রৈলোক্যনাথ এই আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন। অল্পদিন পরে পূজার ছুটিতে তিনি বাড়ী ফিরে এলেন। মনে হ'ল অল্পদিনের মধ্যেই ছুটি ফুরিয়ে গেল। আবার কর্মস্থান সাহাজাদপুরে যাত্রা। এবার কুষ্টিয়া থেকেই নৌকায় পদ্মার বুকে ভাসলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর একটি চড়ার মাঝখানে নৌকা লাগিয়ে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার। হঠাৎ কিসের যেন শব্দ হল। মনে হল ঠিক গায়ের কাছেই কে যেন নিঃশ্বাস ফেললো। ত্রৈলোক্যনাথ ভয়ে নৌকাতে দৌড়ে গিয়ে উঠলেন, মাঝিরাও সেদিকে বাঁশ নিয়ে ছুটলো। দেখলেন কি যেন একটা জলে লাফিয়ে পড়লো। পরে জানলেন জল থেকে কুমীর উঠে তাঁকে ধরতে নিকটে গিয়েছিল। মাঝিদের সহায়তায় তিনি সে যাত্রা রক্ষা পেলেন। পরদিন প্রাতেই নৌকা

ছেড়ে দেওয়া হ'ল। সেদিন কুমীরের হাত থেকে রক্ষা পেলেও এ রকম নানাধরণের বিপদের সামনে তাঁকে এ' পথে যাতায়াত করবার সময় পড়তে হয়েছে। নৌকা চলেছে। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। পূর্বেই জোরে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাসও জোরে বইছে। পদ্মায় তুফান এল। কিছুদূর নৌকা যাওয়ার পর আর যাওয়া সম্ভব হল না। এক জায়গায় তিনখানি বড় নৌকা লেগেছে। ত্রৈলোক্যনাথের নৌকাও সেই স্থানে রাখা হল। ক্রমে ঝড় তুফান বাড়তে লাগলো। রাত যে কত হয়েছে বুঝবার উপায় নেই। ঝড়ে নৌকাকে ঠেলে পদ্মার মাঝখানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। লগী ও দড়ির সাহায্যে কোন মতে নৌকা রক্ষা করতে হ'ল। কিন্তু লগী উড়ে যায় দড়ি ছিড়ে যায়। বাতাসে টিকে থাকা দায়। ঝড়ে নিকটের নৌকাখানি ডুবে গেল। বড় নৌকাখানি এই নৌকার ওপরে এসে পড়াতে, ছুইখানিই সজোরে মাঝনদীতে চলল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই দুইটি নৌকা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তাঁদের নৌকাখানি ডুবে গেল। চারধার থেকে মাটি ভেঙে পড়ছিলো। মাটি চাপা পড়ার ভয় এল। বহুকষ্টে পাড়ের ওপর উঠে এলেন। ওঠার সাথে সাথে ঝড় যেন ঠেলে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। এই প্রবল বাতাসের মুখে পড়ে তিনি অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়লেন। কি করেন। সামনে যা পান তাই-ই ধরে বেঁচে থাকতে চান। একটি গাছ ধরলেন, সেটি বোধ হয় চারা বাবলা গাছ, হাতে কাঁটা ফুটে গেল। সেটি ছেড়ে দিলেন। সামনেই একটা ঝোপ দেখতে পেলেন। সে স্থানে অনেকগুলি বড় বড় গাছ ছিল, সেই ঝোপের মধ্যে শুয়ে পড়লেন। শরীরে কম্প এল, শীতে, দুর্বলতায়, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। সে সময়ের জন্যে আর কিছুই মনে রইল না।

যখন জ্ঞান হ'ল, তিনি দেখলেন যে এক অপরিচিত স্ত্রীলোক তাঁর গায়ে সেক দিচ্ছেন। শুনলেন, যাঁদের বাড়ীতে আছেন তাঁরা জাতিতে চণ্ডাল। গ্রামের নাম বুলচন্দপুর। পাবনা থেকে প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ দূরে গ্রামটি। এ' গ্রাম্য পরিবারের পুরুষেরা জলমগ্ন নৌকার দ্রব্যাদি পাওয়ার আশায় নদীর ধারে এসেছিল। কিন্তু তারাও ঝড়ের কবলে পড়ে। ঝড়ের তাড়নায় ত্রৈলোক্যনাথ যেখানে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন, সেই ঝোপের মধ্যে আশ্রয়ের আশায় ঢুকে পড়ে। সেখানে মৃত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখে, এবং গলায় পৈতা দেখে ব্রাহ্মণ অনুমান করে, তাঁকে বাড়ী

নিয়ে গেল। তারপর বহু যত্নে তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনলো। চারদিন সেখানে থাকবার পর যখন কিঞ্চিৎ সুস্থ হলেন, তখনই পাবনার দিকে পালিয়ে এলেন।

কাদামাখা সামান্য একখানি ধুতি পরে কোনমতে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। এই আত্মীয়ের নাম রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, বাড়ী বৈন্তবাটী। পাবনায় তাঁর কর্মস্থল হলেও তখন তিনি বহরমপুরে ছিলেন। ললিতকুড়ি বা অন্যপ্রকার বাঁধের তিনি ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ত্রৈলোক্যনাথকে আশ্রয় দিলেন, কাপড়-চোপড় কিনে দিলেন, শেষে তিনচার দিন পরে খরচপত্র দিয়ে তাঁকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। এই সময় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ও ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্মার সংগে ত্রৈলোক্যনাথের আলাপ ও হৃদ্যতা হয়। ত্রৈলোক্যনাথ বাড়ী এলেন, কিন্তু বাড়ীতে কেউ ছিলেন না। বীরভূম জেলায় ছোট ভাই-এর নিকটে সকলে ছিলেন। বাড়ীতে এসে তাঁর জ্বর-বিকার হয়, কোন রকমে এই অসুখ থেকে রক্ষা পান। অসুখ থেকে ভাল হয়েই কোথায় যাবেন ভাবতে লাগলেন। এবার কটকের দিকে পা বাড়ালেন। তখন বর্ধমানের হরকালী মুখোপাধ্যায় সেখানকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁর কাছেই যাবেন। কিন্তু প্রতিবারের মত এবারও তাঁর দুশ্চিন্তা। কেননা হাতে আর টাকাকড়ি নেই। বড় ভাইয়ের কাছে টাকা চাইলে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু যদি তিনি তাঁকে একলা অতদূরে না যেতে দেন এই ভয়ে তাঁকে কোন খবর জানালেন না। আর ধার করা, সে তো তাঁর ধাতের বাইরে। তাই, যৎসামান্য খরচ নিয়ে পদব্রজেই বের হয়ে পড়লেন। পথে চিড়ে, নুন আর লঙ্কা খেয়ে চলতে লাগলেন। কিন্তু শেষদিন পয়সা ফুরিয়ে গেল। এরকম নিঃস্ব হাতে চলা তো তার ধাতস্থ হয়ে গেছে। সাঁতার কেটেই মহানদী পার হলেন। হরকালীবাবুর বাসায় পৌঁছালেন। কিন্তু অসুস্থ শরীরে এত অত্যাচার সইবে কেন! আবার অসুখে পড়লেন। কিছুটা সুস্থ হলেই হরকালীবাবু তাঁকে পুলিশের সাব-ইনস্‌পেক্টার করে দিলেন (১৮৬৮-৭০)।[৮] এই কাজে প্রথমে তাঁকে কুচ্‌কাওয়াজ শিখতে হয়।[৯] কিছুদিন যেতে না যেতেই কেউ ঝরের লড়াই

৮। Service Book Page 1 Serial Nos. 2, 3, 4, 5.

৯। বঙ্গভাষার লেখক।

উপস্থিত হয়। ত্রৈলোক্যনাথকে সেই লড়াই এর জায়গায় যেতে আদেশ হয়। কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বর হওয়াতে পথ থেকেই ফিরে আসেন। এর লড়াই এ ভূইয়া, জোয়াংগ, কোল—প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা পরাজিত হয়। বিচারে কারও ফাঁসি, কারও দ্বীপান্তর হল। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের পদোন্নতি হয়। তিনি থানার দারোগা হলেন। কখনো কখনো কোর্টেও কাজ করতে লাগলেন। এই সময় তিনি কয়েকটি স্থানে কর্মরত অবস্থাতেই ভ্রমণ করলেন যেমন জাজপুর, ওলারা, কেঁদারাপাড়া প্রভৃতি। সরকারী কার্যের জন্যেই এই সময় তিনি উড়িয়াভাষা শিখে নেন। মাত্র ১৫, ১৬ দিনের মধ্যেই তিনি চলনসই উড়িয়া ভাষা শিখলেন। এই সময়ে কিছুদিন তিনি "উৎকল শুভকারী" নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। উড়িয়া ভাষা শেখার পর তিনি উড়িয়া সাহিত্যও অধ্যয়ন করেন। এই সাহিত্য তাঁকে বেশ আনন্দ দেয়। তিনি বলেন আমাদের যেমন কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র, কাশীদাসী মহাভারত আছে, উড়িয়া ভাষায় এই শ্রেণীর অনেক অধিক ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। তাঁর এই মতের সত্যতা নিরূপণের কাজ আলাদা, তবে এখানে এটুকু নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি যে ত্রৈলোক্যনাথ উড়িয়া সাহিত্য বেশ খুঁটিয়ে পড়েছিলেন। শুধু সাহিত্য কেন উড়িয়া জাতির প্রতাপের কথা, কীর্তির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। আসলে তিনি উড়িয়াবাসীদের ঘৃণার বা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন নি, তাদের মধ্যেও যে কিছু কিছু গুণ আছে এ সত্য তাঁর চোখে পড়ে। তবে তিনি যে ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে এক-প্রাণতার ভাব জাগানোর জন্যে যে উড়িষ্যায় বাংলাভাষা প্রচলনের, অথবা বাংলায় উড়িষ্যা ভাষা প্রচলনের কল্পনা করেন তা সম্পূর্ণ অবাস্তব ছিল। তাই বোধ হয় সে-চেষ্টা সফল হয়নি। অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন যে বাংলা-ভাষা সম্প্রতি দ্রুত উন্নতি করে, প্রাচীন সাহিত্যের যুগ হলে হয়তো বাংলাভাষা তুলে দেওয়া চলতো। অবশ্য এটা তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত মত, সকলে এ মতের সংগে একমত হতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

কটকে থাকতে থাকতে সুপ্রসিদ্ধ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, কেননা তিনি সেখানকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সাধারণীর শ্রীযুক্ত অভয় চন্দ্র সরকারের পিতা গঙ্গাচরণ সরকারও ত্রৈলোক্যনাথকে অতিশয় স্নেহের চোখে দেখতেন এবং ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে অতি উচ্চ আশা পোষণ করতেন, তিনি বলেন "যদ্যপি এই যুবক কিঞ্চিৎ দৃঢ়

পরিত্যাগ করিয়া বিনীত হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি কালে এই যুবক ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।" তাঁর এই ভবিষ্যতবাণী সবটুকু পুরণ না হলেও তিনি যে ভারতবর্ষের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে বিনীত হওয়া তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। তাঁর চরিত্রে যে দম্ভ দেখি তা চরিত্রের দোষ নয়, তা' তাঁর চরিত্রের ভূষণ। এই দম্ভই তাঁর মনে আত্মপ্রত্যয় এনে দিয়েছে, দুঃখজয়ের শক্তি জুগিয়েছে।

এই কটকে অবস্থানকালেই একজন সাহেবের সহিত তাঁর পরিচয় হয়। কাছারির বাইরে একদিন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, এমন সময় একটি সাহেব সেখানে এলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হ'ল। কিছুক্ষণের মধ্যে আলাপ গাঢ়তর হল, দুজনে রোমান ক্যাথলিক গীর্জায় একটি বিবাহ অনুষ্ঠান দেখতে গেলেন। এই সাহেবটির নাম স্যার উইলিয়ম হাণ্টার। ইনি কলকাতা থেকে কটকে গিয়েছিলেন। তাই তিনি শীঘ্রই কলকাতায় ফিরে এলেন। কলকাতায় ফিরে আসার পরেই তিনি ত্রৈলোক্যনাথকে ১২৫ টাকা বেতনের একটি চাকরীর কথা লিখলেন। ত্রৈলোক্যনাথ[১০] ১৮৭০ সালের মে মাসে হাণ্টার সাহেবের অফিসে চাকরীতে যোগ দিলেন। এখানে হেড ক্লার্ক পদে পাঁচ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। এই সাহেবটিকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন।[১১] তিনি বলতেন হাণ্টার সাহেবের মত দয়াবান ভদ্রলোক তিনি দেখেননি। তিনি বিলাতে থেকেও জীবিতকাল পর্যন্ত ভারতের দীন দরিদ্রের মঙ্গলের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অধীন দেশের জনগণের মঙ্গলচিন্তা যিনি করেন তাঁকে দয়াবান পুরুষ না বলে উপায় কি, এই হাণ্টার সাহেব ও তাঁহার মেম ত্রৈলোক্যনাথকে অতিশয় স্নেহ করতেন। কলকাতায় থাকাকালীন অবস্থায় তিনি যেন তাঁদের ঘরের ছেলের মত হয়ে উঠলেন। কত আবদার ও উপদ্রবে যে তাদের সব সময় জ্বালাতন করেছেন তার শেষ নেই। স্নেহ না পেলে অথবা ভাল না বাসলে কি এরূপ করা যায়! কিন্তু এই সুখ তাঁর ভাগ্যে সইল না। ১৮৭৫ সালে হাণ্টার সাহেব বিলাতে চলে গেলেন। যাবার সময় ত্রৈলোক্যনাথকে তাঁদের সঙ্গে যাবার জন্যে বার বার অনুরোধ করলেন। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের মত না হওয়ায় তাঁর সেবার

১০। Service Book, Page No. 1 & 2, Serial No. 6.

১১। বঙ্গভাষার লেখক।

বিলাত যাওয়া হয়নি। তিনি এ সুযোগ যদি গ্রহণ করতেন তা' হলে ভালই হ'ত।

এরপর তাঁর জীবনে আর একজন উদার সাহেব আসেন, ইনিও ত্রৈলোক্যনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ইনি অফিসের কর্মকর্তা। এবার তিনি উত্তর পশ্চিমে যে কৃষি বাণিজ্য অফিস স্থাপিত হয় তাতেই কর্ম গ্রহণ করেন, হেড ক্লার্কের পদ। এই পদে ১৮৭৫-৮৯ পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। হেড ক্লার্ক হতে পদোন্নতিক্রমে Head Superintendent[১২], পরে Personal Assistant হন। যদিও এ সময় ইংলিশম্যান অফিসে সণ্ডার্স ও বার্করে নামে দুইজন সাহেব তাঁকে লইবার জন্য উৎসুখ ছিলেন তবুও তিনি তা গ্রহণ করেন নি। এমন কি সদাশয় হাণ্টার সাহেবও তাঁকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দিতে চান কিন্তু তিনি তাও গ্রহণ করেননি। পূর্ব-প্রতিজ্ঞামত দরিদ্রের দুঃখমোচনে সমর্থ হওয়ার মানসে তিনি কৃষি বাণিজ্য অফিসে যোগ দেন। এই অফিসে যে কর্মকর্তাটিকে তিনি পান তাঁর নাম এডওয়ার্ড বাক্। তিনি বলেছেন পৃথিবীতে তাঁর অপেক্ষা সুহৃদ তাঁর আর কেউ নেই। তিনি জীবনে যে সব সাহেবের সংস্পর্শে এসেছেন সকলেই উদার চরিত্র। বাক্ সাহেবের অফিসে কাজ করতে করতে তিনি দেশের উপকারের জন্যে নানারূপ কর্মে যোগ দেন।

ত্রৈলোক্যনাথ হয়তো আরও বড় চাকরী গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। কেননা নিজের উন্নতিই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। জাতির এবং দেশের উন্নতিও তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তাই তিনি কর্মের ক্ষেত্রেও অনেক সময়েই বাঙালীদের বিশেষ সুবিধা দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর অধীনে প্রায় তিরিশজন কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। হিন্দুস্থানীকে না লইয়া বাঙালীকে লইবার জন্য কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হ'তে হয় মাঝে মাঝে। অনেক সময় অধীনস্থ কর্মচারীগণও তাঁর প্রতি যথাযথ ব্যবহার করত না। ভাল কাজ করতে গিয়ে বাইরেও তাঁকে সকল সময় বিপদের সামনে পড়তে হয়। কিন্তু পরের দোষকে নিজের ঘাড়ে লওয়াই ছিল তাঁর স্বভাব। ১৮৭৭-৭৮ সালে একবার উত্তর পশ্চিমে দুর্ভিক্ষ হয়। তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করতে করতে রাজঘাটে এসে পৌছালেন। দুর্ভিক্ষ-কাতর

১২। Service Book, Page No. 2. Serial No. 11-22.

লোকের দুঃখ দেখে তাঁর কষ্ট হয়।. তিনি তাঁর নিকটে যা ছিল তাই দিয়ে যব কিনে বিতরণ করলেন। হাতে যা পয়সা ছিল এইভাবে ফুরিয়ে গেল। কোনমতে তৃতীয় শ্রেণীর একখানি টিকিটের মূল্য তিনি কর্জ পান। জিনিষপত্র মালগাড়ীতে দিলেন। ফলে তাঁর যে সব মূল্যবান দ্রব্যাদি ছিল তা' চুরি হয়ে গেল। পরের কষ্ট দূর করতে গিয়ে তাঁকে যে কত সময় কত বিপদে পড়তে হয়েছে তাঁর শেষ নেই।

১৮৮১ থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত ভারত সরকারের অধীনে রাজস্ব বিভাগে তিনি চাকরী করেন। এই রাজস্ব বিভাগে কর্মরত অবস্থাতেই তিনি দেশের শিল্প ও কৃষির জন্যে অনেক চেষ্টা করেন। ১৮৮৩ সালের কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কোন কোন বিষয়ের অধ্যক্ষভার ত্রৈলোক্যনাথের প্রতি অর্পিত হয়। তা'ছাড়া নানা দ্রব্যাদি বিচার করে মেডেল দেওয়ার জন্য তাঁকে একজন বিচারকের পদে নিযুক্ত করা হয়।

১৮৮৬ সালে বিলাতে এক আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীতে ভারতের পক্ষে ত্রৈলোক্যনাথকে বিলাত যেতে হয়। দেশের বহু উপকারের সম্ভাবনায় তিনি গেলেন। এই বিলাত যাওয়া ব্যাপারে বড় ভাই রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁর বিশেষ মনোমালিন্য হয়। দাদা ছিলেন একান্তভাবে ধর্মনিষ্ঠ গোড়া ব্রাহ্মণ। ধর্মের জন্য, দূরত্বের জন্য, অথবা অন্য কোন কারণে ভাইকে অত দূরদেশে যেতে দিতে তিনি চাননি। কিন্তু মনে মনে দাদার প্রতি সমান ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান বজায় রেখেও, তিনি দাদার কথা মান্য করতে পারেননি. বিলাতে তিনি গেলেন। বিলাতে সকলেই তাঁকে সমাদর করে। মহারাণী হ'তে আরম্ভ ক'রে, রাজপরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি, ডিউক-বর্গ প্রভৃতি সকলেই সসম্মানে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। এটা শুধু তাঁর গৌরব নয়, সমগ্র ভারতেরই গৌরব। সেই পরাধীন দেশে ভারতের পক্ষ থেকে ত্রৈলোক্যনাথ যে সমাদর পেয়েছিলেন, তাতে হয়তো ইংরেজজাতির উদারতার পরিচয় আছে, কিন্তু শুধুই কি তাই? এতে ত্রৈলোক্যনাথের, তথা সমগ্র ভারতেরই চরিত্রগত গুণের প্রকাশও লক্ষ্য করা যায়। বিলাতে গমনকালে কয়েকজন উদারহৃদয় সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে বিলাত গিয়ে তিনি নিজের স্বার্থের প্রতি একেবারে দৃষ্টি রাখবেন না। তিনি যদি এভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নাও হতেন তবুও যে এ আদর্শ পালন করে যেতেন তাতে সন্দেহ নেই। কেননা এ শপথ তো তাঁর অন্তরে

চিরদিন ধরেই জাগ্রত আছে,—সে দেশেই হোক আর বিদেশেই হোক। তিনি এই প্রতিজ্ঞাকে সারাজীবন ধরেই পালন করে গেছেন। বিলাতের কোন কোন বড়লোক তাঁকে উচ্চপদ পাওয়ার জন্যে ভারতের গভর্নরের নিকট চিঠি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হন নাই। ১৮৮৬ সালের ১২ই মার্চ তিনি বিলাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ অন্তে ১৮৮৭ সালের ৩রা জানুয়ারী ইউরোপের মাটি ত্যাগ করেন। তাঁর ইউরোপে মোট অবস্থানকাল ৮ মাস ২৭ দিন।[১৩]

এই বিলাতে অবস্থান কালে ত্রৈলোক্যনাথ আহারাদি ব্যাপারে কি উপায় অবলম্বন করেছিলেন এ প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে। আজকের দিন হলে এ-কথা মনে আসতো না। কিন্তু সেই যুগে, যখন সাগরপারে গেলেই ধর্মনাশের ভয় ছিল, তখন একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের লোক হয়ে, ত্রৈলোক্যনাথ কি ভাবে ব্রাহ্মণের শুচিতা বজায় রেখেছিলেন তা তাঁর লেখা থেকেই জানা যায়। তিনিই বলেছেন যে বিলাতে এই কয় মাস, যতদূর সম্ভব তিনি আহারাদি বিষয়ে দেশাচার রক্ষা করে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ ছিল এবং হিন্দুর আহারোপযোগী খাদ্যসামগ্রীও প্রচুর পরিমাণে ছিল। তা' ছাড়াও তিনি বলেন, "A Hindu in England, if he so chooses, can keep his caste intact."[১৪] তবে তিনি বিলাতে এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে হোটেলেই আশ্রয় নিয়েছেন। লণ্ডনে পৌঁছিয়ে ব্লসমবেরীতে Mueum Hotel এ তিনি অবস্থান করেন। এই হোটেলটি কোন বিশেষ ধরনের ভাল হোটেল নয়, সাধারণ ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক প্রবাসকালে ঐ শহরে এ' হোটেলটিতে উঠত। শুধু এখানেই নয় ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, পরে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, ইটালী প্রায় সর্বত্রই তিনি হোটেলের আশ্রয় নিয়েছেন। তা'ছাড়া, রেস্টুরেণ্ট, কফিহাউস ইত্যাদি স্থানেও তিনি বিভিন্ন সময়ে গিয়েছেন। কিন্তু খাওয়া দাওয়া ব্যাপারের কোন কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেননি। তবে এ-কথা তিনি বলেছেন যে বিভিন্ন স্থানে তাঁকে যে আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়, তাতে মদ ও গোমাংস দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি তা' গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হন।

১৩। A Visit to Europe, Page—397.

১৪। A Visit to Europe, Page—116.

তাঁর মনে ব্রাহ্মণত্বের বিশেষ কোন অভিমান ছিল না। আমরা তাঁকে বলতে শুনি, "A true Brahman belongs to no nation or no creed in particular, he belongs to all."[১৫] তবে দেশকে, জাতকে বংশকে অবহেলা কখনও করেননি। তাই আত্মীয় স্ব'জনের মনে ব্যথা দিয়ে বিলেত গেলেও তাঁরা যা চান না এমন আচরণ তিনি জীবনে করতে পারেন না। তবে বিলেত যাওয়া ব্যাপারে আমাদের দেশের লোকের মনে যে দুর্বলতা ছিল তিনি কখনও তাকে সমর্থন করেননি, বরং দুঃখ করেই বলেছেন, "I was sorry for the unreasonable prejudices of my country-men. While I respect honest conviction, I cannot but abhor moral cowardice and dishonest opposition. It is a fact that among those opposed to Hindu's coming to England are well-educated men, who occupy the very highest position in the enlightened native community, and who in India trample under their feet all caste rules and traditions and all orthodox Hindu injunctions."[১৬] ত্রৈলোক্যনাথ ইউরোপীয় দেশে গমনের মধ্যে কোন অকল্যাণজনক কিছু আছে বলে মনে করতেন না বরং বিশ্বাস করতেন পাশ্চাত্য দেশসমূহের কাছে শিখবার, জানবার আমাদের অনেক কিছুই আছে। শেখা ও জানার জন্যেই ভারতীয়দের পক্ষে বিলাতগমন একান্ত প্রয়োজনীয়। তাদের ভালটুকুকে গ্রহণ করেই আমাদের দেশে নবজাগরণের সাড়া পড়বে। পাশ্চাত্যের সহিত সহযোগিতার মধ্যে দিয়েই ভারতের যথার্থ উন্নতি এগিয়ে আসবে।

বিলাতে গিয়ে শুধুই যে শিল্প কৃষিমেলায় তিনি সময় কাটিয়েছেন তাহাই নয়, তাঁর সেই কর্মের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনীতি ইত্যাদি এক অর্থে ওদেশের সংস্কৃতিকে বুঝে নেবার জন্যে তিনি সব সময় চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই-ই নয়, আমাদের দেশকেও এ' সমস্ত দিক থেকে ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করে দেখেছেন। আর এই তুলনার মধ্যে দিয়ে

১৫। A Visit to Europe, Page—335.

১৬। A Visit to Europe, Page—27-28.

ভারতকে সংশোধিত করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর অন্তরে ছিল। 'A Visit to Europe' গ্রন্থে এই সত্যের বহুলাংশই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ওদেশের ইংরাজ চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। এ-দেশে থেকে আমরা ইংরাজ জাতি সম্বন্ধে যে ধারণা করি তা' ঠিক নয়। প্রকৃত যাঁরা উচ্চ বংশজাত ইংরাজ তাঁরা শিক্ষায়-দীক্ষায়, আচার-ব্যবহারে, অতি আদর্শ স্থানীয়। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের মতকেও স্মরণে আনতে পারি, 'কালান্তর' গ্রন্থে যেখানে তিনি ওদেশের ইংরাজ ও ভারতের ইংরাজকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করে 'বড় ইংরাজ' ও 'ছোট ইংরাজ' বলেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ এভাবে শ্রেণীবিভাগ করে না দেখালেও, ঠিক এ'ভাবটিই বোঝাতে চেয়েছেন। ইংরাজ জাতির মধ্যে তিনি একটি প্রাণ চাঞ্চল্যের ধারাকে লক্ষ্য করেছিলেন, কোন রকম কুসংস্কারের জালে তারা জড়ানো ছিল না। আর ভারত পদে পদে এই অন্ধ সংস্কারে জড়িয়ে আছে। এই জালই তাকে আষ্টে-পিষ্ঠে এমনভাবে বেঁধে রেখেছে যে তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। এই কুসংস্কারজালবদ্ধ সমাজকে কিছুটা মুক্তি দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি বলেছেন, "I came not to England for any worldly benifit. I came with the express purpose of adding one more drop to the current now set in against, prejudice and superstition. The inexorable law of nature is in favour of this current; it is daily gathering strength and the time is now fast approaching when those who are now trying to turn back this current will be looked upon as the whole Hindu community now look upon those who fifty years ago opposed the abolition of the cruel rite of burning alive helpless widows at the funeral pyre of their husbands."[১৭]

আমাদের দেশের সবকিছুই যে খারাপ এ-কথা তিনি কখনই বলতে পারেন না, তবে যে 'Prejudice' ও 'Superstition' ছিল সেগুলোকে কোনদিনই তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে পারেননি। ওদেশের একজন অধ্যাপক, আমাদের দেশের পিতামাতা কর্তৃক স্থিরীকৃত বিবাহের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান

১৭। A Visit to Europe, Page—28.

পেয়েছেন এবং ওদেশের বিবাহ পদ্ধতির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ত্রৈলোক্যনাথও এই অধ্যাপকের মতের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু বাল্যবিবাহ পদ্ধতিতে তিনিও সমর্থন জানাতে পারেননি, ত্রৈলোক্যনাথও পারেননি। তৎকালে বিবাহের নামে ভারতীয় নারীর ভাগ্যে যে নিদারুণ নিপীড়ন ঘটত তাকে তিনি স্বীকার করতে পারেননি। পাশ্চাত্য দেশের "Courtship"—এর মধ্যে প্রেমের যে তীব্রানুভূতি আছে তাকে তিনি অবহেলা করেননি, বরং তার শক্তিকে স্বীকার করে বলেছেন—

"The time of Courtship with its first sensation, the hopes and doubts, and many little things which make one now transcendently happy, now dolefully miserable, they remember in afterdays as the sweetest moments of life. The mind of an oriental Youth can be possessed with a temporary infatuation, but it has really no oppertunity to express the romance of love. The custom of the country has thus deprived him of one the charming excitements of life."[১৮]

সেই যুগে, সেই কালে দাঁড়িয়ে ত্রৈলোক্যনাথ "romance of love" এর যে স্বপ্ন দেখেছেন তাতে তাঁর উদার ও সাহসী মানব মনের পরিচয় পাই। তিনি অন্যত্র ভারতীয় নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে হতাশ হয়েছেন। অবগুণ্ঠনবতী বালিকাবধূর লজ্জাশীলতার অন্তরালে বধূর মনটি যেন কোথায় চাপা পড়ে গিয়েছে। পারিপার্শ্বিক ও পরিবারের চাপে সে জীবন কখনও প্রেমময়ীরূপে প্রকাশ পাবার অবকাশ পায়নি। ভারতীয় নারী যেভাবে সব অবিচারকে তার সহিষ্ণুতার তাপে গলিয়ে নিয়েছেন, তার মধ্যে যিনি যতই নারীত্বের মহত্বকে প্রত্যক্ষ করুণ না কেন ত্রৈলোক্যনাথ কখনও পাননি। তিনি এর মধ্যে বঞ্চিত হৃদয়ের সকরুণ বিলাপ ধ্বনিকেই শুনতে পেয়েছেন। এই অবহেলিত প্রাণের জন্য সহানুভূতিতে তাঁর অন্তর ভরে উঠেছে। এ দেশের নারীকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে তুলতে চেয়েছেন। ভারতীয় নারীদের ভবিষ্যত সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে তিনি

১৮। A Visit to Europe, Page—49.

বলেছেন—"Give us mothers like English mothers to bring up our boys, young girls to spun impetuous youths on to noble deeds, wives to steer our manhood safely, revive and invigorate our rotten society—then India will be regenerated in twenty years' time".[১৯]

জাতিভেদ প্রথার মধ্যেও ত্রৈলোক্যনাথ কোন অর্থ খুঁজে পাননি। অথচ এই ভেদনীতি শুধু এ-দেশেই নয়, পাশ্চাত্য দেশেও রয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে এই 'Caste prejudice' আমাদের দেশের চাইতে সেখানে আরও শক্তিশালীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশে যা ব্যবসা ও ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত, ওদেশে তা Position ও Wealth এর ওপরে প্রতিষ্ঠিত। ওদেশের জাতিভেদনীতি যেন গঙ্গানদীর গতির মতন, হরিদ্বারের গিরিখাতে যার সৃষ্টি, আর বহুজনপদের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে মহাসাগরের বুকে যার লয়। আর আমাদের দেশের জাতিভেদপ্রথা যেন গঙ্গানদীর খালের মতন—সুনির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ। তাঁর মতে কোন জাতির পক্ষেই এই জাতিভেদপ্রথা কল্যাণকর নয়। এই ভেদাভেদনীতি যে কোন দুই জাতির মধ্যে 'Good feeling' গড়ে উঠবার পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। ত্রৈলোক্যনাথ সব সময়ই সবদিক থেকে ভারতের মঙ্গল কামনা করতেন। জাতিভেদপ্রথার মধ্যে যে মানবিকতা বিরোধী, অসংগতি আছে, তাকে দূর করা প্রত্যেক ভারতবাসীর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন। কেননা এই অসঙ্গতি বা গোড়ামিগুলিই জাতীয় উন্নতির পথে প্রবলতম অন্তরায়।

তিনি এবার রাজস্ব বিভাগের কর্ম ত্যাগ করেন এবং ১৮৮৭[২০] সালের ২০শে এপ্রিল কলিকাতা মিউজিয়ামে চাকরি গ্রহণ করেন। রাজস্ব বিভাগে যখন কাজ করছিলেন সেই সময়ে তিনি যে শিল্প ও কৃষি উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন তার কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে[২১] বহুকাল হতে নানারূপ কারুকার্য গঠিত হয়। যথা কাশ্মীর রেশমের কাপড়, পিতলের কাজ, লক্ষ্ণৌ-এর গোটা, চিকণ, সূচের কর্ম, সোনারূপার কাজ, বিদরীর কাজ, মোরাদাবাদের পিতলের উপর মিনাকলম,

১৯। A Visit to Europe, Page—58.
২০। Service Book, Page, 10, Serial No. 51.
২১। বঙ্গভাষার লেখক

নগীনার কাঠের কাজ ইত্যাদি। হিন্দু রাজাদের সময় এবং মুসলমানদের আমলে বাদশাহ, নবাব, আমীর, ওমরাহ—এই সব জিনিসের আদর করতেন। ইংরাজদের অধিকারে এসে এইসব শিল্প লোপ পেতে বসেছিলো। ত্রৈলোক্যনাথ দেখলেন, ইংরাজ কর্মচারীগণ এই সকল দ্রব্য ভালবাসেন, অথচ কোথায় পাওয়া যায়, কিভাবে পাওয়া যায় তা' জানেন না। এদিকে খরিদ্দার অভাবে কারিকরগণ অতিশয় অন্নকষ্ট পাচ্ছিলেন। শিল্পকার্য ছেড়ে ভিক্ষা কিংবা কৃষিকার্যকেই পেশারূপে গ্রহণ করতে লাগলেন। কখনও বা ভিক্ষাবৃত্তিতেও নামতে হয়। ঘোরতর অন্নকষ্ট। এই অন্নকষ্ট দূর করবার মানসে তিনি পাঁচ সহস্র টাকার ঋণ গ্রহণ করলেন। এই টাকায় অতি উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য ক্রয় করে এলাহাবাদ ষ্টেশনের কাছে একটি বড় হোটেলে সেইসব দ্রব্যাদি সাজিয়ে রাখলেন। ত্রৈলোক্যনাথ নিজে সেই হোটেল-স্বামীর সহিত সদ্ভাব করে তাঁকে এইসব দ্রব্য বিক্রয় করবার জন্যে অনুরোধ জানান। এই হোটেলে বিলাতযাত্রী সাহেব মেমরা দুই একদিন আশ্রয় নিতেন। এইসব বিদেশীগণ দেশে যাওয়ার সময় তাঁদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে উপহার দিবার নিমিত্ত এ' সব জিনিস ক্রয় করতেন। এইভাবে হোটেল-স্বামী একজন ধনবান ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের পাঁচ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে অনেক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করতে লাগলেন। কলকাতা বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় নগরে, এমন কি বড় বড় রেলষ্টেশনে যে সব ভারতীয় কারুকার্যের দোকান দেখতে পাওয়া যায় ত্রৈলোক্যনাথই তার উদ্যোক্তা ছিলেন। যে সব দ্রব্য বৎসরে একশত টাকার বেশী বিক্রয় হত না, সেইসব দ্রব্য তখন থেকে সহস্র সহস্র টাকায় বিক্রয় হতে লাগলো। এইভাবে শিল্পকরদের অবস্থা বেশ ফিরল। এমন কি অনেকে সংগতি-সম্পন্ন হয়ে উঠলো। এইসব টাকা বিদেশ থেকে দেশে আসতে লাগলো। ১৮৮৬ সালের ২রা ডিসেম্বরের পরে বিলাতে ভারতীয় কৃষি ও শিল্পদ্রব্য উৎপাদন বিষয়ে বিশেষ তথ্য প্রকাশ করার জন্য তাঁকে "Fellow of the Linnoean Society"[২২] করা হয়। ১৮৭৬ সালে তাঁর নিউমোনিয়া হয়। চাকরী থেকে চারমাসের জন্যে অবসর গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর কাজ থেমে রইল না। একটু সুস্থ হলেই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 'Dyeing, Printing,

২২। Service Book, Page—10, Serial No. 49.

Tanning'—প্রভৃতি শিল্প সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধান করেন ও এই তথ্য প্রকাশ করেন।[২৩] এজন্ত তাঁকে বেশ কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

কৃষির উন্নতির জন্যও তিনি অনেক চেষ্টা করেন।[২৪] গাজোরের চাষ করে ও গাজোর খেয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীগণ প্রাণে বাঁচতে পারে। প্রতি বিঘায় কত গাজোর হয়, চাষাদের ক্ষেত খুঁজে তা স্থির করলেন। এবং এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে নানা তত্ত্ব জানালেন। গভর্ণমেণ্ট এই তত্ত্ব গেজেটে ছাপালেন। শুধু তাই নয়, গভর্ণমেণ্ট জেলায় জেলায় কর্মচারীদের গাজোর চাষ শিক্ষা দেবার জন্য আদেশ দিলেন। দুই বছর পরে রায়বেরেলী, সুলতানপুর প্রভৃতি জেলায় দুর্ভিক্ষের সূচনা হল। সে সময় সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরে যেত, কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায়, এই গাজোরের জন্যে সেবার জনপ্রাণী মরেনি। কৃষি ও শিল্পে কিভাবে দেশকে বিশেষভাবে উন্নত করে তোলা যায়, তার জন্যে তাঁর বিশেষ চেষ্টা ছিল। ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন। এই জন্যই তিনি কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষকে যাতে নতুন নতুন উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে স্বচ্ছল, স্বাবলম্বী করে তোলে তাই-ই ছিল তাঁর অন্তরের বাসনা। শুধু কৃষি নয়, কুটিরশিল্পের উন্নতিও যে দেশের দুঃখ দারিদ্র মোচন করবার অপর উপায় এ-কথা তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতে কি কি দ্রব্য হয়, কোথায় সে সব দ্রব্য, কি মূল্যে পাওয়া যায়—এইসব খবর দিয়ে তিনি একখানি পুস্তক ছাপালেন। এই পুস্তক প্রকাশ ব্যাপারে রাজস্ব বিভাগ তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাল—পুস্তকটির নাম—'A Rough List of Indian Art Manufactures'.[২৫] এই সামান্য পুস্তকের তালিকার গুণে ইউরোপীয়গণের চোখ খুলল। এর ফলে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে লক্ষ লক্ষ টাকার ভারতীয় শিল্প ক্রয়-বিক্রয় হতে লাগলো। সাহেবরা আপনাদের কারুকার্য বিক্রয় করে আমাদের কাছ থেকে টাকা নেয়—সে বিষয়ে ত্রৈলোক্যনাথের তীব্র দৃষ্টি ছিল এবং এ বিষয়ে কিছুটা কৃতকার্যও হয়েছিলেন। চাকুরীজীবনের শেষ দুই বছরে বঙ্গ-সরকারের বিশেষ আদেশে তিনি দুখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন একটি বঙ্গদেশের "Brass and Copper manufactures" ও

২৩। Service Book, Page—3, Serial No. 13, 14.

২৪। বঙ্গভাষার লেখক।

২৫। Service Book, Page—5, Serial No. 23.

অপরটি "Pottery & Glassware." এইসব পুস্তক প্রণয়ন করে দেশের অনেক শিল্পীর প্রভূত উপকার সাধন করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তিনি আর বেশীদিন সরকারী চাকরী করতে পারেননি। এই ভগ্নশরীরের জন্যে ১৮৯৬ সালের ১১ই মার্চ তিনি পেন্‌সন নন।[২৬] রুগ্ন অবস্থাতেও তিনি নানারূপ কর্মে লিপ্ত ছিলেন। পেন্‌সন লইবার সময় তিনি যে বিদায় ভাষণ দেন তা' অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য, তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব সবই তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন, "What charity could be more acceptable to Heaven than a charity to permanently relieve thousands of families from hunger and distress? Whatever could be nobler than the work to bring food and comfort to millions of our fellow beings? What ambition could be higher than the ambition to make a nation rich and prosperous? You, the father of future Generations—go on doing that which will entitle your name to be spoken by posterity in hushed voice, with respect and gratitude." (31st March, 1896.)

১৮৬৬ থেকে ১৮৯৬ সাল—এই তিরিশ বছর তাঁর চাকরী জীবন। উনিশ কুড়ি বছর বয়সে ত্রৈলোক্যনাথ ভাগ্যের অন্বেষণে পথে পথে বেড়িয়ে সামান্য স্কুলমাষ্টার রূপে যে জীবনের আরম্ভ করেন তা' নানাভাবে নানা উন্নতির স্তর পার হয়ে অবশেষে কলিকাতা মিউজিয়ামের কিউরেটার রূপে শেষ হয়। আমরা জানি যদি তিনি চাইতেন তবে চাকরী জীবনে আরও অনেক উন্নতি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা চাননি, তাই তা ঘটেওনি। এখন স্বভাবতই মনে হয়, এ জীবনের আড়ালে তাঁরও একটা সুস্থ, স্বাভাবিক, সুখ-দুঃখে ভরা ব্যক্তি জীবন ছিল, যে-জীবনে তিনি একান্তভাবে পারিবারিক জীবনের প্রেম-প্রীতি ভালবাসার বন্ধনে জড়িত। ব্যক্তি মানুষরূপে তিনি বিশেষভাবেই প্রাণ-খোলা হাসিখুসি মানুষটি ছিলেন। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলেই সেই আমুদে মানুষটির সন্ধান পেয়েছেন। বাইরে যিনি খুসীর হাওয়ায় সকলকে আমোদিত করতেন, অন্তরেও কি তাঁর এ' হাওয়া গিয়ে

২৬। Service Book, Page—20. Serial No. 73.

পৌঁছাতো ? না সেখানটা ছিল একান্তভাবেই বেদনায় ভরানো—তা' জানি না। তার কোন স্পষ্ট আভাস তিনি রেখে জাননি।

ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর বংশধারাকে অনুসরণ না করে চারবার বিবাহ করেন।[২৭] মুখোপাধ্যায় পরিবারে বিবাহ ব্যাপারে একটি বিশেষ ধরনের নিয়মবিধি ছিল। পারিবারিক এই ঐতিহ্যধারাকে বিবাহ-প্রসঙ্গে সকলে মেনে চলতেন, আর যাঁরা না চলতেন, তাঁদের পরিবারে অতি হীন চোখে দেখা হ'তো। সামাজিক ও পারিবারিক কাজ কর্মে তাঁদের অংশগ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। একবার একটি ঘটনা ঘটে।[২৮] শ্যামনগরে কোন বিবাহ অনুষ্ঠানে অনেকেই নিমন্ত্রিত। নিমন্ত্রিতেরা সকলেই উপস্থিত। কিন্তু হঠাৎ একটি গণ্ডগোল বাঁধলো। কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল ত্রৈলোক্যনাথ ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত এবং তিনি আহারে বসেছেন। সকলে তো রেগে চলে যেতে চান। অপ্রস্তুত ত্রৈলোক্যনাথ নিজের অবস্থা বুঝে বাড়ী চলে এলেন। এই বিপর্যয় অবস্থায় কারুণ্য সহজেই অনুমেয়।

এই পরিবারে 'ত্রিকুল-মুকুর'[২৯] নামে একটি পুস্তক আছে। এই পুস্তক থেকে জানতে পারা যায় যে মুখোপাধ্যায় পরিবারটি সুপ্রসিদ্ধ ত্রিকুল-ঘর সম্ভূত। এইরূপ থাক-বাঁধা ঘর বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় নাই। "প্রায় আড়াই শ' বছরের কথা, শ্রীনন্দন নামক, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একজন পূর্ব-পুরুষ, ভ্রমক্রমে পূর্ববঙ্গের কোনও একটি নীচকুলোদভবা ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন। ফলে ইহাদের কুলের বিশেষ কলঙ্ক হয়। তখন কুলে কোনরূপ কলঙ্ক হইলে, কুলীন ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাবিপদ উপস্থিত হইত। শ্রীনন্দন অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। বিশ্বেশ্বর আসিয়া শ্রীনন্দনের সহিত যোগদান করিলেন। অতঃপর মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় নামক আর একটি বন্ধু আসিয়া তাঁহাদের সহিত জুটিলেন। বন্ধুদ্বয় শ্রীনন্দনকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ভায়া হে। আর তোমার কোন আশঙ্কা নাই,—আজ হইতে তোমারও যে দশা আমাদেরও সেই দশা।" অনন্তর তিনজনে ত্রিবেণীর ঘাটে গিয়া গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া, এইরূপ শপথ করিলেন,

(১) আমাদের এই "তিন বংশ" জাত পুত্র-কন্যার সহিত তাহাদের পরস্পরের বিবাহ হইবে।

২৭। বঙ্গভাষার লেখক
২৮। ভূপতি মুখোপাধ্যায় (ভ্রাতুষ্পুত্র)
২৯। ত্রিকুল-মুকুর। (বংশ পরিচয়)

(২) নিতান্ত আবশ্যক না হইলে আমাদের বংশজাত কোন পুত্র, একটির অধিক বিবাহ করিতে পারিবে না।

(৩) পুত্র-কন্যার বিবাহে অর্থ আদান-প্রদান একেবারেই থাকিবে না। যে, কোনরূপ অর্থ প্রার্থনা করিবে, সে চিরকালের জন্য পতিত হইবে। কন্যার বিবাহে কেবলমাত্র এক জোড়া কাপড় ও এক টাকা দক্ষিণা দিয়া কন্যাকর্তা কন্যা সম্প্রদান করিবে।"

আজ পর্যন্ত এই প্রথা চলে আসছে। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ নিজে এ নিয়ম মেনে চলেননি। তিনি চারটি বিবাহ করলেও, কোন বিবাহেই তিনি একটি পয়সাও গ্রহণ করেননি। জানা যায়, বিবাহের কিছু দিনের মধ্যে তিন পত্নী মারা যান। তাঁদের বংশপরিচয় সবই অজ্ঞাত। কেননা বৈবাহিক ঐতিহ্যকে না মানার জন্যে 'ত্রিকুল-মুকুরে' ত্রৈলোক্যনাথের নামের পাশে "ছুটো" লেখা হয়। তাই তাঁর প্রথম পত্নীদের সম্বন্ধে কোন কিছুই জানবার উপায় নেই।

তাঁর চতুর্থ বিবাহ হয় প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে।[৩০] প্রথম স্ত্রীদের কোন সন্তানাদি ছিল না। এই বিবাহ হয় হাওড়া শিবপুরে উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীর সহিত। সুরবালা দেবীর তখন কুড়ি বছর বয়স। সুরবালা দেবী ছিলেন অত্যন্ত ধীর, স্থির, শান্ত প্রকৃতির। এই সময় ত্রৈলোক্যনাথ এক কন্যা ও এক পুত্রের পিতা হন। পুত্রের নাম শ্রীসুধীর কুমার মুখোপাধ্যায়, ও কন্যার নাম পরীবালা দেবী। ১৮৯৫ সালে তাঁর পুত্রের জন্ম হয়। পুত্র ও কন্যা তাঁর অতি আদরের ও স্নেহের ধন ছিল। যদিও বাল্যবিবাহকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন না, তবুও অতি বাল্যবয়সে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে হয়। অতি ধনী ও সদবংশে কন্যার বিবাহ হয়। সব পিতা-মাতার মত, একমাত্র পুত্রকে মনের মত মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলেন। নিজের হাতে পুত্রের লেখাপড়ার যত্ন নিতেন। তবে পুত্রকে এ জন্য অযথা চাপ দিতেন না। তাকে খুশীমত বেড়ানোর এবং খেলারও প্রচুর অবসর দিতেন। পরিবারের সকলের প্রতি বন্ধুর মতো ব্যবহার করলেও, মাঝে মাঝে ত্রৈলোক্যনাথ ভীষণ রেগে উঠতেন। আর যখন রাগতেন তখন যেন আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতেন। কেউ তাঁর সামনে যেতে সাহস করতো না।

৩০। সুধীর কুমার মুখোপাধ্যায়। (ত্রৈলোক্যনাথের একমাত্র পুত্র)।

চাকরীজীবনে ত্রৈলোক্যনাথ কলিকাতায় পটলডাঙ্গায়, ১২নং পটুয়াটোলা লেনে বাড়ী করেন—আনুমানিক ১৮৭৬ সালে। এই বাড়ীতে তিনি কলকাতায় থাকলেই থাকতেন। মাঝে মাঝে, বিশেষ করে গরমের সময় দেশের বাড়ীতে যেতেন। সেদিন প্রবল ঝড়। তিনি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে, হাতে একটি কলম, আজকালকার মতন ঝরণা কলম নয়, 'G' নিব ভরা কলমটি হাতে ধরে তিনি জানালা বন্ধ করতে গেলেন। ঝড়ের ঝাপটায় জানালার কবাটটি এসে তাঁর হাতের কলমে ধাক্কা মারলো। কলমের নিবটি তাঁর বুকের দিকে মুখ করা ছিল। নিবটি বুকে ফুটে গেল। তখন মনে হল সামান্য আঘাত। কিন্তু দুচারদিন যেতেই ক্রমশ সেই ব্যথা বেড়েই চললো। অসহ্য ব্যথা। কলকাতার বাসায় এলেন। ক্ষতস্থানটি সেপ্টিক হয়ে ভীষণ আকার নিল। যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠলো। সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে তাঁর এক ডাক্তার বন্ধু ঐ স্থানটি অপারেশন করেন। কিন্তু অপারেশনটি কৃতকার্য হয় না। অজস্র রক্তধারায় চারিদিক ভেসে গেল। অনেক চেষ্টা, অনেক চিকিৎসা—তবু সবই ব্যর্থ। বুকের ব্যথা সম্পূর্ণভাবে আর সারলো না। সারা বুকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দীর্ঘদিন কাটাতে হল। কেননা সেই ক্ষতস্থানে নালী ঘা হয়ে যায়। কিছুদিন পরে প্রায় ১৯০৭ সালে আবার তিনি টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হন। মুমূর্ষু অবস্থা। মৃত্যু নিকটেই সকলের এরূপ মনে হল। ত্রৈলোক্যনাথ নিজের এইরূপ কঠিন অবস্থা দেখে সাংসারিক কর্তব্যপালনগুলিকে শেষ করে দিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সাময়িকভাবে আরাম পেলেও, শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হলো না। বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে ১৯১০ সালে পুত্র ও স্ত্রীসহ দেওঘর গেলেন। সঙ্গে ঝি, চাকর, বামুন। এখানে এসে কিছুটা সেরে উঠলো। এবার কলকাতায় বাস তুলে দিয়ে স্থায়ীভাবেই দেওঘরে বাস করবেন মনে করলেন। দেওঘরে বেলাবাগানে বরদা বসুর বাড়ীতে ভাড়া নিলেন। বাড়ীটির নাম 'বামাবাস', ষ্টেশন থেকে মাইল কয়েক দূরে, দাঁড়োয়া নদীর তীরে। এই দেওঘরে বাসের সময় থেকেই তাঁর মধ্যে বেশ পরিবর্তন দেখা দিল। যে লোকটি সারাটি জীবন কোথাও মাথা নত করেননি, প্রবল পৌরুষত্বে যিনি একনিষ্ঠ বিশ্বাসী তিনি হঠাৎ কেমন যেন ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা-অর্চনা করতে তাঁকে কেউ বিশেষ দেখেনি। ছেলেদের পূজা করিয়েছেন,

পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ভূপতি মুখোপাধ্যায়কে এবং অপর একজন ভদ্রলোককে (কানপুরে যে বাড়ীতে তিনি থাকতেন সেই বাড়ীরই ভাড়াটে) তিনি দীক্ষা দেন।[৩১] কিন্তু নিজে কিভাবে, কখন যে ধীরে ধীরে সাধনার পথে অগ্রসর হলেন তা' কাউকে বুঝতে দেননি। অতি নিভৃতে সকলের অজ্ঞাতে চলতো তাঁর সাধনা। বাইরের জাকজমক, আড়ম্বর কিছুই ছিল না। তবে জানা যায়, তিনি যেখানে শুতেন, তারই মাথার দিকে একটি টিনের পদ্মের ওপরে একটি "ওঁ" চিহ্নিত দণ্ড থাকতো[৩২]। এটাকে নিয়ে তিনি যেন কি করতেন, কেউ বুঝতে পারতো না। এই সময় থেকেই তিনি নামাবলী ও একশ' আটটা পদ্মবীচির মালা ধারণ করেন। তিনি সব জিনিষের নিখুঁত হিসাব রাখতেন, অত্যন্ত গোছানো স্বভাবের তিনি ছিলেন। এরই মধ্যে নিজের হাতে পূজাবিধি লিখে যান। দীক্ষা গ্রহণের পর থেকেই তিনি মহানির্বাণতন্ত্রের পড়াশুনা করতেন। কিছুদিন ধরে তান্ত্রিক সাধনার পর তিনি পুত্রকে ডেকে বললেন,—"দেখ, আমার বুকের ঘা সেরে গেছে।" সত্যিই সেই ক্ষত থেকে পুঁজরক্ত আর পড়ে না—সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন। দেখে পুত্রও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে ত্রৈলোক্যনাথ বললেন—এ হচ্ছে 'Will Force', তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে দিয়ে তিনি এক অপার্থিব শক্তি সঞ্চয় করেন, তাকে তিনি 'Will Force' রূপে আখ্যাত করতে চেয়েছেন।

দেওঘরে স্থায়ীভাবে তাঁর থাকা হয়নি। এরপর অর্থাৎ ১৯১২ সালে তিনি বেনারসে যান। এই সময় এডওয়ার্ড বাক্ সাহেব কলকাতায় আসেন। ত্রৈলোক্যনাথকে, তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তাঁরই উপদেশমত ত্রৈলোক্যনাথ পুত্রকে কানপুর কৃষি কলেজে ভর্তি করেন, আশা পরে পুত্রও একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবে। ছেলের সঙ্গে তিনিও বেনারসের বাস তুলে দিয়ে কানপুরে চলে আসেন। পরে পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে কলকাতায় আসেন। এই বিবাহেও তিনি কন্যার পিতার নিকট হতে একটি পয়সাও গ্রহণ করেননি। যাহোক, তিনি পুত্রবধূসহ কলকাতাতে রইলেন। কিন্তু এবারও বেশীদিন থাকা হ'ল না। কলকাতা থেকে কানপুর ও সেখান থেকে

৩১। ভূপতি মুখোপাধ্যায়।
৩২। সুধীর মুখোপাধ্যায়।

ডেরাডুনে চলে গেলেন। সঙ্গে পত্নী ও পুত্রবধূ কল্যাণী। ডেরাডুনে এসে পর পর কয়েকটি বাসা বদল করেন—প্রথমে মাস ছয়েক 'Hill View'তে পরে 'Carris Ford'এ থাকেন। এগুলি সবই ছিল সাহেবদের বাড়ী। কিন্তু এখানেও বেশীদিন ভাল লাগলো না। চলে এলেন লতাপাতা গাছে ঘেরা নির্জন পল্লী অঞ্চলে নাম 'খুরবুড়া'। এই পল্লীতে বছরখানেক থাকেন। ডেরাডুনে সবশুদ্ধ আড়াই বছর কাটান। পরে লক্ষ্ণৌতে 'Hewett Road'-এ মাস ছয়েক থাকেন। কিন্তু পুত্রের অসুস্থতার জন্যে তাঁকে কলকাতায় চলে আসতে হয়।

তিনি কোথাও বেশীদিন স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না। শিশুকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অবিরামভাবে তাঁর এই স্থানবদল চলেছে—কখনও বা বাধ্য হয়ে, কখনও বা স্বভাবে। আর এক স্থান থেকে অপর স্থানে যাওয়ার সময় তাঁর কাছে অনেক বই পুরোনো নতুন ম্যাগাজিন, ইত্যাদি থাকতো। ইংরাজী ম্যাগাজিন পড়া ও তা থেকে কার্টুন সংগ্রহ করা তাঁর যেন এক ধরনের 'হবি' ছিল। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে সাহিত্য যেমন থাকতো, তেমনি থাকতো মহানির্বাণতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত। তিনি এডওয়ার্ড বাকের কাছে ইংরাজী অতি উত্তমরূপে শিখেছিলেন। তা'ছাড়া, বাংলা তো আছেই। উড়িয়া, হিন্দী, পারশী, উর্দু, সংস্কৃত ভাষা এবং নরতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রেও তাঁর অধিকার ছিল। এক জ্যোতিষ ও সঙ্গীত বিদ্যা ছাড়া সব বিদ্যাতেই তাঁর অল্পাধিক অভিজ্ঞতা ছিল।

ডেরাডুনে থাকবার সময়েই ত্রৈলোক্যনাথ সংবাদ পান ইটালীতে এডওয়ার্ড বাক্‌ সাহেবের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু যেন তাঁর সমস্ত আশা ভরসাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল। তাঁরই ভরসায় পুত্রকে কৃষি কলেজে পড়াচ্ছিলেন। কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে তাঁর পুত্র নিশ্চয়ই একটা বড় পদ লাভ করবে, আর তার মধ্যেই তিনি নতুন করে বেঁচে উঠবেন। তাঁর মতো পুত্রও সামর্থ্য অনুসারে দেশের প্রভূত মঙ্গলসাধন করবে এই ছিল তাঁর আন্তরিক বাসনা। কিন্তু সাধ আর সাধ্যের মধ্যে যেন নিষ্ঠুর নিয়তি বাধ সাধলো। পুত্রকে যোগ্যতর করে নিজের অপূর্ণ কাজ তার হাতে দেওয়ার আর সুযোগ হ'ল না।

এই সময় কয়েকজন বিশেষ বন্ধুর পরামর্শে ও উৎসাহে তিনি পুরীর সমুদ্র-তীরে জমি ক্রয় করেন। এই সময় পুরীর জমির দাম খুব অল্প। তার

খাজনা একর প্রতি চার আনা মাত্র। তিনি পুরীতে ৩১৪ একর জমি কিনলেন। শেষ বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য ভগ্নমন নিয়ে পুরীর নির্জন আশ্রয়ে চলে এলেন। এ সময় তাঁর আর্থিক সামর্থ্যও বেশী নয়। আর এই সামান্যতম পেন্‌সনের অর্থ থেকে আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেককে তিনি নির্দিষ্ট হারে প্রতিমাসে সাহায্য করতেন। এ সাহায্যদান তিনি শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন। পুরীতে সেই সমুদ্রতীরে বালির ওপরে চাষ করবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেন। সমুদ্রের বাতাসে বালি উড়ে সব গাছ ঢেকে ফেলতে লাগলো। পরে ঝাউগাছ লাগান। তাও মরে যায়। কতরকমে ফণিমনসা গাছের আড়াল দিয়ে ঝাউগাছ বাঁচাতে চাইলেন। কিন্তু সব চেষ্টা নিষ্ফল হ'ল।

১৯১৯ সালে তিনি আবার জ্বরে পড়লেন। এই সময় হাঁটুতে একটি ফোড়া হয়। উঠতে পারেন না। প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে জ্বর থাকলো। এই জ্বর থেকে আর তিনি সেরে ওঠেননি। মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে তিনি এক বিচিত্র বেশে সকলের সামনে দেখা দিলেন। সারা মুখের সেই সুদীর্ঘ দাড়ি গোঁফ আর নেই। হাতে একটি ছড়ি নিয়ে বসে আছেন। কাছে যাঁরা গেছেন প্রত্যেককেই এই ছড়ির আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। এমন কি তাঁর স্ত্রীও এ আঘাত থেকে রেহাই পাননি। একমাত্র পুত্রবধূই এই আঘাত পাননি। কল্যাণীকে তিনি অতিশয় ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন। পুত্র এসে পিতার এই বিচিত্র বেশ ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন ত্রৈলোক্যনাথ বললেন, "যখন এসেছিলাম তখন কি কিছু ছিলো? তাই এখন যাবার সময় সব ত্যাগ করেছি।" তিনি যেন তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। পুত্র তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসতে চাইলেন। কিন্তু পুত্রের কষ্ট, আবার খরচপত্র, সময়ও নেই। তিনি রাজী হলেন না। ১৭ই কার্তিক সোমবার, ১৩২৬ সাল, দিন ২টায় শুক্লাদশমীতে (জগদ্ধাত্রী বিজয়া) ত্রৈলোক্যনাথ ইহলোক ত্যাগ করেন, চিরশান্তিময় মৃত্যুর শীতল কোলে আশ্রয় লন। (ইং ৩রা নভেম্বর, ১৯১৯ সাল) পুরীর সমুদ্রতীরে তাঁরই নির্দেশিত স্থানে তাঁকে দাহ করা হয়।

সুদীর্ঘ ৭৩ বছর ধরে নিষ্ঠুর ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছেন, সুখে-দুঃখে, উত্থানে-পতনে কখনও কোথাও থেমে যাননি। এতবড় ব্যক্তিত্বও শেষকালে এসে এমন এক শক্তিতে বিশ্বাস করেছেন যাকে তিনি 'Will Force' বলেছেন। এই শক্তিকে তিনি সাধনার মধ্যে দিয়ে জেনেছিলেন এবং তারপরে

অচঞ্চল বিশ্বাস রেখেছিলেন। জন্মগতভাবে তাঁর মধ্যে এক বৈরাগী পুরুষের অধিষ্ঠান ছিল। তাই তো জীবনের কোন বন্ধনই তাঁর কাছে প্রবলতম হয়ে ওঠেনি। বন্ধুদের মধ্যে থেকেও মন হতে চেয়েছে, বৈরাগী, ভবঘুরে। মুক্তির সাধনা তিনি এইভাবেই করেছেন। এই মুক্ত মানুষটির কাছে টাকা-পয়সার মূল্য অতি সামান্যই ছিল। ১৮৮৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর ইটালীর রাজা তাঁকে শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহের জন্য সোনার ঘড়ি[৩৩] দিয়ে পুরস্কৃত করতে চান। ইউরোপের অন্যান্য রাজারাও তাঁকে নানা পুরস্কারে অলস্কৃত করতে চান। কিন্তু সেই সব মূল্যবান দ্রব্যাদি অতি সহজেই ত্যাগ করেন। তিনি বলেন, সেই সব দ্রব্য অর্থের দিক থেকে মূল্যবান হলেও তা তিনি গ্রহণ করতে পারেন না। পরিবর্তে যদি তাঁরা শুধু তাঁকে তাঁদের প্রশংসাবাণী দেন তাই-ই যথার্থ মূল্যবান মনে হবে তাঁর কাছে। এই সময়ে তাঁকে বাধ্য হয়ে রাশিয়ার দেওয়া একটি 'Breast Pin'[৩৩ক] উপহার রূপে গ্রহণ করতে হয়। সে যাই হোক, ত্রৈলোক্যনাথের কর্মে ও চিন্তায় তাঁর নির্লোভ অন্তরটিকে চিনতে বেশী কষ্ট পেতে হয় না।

ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন স্বাবলম্বনপ্রিয়, স্বাধীনচেতা, অধ্যবসায়শীল, উদ্যোগী-পুরুষ। তিনি বহুকর্মান্বিত, বহুজন সমাদৃত অথচ নির্লিপ্ত দরদী মানুষ। আজীবন শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞানাদির অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে দেশের মঙ্গল চেয়েছেন। কর্ম থেকে বিশ্রাম নিয়ে, সাহিত্যসেবার মধ্যেও সেই মঙ্গল কামনাই ছিল। তাই শতকর্মের মধ্যেও সাহিত্যরচনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু লেখকরূপে যশ অর্জন করাকে তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেননি। তিনি লিখেছেন, সে লেখা যেন তাঁর বহুকর্মময় জীবনেরই ভিন্নতর প্রকাশমাত্র বলা চলে। 'A Visit to Europe' গ্রন্থের ভূমিকায় N. N. Ghose যথার্থই বলেছেন "Mr. Mukherjee is an unambitious writer।" আবার আর এক জায়গায় ত্রৈলোক্যনাথ নিজেই বলেছেন,[৩৪] "তাহা হইলে এই সামান্য নীরস প্রস্তাব লিখিতেই বা প্রবৃত্ত হইব কেন? উপন্যাস রচনা করিতাম, না হয় তীব্র বাক্যে সাহেবদের গালি দিয়া প্রবন্ধ লিখিতাম। আবালবৃদ্ধ, দেশহিতৈষীরা যার তাঁদের ছানাপোনাটি পর্যন্ত

৩৩। Service Book, Page—8, Serial No. 39

৩৩ক। Service Book, Page—8, Serial No. 39.

৩৪। জন্মভূমি, ১২৯৭ সন, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠা—৮২-৯৩, মাঘ, লৌহ (প্রবন্ধ)।

সাধু সাধু বলিয়া আমার জয়ধ্বনি করিতেন। হায়, সে যশ আমার কপালে নাই। আমার যে গতিবিধি, দীনহীন ভিখারী ভারতবাসীদিগের পর্ণকুটীরে। আমি যে তাদের হাড়ি উটকাইয়া জিজ্ঞাসা করি,—কেমন নন্তরাম, কাল কতটুকু লৌহ নামাইলে, কতকে বেচিলে, দুই দিন ছেলেপিলে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে তো? যাহার গতিবিধি পর্ণকুটীরে, অট্টালিকাবাসীরা তাহাকে ভালবাসিবে কেন? কুটীরবাসীরা কি খায়, কি পরে, যাহার অনুসন্ধান উচ্চ রাজতন্ত্রপরায়ণ জ্ঞানগম্ভীর মহোদয়েরা তাহাকে আদর করিবে কেন?" তিনি দেশকে ভালবেসে, দেশের প্রতিটি ব্যক্তির সুখ-দুঃখকে যেন নিজের বলে জেনেছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ জীবনে সৎ, সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠবার জন্যে সাধনা করেছেন। বিদেশে রামমোহন রায়ের সমাধিস্তম্ভের পাদদেশে যখন তিনি প্রার্থনা করে বলেন, "Show us what is truth, and what is more, give us the courage to act truly throughout our lives."[৩৫] তখন তাঁর গভীর সত্যানুরাগের পরিচয় যেমন পাই তেমনি তাঁর সুমহান স্বদেশানুরাগের পরিচয়ও পাই। তাঁর মধ্যে কোন প্রকার গোঁড়ামি ছিল না। প্রত্যেক মানুষকে তিনি সমান অন্তরে গ্রহণ করতেন, সেখানে ধর্মের বেড়া দিয়ে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতে চাননি। সব ধর্মমতই তাঁর কাছে সমান। সেখানে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ খৃষ্টান নয়। তিনি বলেছেন,— "The world always ignores the fact that man is man whether he be a Christian, Muhammedan or Hindu, and that goodness or the reverse depends more upon the kind of man he is than upon the religion he professes. He esoberises a crude religion or exoterises a subtle religion in proportion to the capacity of his mind...Thus a Hindu remains a Hindu though baptised in a Christian Church or a Theistical Mandir."[৩৬]

ত্রৈলোক্যনাথের এই উদার ধর্মবোধের মধ্যেই বিশ্বমানবিকতার বীজ নিহিত আছে।

৩৫। A Visit to Europe, Page—265.

৩৬। A Visit to Europe, Page—385.

ফোক্‌লা দিগম্বর

ত্রৈলোক্যনাথ-সৃষ্ট উপন্যাস "ফোক্‌লা দিগম্বর"এর নামকরণটিই যেন বলে দেয় যে, এটি ব্যঙ্গ-রচনা। উপন্যাসের বিস্তৃত সম-অসম পটভূমিতে যাদের দেখা পেলাম, তাদেরই শুধু সৃষ্টি করা, তাদের জীবনের ক্রম-বিবর্তনের উত্থান-পতনের, হাসি-কান্নার বিচিত্র তরঙ্গমালাকে উপস্থাপিত করাই যদি একমাত্র লক্ষ্য হ'ত, তা' হলে নামকরণটি অন্যরূপ গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু যেহেতু তিনি ব্যঙ্গ-শিল্পী তাই বোধহয় জীবনের অসঙ্গতির দিকটি তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় না। আর জীবনের সেই অসঙ্গতির দিকটিকেই প্রধানতমরূপে সকলের সামনে তুলে ধরতে চান। যদিও তিনি তাঁর গ্রন্থের নামকরণের কারণ গ্রন্থশেষে দিয়ে গেছেন, তবুও সেইটিকেই প্রকৃত কারণ বলে ধরে নিতে পারি না। মনে হয় লেখকের কার্য সাধনে সিদ্ধি লাভ করবার জন্যেই সেটি একটি উপায় মাত্র। তা' ছাড়া সেই কারণটিও যথেষ্ট ব্যঙ্গাত্মক। মানব চরিত্রের এক চিরন্তন বাসনাই যেন হাস্যকরভাবে চিত্রিত হয়েছে গল্পের শেষ অংশে,—

"মহাশয়!

বিন্দীর মুখে শুনিলাম যে, উজিরগড়ের ঘটনা সম্বন্ধে আপনি একখানি পুস্তক লিখিতেছেন। আমার নাম ইতিপূর্বে কখনও ছাপা হয় নাই। আপনার পুস্তকে আমার নাম ছাপা হইলে, জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিব। সেজন্য আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, আর সেজন্য আপনাকে আমি শত শত ধন্যবাদ করি। কিন্তু আপনার নিকট আমার দুইটি নিবেদন আছে। প্রথম এই যে, আমার নামটি আপনি ভাল স্থানে বড় বড় অক্ষরে ছাপিবেন। তাহা যদি করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমি ভিজিট দিব। দ্বিতীয় এই যে, আমার নাম লইয়া লোকের যাহাতে ভ্রম না হয়, সে বিষয়ে সাবধান হইবেন।...

আপনার বশংবদ

শ্রীদিগম্বর শর্মা।"

দিগম্বরের মত গুণহীন, চরিত্রহীন, বৃদ্ধ যখন জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার আকুল বাসনা নিয়ে পত্র লেখে তখন তা' আমাদের কাছে অত্যন্ত হাস্যকর বলে মনে হয়। তা' ছাড়া আরও একটি কারণ আছে, যা আমাদের

কৌতুককে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। দিগম্বরস্থানীয় লোকেরা বিশ্বাস করেন যে জগতে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে বুঝি সব আয়ত্ত করা যায়। তাই তিনি ডাক্তারকে এবারে ভিজিটের লোভ দেখালেন। উদ্দেশ্য, চিরস্মরণীয় হয়ে বেঁচে থাকা। এই বেঁচে থাকার সাধ আমাদের সকলেরই। কিন্তু সাধ আর সাধ্য এক হয় না। তাই আমরা বেঁচে থাকবার যোগ্যতা হারাই। দিগম্বরের কিন্তু সাধ্য থাক আর না থাক, সাধ ছিল, আর সে সাধকে তিনি সফল করে তুলতে চেয়েছেন অর্থের লোভ দেখিয়ে। তাঁর সেই ব্যাকুল বাসনাকে সার্থক করতে গিয়েই উপন্যাসের নামকরণ "ফোক্‌লা দিগম্বর" হয়েছে,—লেখক আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে, অন্তত এই মতই প্রকাশ করেছেন। তবু আমরা বল্‌তে পারি, ব্যঙ্গের চিত্রগুলিকে প্রকটতর করে তুলতে গিয়েই বোধহয় লেখক ফোক্‌লার স্বভাবকে ভুলতে পারেননি। তাই তাঁর নামেই নামকরণ করেছেন।

সে যাই হোক্, নামকরণকে বিচার করা এ আলোচনার লক্ষ্য নয়। আমাদের কাজ অতি সীমিত। উপন্যাসের ব্যঙ্গাত্মক দিকটিকে প্রকাশ করতে গিয়েই উপন্যাসের নামকরণে কিছুকালের জন্যে থমকে না দাঁড়িয়ে আমাদের উপায় থাকে না। কেন না, কুসী, তার 'বাবু', তার মাসি ইত্যাদিকে আবর্তন করে সে কাহিনী পরিণতির পথে ভেসে চলেছিল তার মধ্য পথে ফোক্‌লার আবির্ভাব এক মূর্তিমান প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তার সাধ্য ছিল না প্রেমের স্বাভাবিক সত্যগতিকে রুদ্ধ করে, কুসীর প্রেমের সার্থক সাধনা কখনও বিফলে যেতে পারে না। তাই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে এক অবিশ্বাস্য মিলন রচনায়, আর ফোক্‌লা দিগম্বর কোথায় যেন ভেসে গেছে। তবুও লেখকের যেন উদ্দেশ্য শেষ হয় না। তাই যেন পরিশিষ্টরূপে তিনি বিন্দীর কথা, ফোক্‌লা দিগম্বরের কথাকে জুড়ে দিলেন। এ-যেন মহাভারতের বিরাট বিরাট কর্মচাঞ্চল্যময় পর্বের শেষে মহাপ্রস্থানের পথের কথাই মনে করায়। এত বড় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সে যেন কিছুই নয়, সত্য ঐ মহাপ্রস্থানের পথ। কুসুমের দুঃখ সাধনায় কাহিনী যেন কিছুই নয়, সত্য ঐ ফোক্‌লা দিগম্বরের কথা। তাই এই রচনাকে আমরা ব্যঙ্গ-রচনাই বলব। তবে শুধু ফোক্‌লা দিগম্বরকে দিয়ে ব্যঙ্গ সৃষ্টি করাই তাঁর একমাত্র কাজ নয়, হিউমারিস্টের দৃষ্টি দিয়ে তিনি জীবনকে দেখেছেন, তাই তাঁর ব্যঙ্গ শুধু হাস্যরসে উচ্ছ্বলিত নয়, তা' করুণরসেও অভিষিক্ত।

কাহিনীর প্রথম ভাগ রচিত হয়েছে কুসী ও হীরালালের বিবাহিত জীবনের মধুরতম দিনগুলির মধ্যে হঠাৎ একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই দুর্ঘটনাই কাহিনীর সঙ্গে যাদব ডাক্তারকে সংযুক্ত করেছে, যিনি লেখকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, সমস্ত কাহিনীকে অবলোকন করে গেছেন, কাহিনীর বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছেন। এই প্রথম ভাগে লেখকের গল্প বলার ঝোঁকই বেশী, তবু দু'একটি স্থানে ব্যঙ্গ-সৃষ্টি দেখতে পাই। প্রথমেই দেখি, কুসী তার বাবু, অর্থাৎ স্বামীর চিকিৎসার জন্যে চিকিৎসকের অন্বেষণে রাত্রিতে কাশীর এক গ্রাম্যপথে। লেখক তাঁর নিরাভরণ অপূর্ব সৌন্দর্যরাশিতে বিস্মিত, মুগ্ধ। সেই মুগ্ধ আবেশভরা দৃষ্টিতে তিনি কুসীর মস্তকের অর্ধেক ভাগ কালাপেড়ে শাড়ী দ্বারা আবৃত দেখলেন। তিনি বললেন, "ঝিউড়ি মেয়ে ঘর হইতে বাহির হইলে যেরূপ লজ্জা করা উচিত বোধ করে, অথচ লজ্জা করিতে তাহার লজ্জা হয়, মস্তকের অর্ধভাগ কাপড় দ্বারা আবরণে যেন সেইরূপ ভাব ঠিক প্রকাশ পাইতেছিল। বালিকার হইয়া সেই কাপড়ের আবরণ যেন সকলকে বলিতেছিল—লজ্জা করা আমার উচিত বটে, কিন্তু লজ্জা করিতে এখনও আমি শিক্ষা করি নাই, সেজন্য তোমরা সকলে আমার নিন্দা করিও না।" তবু তো সকলে চুপ করে থাকবে না ক্ষমার চোখে লজ্জাহীনা বধূকে বরণ করে নেবে না। লেখক জানেন দূরপাল্লার সেই গ্রাম-অঞ্চলের বালিকা বধূর প্রতিটি কর্মের সুনিপুণ বিচারের আসরে, অনিন্দিতা রূপে বিচরণ করতে পেয়েছে এমন বধূ প্রায় নেই। স্বভাবকে শাসন দিয়ে মুড়ে রাখা যায় না। তাই কুসীর মত বালিকা-বধূরা অনেক সময়েই বালিকাসুলভ চপলতায় লজ্জাহীন হয়ে পড়ে। অবশ্য এর শাস্তিকে তারা সহ্য করে, তবু কখনও কখনও তাদের কষ্ট-অর্জিত লজ্জার ঘোমটা খুলে যেতে চায়। লেখক পল্লীগ্রামের কঠোর সমাজ শাসনকেই এই সামান্য কয়েকটি লাইনের মধ্যে মৃদু-ব্যঙ্গ করেছেন। প্রথম ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন, "আমি বড় বোকা"। নিজেকে এভাবে বোকা বলে পরিচিত করার মধ্যেও ব্যঙ্গ লুকায়িত। একজন অসহায় সৌন্দর্যময়ী বালিকার দুঃখকে যে তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না প্রস্তুত আহার ফেলে রেখে, সেই নিশীথে যেভাবে তিনি পরের দুঃখে নিজের মনকে মিলিয়ে নিলেন তা' স্বার্থান্বেষী মানুষগুলোর কাছে অবাস্তব, মূর্খতার পরিচয় বলে মনে হবে। কিন্তু লেখক নিজেকে বোকা বলে ঐ স্বার্থগন্ধী মানুষদেরই ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন, যদিও ব্যঙ্গের দিকটা আমাদের

কাছে তিনি যেন গোপন করেই গেছেন। "কিন্তু যাই বাইরে আসিলাম আর আমার অন্তঃকরণ কঠিন ভাব ধারণ করিল। ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া উঠিল। শ্রান্তিজনিত দুর্বলতা অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে মনে কহিলাম,—কি পাগল আমি যে, এই রাত্রিতে পুনরায় এতদূর আসিতে অঙ্গীকার করিয়া বসিলাম।"—লেখকের এই ধরনের উক্তিই যেন কতকটা ব্যঙ্গাত্মক। আমরা সব সময়ে লাভের দিকটা হিসাব করে কাজ করি। নিঃস্বার্থ কাজ যাঁরা করেন তাঁদের নাম অতি অল্প। তাঁরা নিঃসন্দেহে মহৎ। আমরা সকলেই মহৎ হ'য়ে উঠি এমন দুরাশা লেখক করেন না। কিন্তু আমরা ইচ্ছে করলেই একটু নিঃস্বার্থ, একটু পরোপকারী হতে পারি। আর আমাদের এই একটুকু ত্যাগই জগতে অনেকের অনেক উপকার সাধন করতে পারে। আলোচ্য কাহিনীর যাদব ডাক্তার কুসীকে দেখে যেভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন তার মধ্যে তাঁর মানবতার পরিচয়ই ফুটে ওঠে। কুসী সুন্দরী, অল্পবয়স্কা, সেই নির্জন নিশীথ-অন্ধকারে তার পক্ষে একাকী পথে গমন সমূহ বিপদের সম্ভাবনা, অপরদিকে তার জীবনসমস্যা—এরূপ স্থলে যাদব ডাক্তার যেভাবে একাধিকবার তাদের গৃহে গমন করে', তাদের বিপদের দিনের সহায় হয়েছেন, তা' আমরা সকলেই করতে পারি, কিন্তু করি না, আমাদের সঙ্গে যাদব ডাক্তারের এইখানেই পার্থক্য। তাই যাদব ডাক্তারের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু সেই সমাজকে নয়, চিরকালের স্বার্থপরতা, নীচতাকে অলক্ষ্যে ব্যঙ্গ করে যায়।

মানব মনের চির-অসঙ্গতির দিকটিকে নিয়ে লেখক কৌতুক করেছেন নিম্ন উদ্ধৃতিতে,

"সুতরাং যতদিন গত হইতে লাগিল, ততই তাহারা আমার স্মৃতি-পথ হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। অবশেষে আমি তাহাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া যাইলাম। কুসী ও বাবু বলিয়া পৃথিবীতে যে কেহ আছে, তাহা আর আমার মনে বড় হইত না।"—যে কুসীকে কন্যা বলে গ্রহণ করলেন, যাকে ছেড়ে আসতে তাঁর অন্তর ব্যথায় ভরে উঠেছিল, তাকে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি একেবারে ভুলে গেলেন। মানব স্বভাবের এই অসঙ্গতি অতি বিচিত্র। আজ যাকে এত মূল্যবান বলে' মনে করছি, কাল তা' বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। স্মৃতি-বিস্মৃতির এই অসামঞ্জস্য আমাদের যেন পরিহাস করে। ব্যঙ্গ-শিল্পী তা' বুঝতে পারেন। তাই যাদব ডাক্তার কৌতুকচ্ছলে এই উপরে উদ্ধৃত মন্তব্য করেছেন। মানব স্বভাবের এই অসঙ্গতি মূর্ত হয়ে

উঠেছে রসময়বাবুর স্বভাবের মধ্যে। কুশীকে মাত্র ছয়দিনের রেখে, রসময়বাবুর প্রথমা পত্নী যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আমরা রসময়বাবুকে বলতে শুনি যে, তাঁর অন্তঃকরণ নিতান্ত কোমল। সে সময় কাজকর্ম তিনি কিছুই করতে পারেননি। তাই চাকরী ছেড়ে পাগলের ন্যায় দেশভ্রমণে বের হয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই অশেষ দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এমন কি পত্নীর রূপ ও স্বভাব যার মধ্যে প্রতিবিম্বিত, সেই আত্মজার স্নেহমাখা মুখকে পর্যন্ত ভুলে গেলেন। সুদূর ব্রহ্মদেশে গিয়ে এক বর্মী রমণীর মধ্যে তিনি সুখের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই রমণীর মৃত্যু তাঁকে আবার উদাসী করেছে। তাঁর শরীরটা কিছু "মায়াবী"। সহজেই কাতর হয়ে পড়ে। এই কাতরতা আবার তাঁকে বিবাহ করতে প্রলোভিত করে। তাই ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে নিজে নূতন করে বিবাহ করে ফেলেন। আর নিজের দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্যে বলেন, "নিজে বিবাহ করিব বলিয়া যাই নাই। কিন্তু দেশে উপস্থিত হইয়া একটি বড় পাত্রী মিলিয়া গেল। আমার মন উদাসী ছিল। আমি নিজেও বিবাহ করিলাম। বিদেশে বিবাহ দিবার নিমিত্ত কেবল কন্যাকে ঘাড়ে করিয়া আনা ভাল দেখায় না, সেই কারণে নববিবাহিতা স্ত্রীকে সঙ্গে আনিলাম।"—রসময়বাবু জানেন তাঁর এই বিবাহতে তাঁর স্বভাবের স্বার্থান্বেষী মনোবৃত্তিই জয়ী হচ্ছে তবু তাকে যুক্তি দিয়ে স্বাভাবিক করে তুলতে চান। এইখানেই তাঁর চরিত্র হাস্যকর হয়ে পড়ে। আঘাতের পর আঘাত এলেও আমরা যে নূতন করে বন্ধন রচনা করতে যাই, শোককে, স্মৃতিকে ভুলে যাই,—এসবই মানব-স্বভাবের এক অবিশ্বাস্য অসঙ্গতিময় দিক। ব্যঙ্গ-শিল্পীর চোখে এ অসঙ্গতি ধরা পড়ে, এতে তিনি হাসতে পারেন না, উপহাস করেন না, শুধু সত্যকে দেখিয়ে দেন, ভুলকে ভেঙ্গে দিতে চান। তবু মানুষ ভুল করে। আর তার ভুলের বোঝা দিন দিন এত বেড়ে চলে যে সে হাস্যকর হয়ে পড়ে, ঠিক ঐ রসময়বাবুর মতো।

তৎকালীন সমাজের সর্বপ্রকার নীচতা, হৃদয়-হীনতা নিষ্ঠুরতার, লেখককে অত্যন্ত কাতর করে তুলতো। এই সামাজিক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন উপায়ই ছিল না। ত্রৈলোক্যনাথের স্পর্শকাতর প্রাণ ঐ নিষ্ঠুরতার করুণ চিত্রগুলি তাঁর রচনার বিভিন্ন স্থানে তুলে ধরলো, উদ্দেশ্য সেই সমাজকে ব্যঙ্গ করে তাদের কিছুটা মানবিক করে তোলা। সেই সমাজের নারীদের দুঃখ তাঁকে সব চাইতে বেশী মর্মাহত করত। তাই তাঁর

রচনায় নারী কোথাও অবহেলিত হয়নি, কোথাও তারা হাস্তাস্পদ হয়ে ওঠেনি। (অবশ্য এ প্রসঙ্গে দু'একটি চরিত্রকে বাদ দিয়ে রাখতে পারি।) ত্যাগে, ক্ষমায়, সহিষ্ণুতায়, ধৈর্যে, প্রেমে, ত্রৈলোক্যনাথের নারীচরিত্র চির-গৌববান্বিত। অসীম লাঞ্ছনা তারা নীরবে সহ্য করে চলে, প্রতিবাদ করার উপায় নেই, শক্তি নেই। লেখক তাদেরই হয়ে প্রতিবাদ করেছেন, কখনও তা' মৃদু, কখন বা মুখর।

কোন এক অসহায় নারীর লাঞ্ছনায় লেখক সমব্যথী হয়ে উঠলেন, মনে পড়ে গেল, সেই দুর্যোগময় বাদল দিনে গলিত, ছিন্ন, ময়লা বস্ত্র পরিহিত এক জ্ঞানশূন্য ভদ্রমহিলাকে। এই মহিলা আর কেহই নন, তিনিই কুসীর মা ও রসময়ের প্রথমা পত্নী। লেখক তাঁর কাহিনীতে এক সুদীর্ঘ স্থান জুড়ে এক সূতিকাগারের বর্ণনা দিয়েছেন। সেই বর্ণনাটুকু পড়লেই আমরা বুঝতে পারবো যে লেখক সেই সমাজের ঘৃণ্য ব্যবহারে কতখানি মুহ্যমান, সেই সমাজের বিধানের পরে কি মাত্রায় বীতশ্রদ্ধ।

"বর্ষা কাল। দুর্জয় বাদল। টিপ টিপ করিয়া সর্বদাই জল পড়িতেছে। মাঝে মাঝে একপ্রকার ঘোর করিয়া প্রবল ধারায় বৃষ্টি হইতেছে। হু হু করিয়া শীতল পূর্ববায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ঘর হইতে বাহির হয় কাহার সাধ্য। এই দুর্যোগে নারিকেল-পত্র দ্বারা আবৃত সেই চালার ভিতর এক ভদ্রমহিলা শয়ন করিয়া আছেন। একখানি গলিত, নানা স্থানে ছিন্ন, পুরাতন, ময়লা বস্ত্র স্ত্রীলোকটি পরিধান করিয়াছিলেন। সেইরূপ একখানি ছিন্ন, পুরাতন মাদুর ও ছোট একটি ময়লা বালিশ ভিন্ন আর কি'ছু বিছানা ছিল না। যে মৃত্তিকার উপর এই মাদুরটি বিস্তৃত ছিল, তাহা নিতান্ত আর্দ্র ছিল। তাহা ব্যতীত নারিকেল পাতার ফাঁক দিয়া, মাঝে মাঝে জলের ঝাপটা আসিতেছিল; তাহাতে বিছানা, স্ত্রীলোকেটির পরিধেয় কাপড় ও সর্বশরীর ভিজিয়া যাইতেছিল। সেই পাতার ফাঁক দিয়া সর্বদাই বাতাস আসিতেছিল। সেই জলে, সেই বাতাসে, সেই ভিজা মাদুরে, সেই ভিজা কাপড়ে স্ত্রীলোকটি পড়িয়া ছিল। এরূপ অবস্থায় সহজ মানুষের কম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু সে স্ত্রীলোকের অবস্থা সহজ ছিল না। বিছানার নিকট কিঞ্চিৎ দূরে কাঠের আগুন জ্বলিতেছিল। আগুন জ্বলিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে সে চালার ভিতর বিন্দুমাত্র উত্তাপের সঞ্চার হয় নাই। স্ত্রীলোক এবং আগুন এই দুইয়ের মধ্যস্থলে ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা আবৃত একটি নব-প্রসূত শিশু

নিদ্রা যাইতেছিল। আজ চারিদিন এই শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাই সূতিকাগার।”

এইরূপ স্থানে পীড়িতা প্রসূতিকে দেখে ডাক্তার জলে উঠে দু'একটি কথা যেই বললেন, অমনি কোন এক প্রতিবাসী ঝাঁজিয়ে উঠে বলেন, “আপনি যে বিলাতী সাহেব দেখিতে পাই। আপনার বাড়ীতে কি হয়? আপনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আপনার আঁতুড় ঘরের জন্ম মারবেল-পাথরের মনুমেণ্ট প্রস্তুত হইয়া ছিল না কি?” আর রসময় বলেছিলেন যে, দু'চারটি নারকেল-পাতা দিয়ে চিরকাল তাঁদের আঁতুড় ঘর হয়। অন্যথা করলে সকলে তাঁদের নিন্দা করবে। জীবনের মূল্য পর্যন্ত এই লোকনিন্দার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। জীবনের থেকে বিধান যেখানে প্রবল হয়ে উঠে সে বিধানকে, সে সমাজকে, কোন মতেই লেখক ক্ষমা করতে পারেন না।

সেই সমাজে মায়েদের যখন এই নির্যাতন, কন্যাদের কপালে তখন কি সুখ ঘটতে পারে! তাই তো দেখি অসুস্থ, মৃতপ্রায় কন্যাকে অতি বৃদ্ধ, কদাকার-চরিত্রহীনের হাতে সঁপে দিতে পিতৃহৃদয় এতটুকু বিচলিত হয় না। কুসীর পূর্ব-বিবাহের দারুণতম শোকই কুসীকে মৃতপ্রায় করে তুলেছিল। রসময় সে কথা জানেন না, তা' মানি। কিন্তু তিনি তো দেখতে পেলেন যে কন্যার শরীরের ও মনের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা তাতে সে মুহূর্তে তার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। তারপর তাঁর নির্ধারিত পাত্রটিকে দেখলে ভাল মানুষেরও অসুখ দেখা দিতে পারে। একজন বরযাত্রী আস্তে আস্তে বললেও, যথার্থই বলেছিলেন,—“ভূত—আপনার চেহারা দেখিলে ভয়ে পালাইবে না?” যেখানে বরের চেহারা দেখে ভূতও পালিয়ে যায়, সেখানে একটি কোমলা সরলা বালিকার যে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হবে তা'তে আর আশ্চর্য কি! কুসীর যেরূপ অবস্থা হয়েছিল, হীরালালের শোক না পেলেও, সেরূপ হ'ত। সে সমাজে কন্যার, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ভাললাগা বা ভালবাসার কোন স্থান ছিল না। পিতা যে কোন উপায়ে কন্যাদায় হ'তে মুক্ত হলেই হল। এ-হেন সময় আমরা রসময়ের মুখে শুনি—“পাত্র দেখিতে সুপুরুষ নহেন, বয়সও হইয়াছে। তবে সঙ্গতিপন্ন লোক। কন্যা আমার সুখে থাকিবে।”...অন্যত্র বলেন, “ফোক্‌লা দিগম্বরের নাম শুনেন নাই? তাহার যে অনেক টাকা। এ অঞ্চলের সকলেই যে তাহাকে জানে।”—কন্যার সুখকে বোধহয় ফোক্‌লার টাকা দিয়েই পরিমাপ করে নিতে চেয়েছিলেন রসময়, তাই

তাঁর মুখে বার বার শুনি—কন্যা আমার সুখে থাকবে। আসলে এই রকম অবস্থায় অগ্র-পশ্চাৎ লক্ষ্য করেও যদি পিতা মিথ্যা সুখের স্তোকবাক্য শুনিয়ে কন্যাকে বিবাহিত করিতে বাধ্য করেন তবে তা' হত্যারই সামিল হয়। সেযুগে সহমরণ প্রথার নিষ্ঠুরতা অতি ভয়াবহ বলে মনে হয়। কিন্তু এই যে বিবাহের নামে বলিদান এও কি তার চেয়ে কোন অংশে কম নিষ্ঠুরতম কাজ! কুসীর ভাগ্যলিপি অন্যরূপে রচিত হয়েছিল, তাই রক্ষা, কিন্তু এরূপ কত শত কুসী যে বিবাহের কুটিল-চক্রে জীবনের সকল সাধকে হত্যা করতে বাধ্য হত তার শেষ নেই। এদের এই অসহায় বেদনা লেখককে বেদনা-ভারাতুর করে তুলতো, তাই তো তাদের চিত্রকে তাঁর গল্পের নানা স্থানে এনেছেন। উদ্দেশ্য শুধু ঐ করুণচিত্র অঙ্কন করাই নয়। ঐ কারুণ্যের পাশে রসময়ের মত লোক-গুলোকে দাঁড় করিয়ে তাদের নীচতাকে প্রকাশ করে তোলা, আর তাদেরও ঐ সমাজ পরিবেশকে প্রকাশ্যভাবেই ব্যঙ্গ করা।

এবার আমরা যদি বর ও বরযাত্রিমহলে একবার যাই তা'হলেই বরের চেহারাটিকে দেখে নিতে পারি, আর বুঝতে পারি এই বিবাহ কি পরিমাণে হাস্যকর। হাস্যরস সৃষ্টির সঙ্গে সমান তালে ব্যঙ্গ করে চলেছেন। হাস্যরসের অন্তরালে করুণরসও যেন টলটল করে ভেসে ওঠে। এখানে লেখকের ভাষাতেই ফোক্‌লার রূপ বর্ণনাটি যথাযথ হবে এই আশায় উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল,—

"বরের পরিধানে মূল্যবান্ চেলি, গায়ে ফুলকাটা কামিজ, গলায় দীর্ঘ সোনার চেন, হাতে পাথর বসান পানিপথের খাঁতি। ফল কথা, বরসজ্জায় কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। যুবা বর হইলে এরূপ সজ্জা করে কিনা, সন্দেহ। কিন্তু সজ্জা হইলে কি হয়, বরের রূপ দেখিয়া আমার হরিভক্তি উড়িয়া গেল। বয়স ষাটি বৎসরের কম নহে, কৃষ্ণকায়, মুখে একটিও দাঁত নাই, মাথায় একগাছি কাল চুল নাই; অতি কদাকার বৃদ্ধ। তাহার পর, সেই ফোক্‌লা মাড়ি বাহির করিয়া বিবাহের আনন্দে যখন তিনি রসিকতা করিয়া হাস্য করিতেছিলেন, তখন এরূপ কিভূত কদাকার রূপ বাহির হইতেছিল যে, সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার দুই গালে দুই থাবড়া মারিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছিল।" লেখক যে এ বৃদ্ধের গালে মারবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! এমন কি আমরাও লেখকের সঙ্গে একমত হতাম যদি সেখানে উপস্থিত থাকতাম। কিন্তু সেই সমাজ কোন প্রতিবাদই করেনি, শুধু একটু রঙ্গ-পরিহাস

করেছে মাত্র। কেউ বা বরের দাঁতিখানি লুকিয়ে রেখেছে, কেউ বা অন্য কিছু করেছে। ফোক্‌লা দিগম্বর যখন বলেন—"দাঁতিখানি ট্যাঁকে গুজিয়া না রাখিলে বরের অকল্যাণ হয়।...এ সময় কিছু লোহার দ্রব্য শরীরে না রাখিলে ভূতে পায়".. তখন আমরা ফোক্‌লা দিগম্বরের মূর্খতা দেখে না হেসে থাকতে পারি না। তাঁর বুদ্ধিহীনতার পরিচয় আরও চরম হাস্যকরতায় পৌঁছিয়েছে—বিবাহ সময়ে। প্রথমেই দেখি বিবাহের লগ্ন এসে পড়ায়, বরকে যখন গাত্রোত্থান করতে হবে সেই মুহূর্তে তিনি চীৎকার করতে লাগলেন "কিঁষ্টা! কিঁষ্টা কুঁথায় রে! ·ঐ! শীগ্‌গির আয়! লগ্ন ভষ্ম হয় যে রে!" বরের এ ধরনের চেঁচামেচিতে কিষ্টা তাড়াতাড়িতে একছড়া ফুলের মালা এনে দিগম্বরের হাতে দিল। মালা পেয়ে বর হৃষ্টচিত্তে তা' গলায় দিয়ে গাত্রোত্থান করলেন। এ পর্যন্ত দিগম্বরকে যেভাবে পেলাম তা' যথেষ্ট হাস্যবহুল। এই হাসি এখানেই থামাতে পারি না। এর পরেই কুসীর অসুস্থতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যে প্রথম লগ্নে বিবাহ হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় লগ্নে বিবাহ সভায় কুসীকে জোর করে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে যখন মুখ থুবড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায় তখন ফোক্‌লা দিগম্বরের হাবভাব, কথাবার্তা অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। দিগম্বর ক্রোধের সঙ্গে বলেন, "তুমি তো বড় তেরপস্ত দেখিতে পাই! কি বলিয়া তুমি আমার স্ত্রীকে কোলে লইয়া বসিলে? ডাক্তারি করিবে ডাক্তারি কর; পরের স্ত্রীকে কোলে করিয়া ডাক্তারি করিতে হয়, এ তো কখনও শুনি নাই!" এরপর এই দিগম্বর যখন উগ্রমূর্তি ধারণ করেন তখন তা উপভোগ করার মত। তাম্বুলরঞ্জিত লালা,—রক্তের ন্যায় তাঁহার দুই কষ দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।.........তাহাকে ঠিক যেন রক্তমুখী মন্দা-কালীর ন্যায় দেখাইতে লাগিল। দিগম্বর মহাশয়কে বৃদ্ধ বললে তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। তাই তিনি রুদ্র মূর্তি ধারণ করেন। তা' না হলে তিনি অতিশয় ভাল ব্যবহার করেন, অন্তত তাঁর এই বিশ্বাস। তিনি তাঁর সহৃদয়তার বশবর্তী হয়ে মূর্ছিত কুসীর কাছে গহনার লোভ দেখালেন এবং ছোট্টু সিংহের নিকট হতে কিষ্টাকে গহনার বাক্স নিয়ে আসতে আদেশ করলেন, তাতেও যখন সকলে বিরক্ত হয়ে গেল তখন তিনি ডাক্তারকে ভিজিট দেওয়ার প্রলোভন দেখাতে লাগলেন—যাতে ডাক্তার কুসীর মস্তকটি দিগম্বরের কোলে স্থাপন করে। ভাল কথায় না পেরে শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের গালে চপেটাঘাত করতেও তিনি পিছপাও হননি।—এমন যে বিয়ে পাগলা বুড়ো; যার সব

হাবভাবই হাস্যকর, তাকেই লেখক উপন্যাসের মধ্যে দাঁড় করিয়ে প্রচুর হাস্যরস বিতরণ করেছেন। মানুষের স্বভাবের কি অসঙ্গতি! ভাবলে বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না। ফোক্‌লা দিগম্বররা আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌তে পারে সেই সমাজের সুযোগ পেয়ে। আর জীবনের প্রান্তে এসেও যারা প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠ্‌তে না পারে, তারা মানুষ নামের অযোগ্য। টাকা দিয়ে তারা সব কিছুকে কিনে নিতে চান। এই সব উন্মাদ, লোলুপ বৃদ্ধকে লেখক তাই যতদূর পারেন কদর্য, হীন করে এঁকেছেন ও লোকচক্ষে তাদের ব্যঙ্গের পাত্র করে তুলেছেন। উদ্দেশ্য এদের সমাজ থেকে দূর করে দেওয়া, আর ফুলের মত কোমল, কচি বালিকাদের অপমৃত্যুর হাত হ'তে মুক্ত করা।

কুসীর সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় যখন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটলো তখন পাগলা দিগম্বরের মনের যে পরিবর্তন এলো তা'ও লক্ষ্য করার মতো। সন্ন্যাসী পর-পুরুষ হলেও পবিত্র পুরুষ, সুতরাং দূর থেকে ঝাড়-ফুঁক করলে কোন দোষ নেই। এই মনোভাবও যথেষ্ট ব্যঙ্গের। দিগম্বর না হয় বিবাহ-উন্মাদ বৃদ্ধ। কিন্তু সেই পরিবেশের সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখে, ও তার অদ্ভুত মাহাত্ম্যের পরিচয় পেয়ে যেভাবে ধন্য ধন্য করতে থাকে সেদিকটিও ব্যঙ্গাত্মক। সন্ন্যাসীকে কুসী তার হীরালাল বলে চিনতে পেরেই একমাত্র সান্ত্বনা ও শান্তির স্থল বলে যেভাবে তার বুকে নির্ভাবনায় আশ্রয় নেয়, আর সকলে তা' বুঝতে পারেনি। তারা তবু এর একটা মানে করে, বলে, "সন্ন্যাসীও বৃদ্ধ ছিলেন না; তাঁহার বয়স অধিক হয় নাই। তথাপি কুসুম তাঁহাকে দেখিয়া কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইল না। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, যাহার পবিত্র হৃদয়; তাহাকে দেখিয়া কেহ লজ্জা করে না। যুবক ও উলঙ্গ শুকদেব গোস্বামীকে দেখিয়া অপ্সরাগণ লজ্জা করে নাই, কিন্তু বৃদ্ধ বল্কল-পরিধেয় ব্যাসকে দেখিয়া তাহারা লজ্জা করিয়াছিল। সন্ন্যাসীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য দেখিয়া, রসময়বাবু প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।" এখানে অবশ্য আগন্তুক সন্ন্যাসী কুসীর "বাবু"ই ছিল, তাই কোন বিপদ ঘটেনি। কিন্তু আমাদের দুর্বল ধর্মীয় মানসিকতাকে অবলম্বন করে সেকালে ও একালে কত ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর দল যে আমাদের কত কি লুটিয়া লইয়া যান তা' আমরা সম্পূর্ণভাবে জানি তবু সন্ন্যাসীদের অলৌকিক শক্তি, মাহাত্ম্যকে বিশ্বাস করি। আমাদের এই ভ্রান্তিকে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন।

বিবাহ আসরে গলা-ভাঙ্গা-দিগম্বরীর আবির্ভাব আবার নূতন করে এক

চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। শুধু চাঞ্চল্য নয়, এক অদ্ভুত হাস্যরসে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কোন প্রকারে দিগম্বর মহাশয়ের স্ত্রী কোথা থেকে যেন জানতে পেরেছেন যে তার স্বামী আবার বর সেজে বিবাহ করতে গিয়েছেন। এই খবরটুকু পেয়েই তিনি তাঁর অনুগত ঝি বিন্দীকে নিয়ে যেভাবে কন্যার গৃহে উপস্থিত হয়েছেন, তা' দিগম্বরের পক্ষে বিপদের কারণ হলেও, আমাদের কাছে সে দৃশ্য যথেষ্ট হাস্যকর। দিগম্বরীর রূপকে যেভাবে লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাতে মনে হয় লেখক দিগম্বরী শ্রেণীর মহিলাদের কিছুটা কটাক্ষ করতে চেয়েছেন। বিশেষ করে, এখানে, দিগম্বরীর পুরুষালী চেহারার মধ্যে নারীসুলভ কোন চিহ্ন যেখানে ছিল না, সেখানে সিঁথিতে ও ললাটদেশের সিন্দুরের প্রাচুর্য যেন এক প্রবলতম অসঙ্গতি নিয়ে শোভা পাচ্ছিল। লেখক এই জন্য ব্যঙ্গ করে বলেছেন,

"মাথার সম্মুখ ভাগে টাক পড়িয়াছিল। শীতলা দেবী কি সুভদ্রা ঠাকুরানীও ললাটদেশের এতখানি অংশ সিন্দুরে রঞ্জিত করেন কি না, তা সন্দেহ। সেই সিন্দুরের ছটা দেখিয়া বোধ হইল, যেন তাঁহার সমস্ত শরীরটি পতিভক্তিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; শরীরে পতিভক্তি আর ধরে না, তাই তাহার কতকটা এখন মাথা ফুঁড়িয়া বাহির হইতেছে।·· তাহার দম্ভপূর্ণ মুখখানি যেন পৃথিবীর সমস্ত নারীকুলকে বলিতেছিল,—"ওরে অভাগীরা! পতিপরায়ণা সতী কাহাকে বলে, যদি তোদের দেখিতে সাধ থাকে, তবে আয়! এই আমাকে দেখিয়া যা; আমি তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত, সাক্ষাৎ পতি-ভক্তি মূর্তিমতী হইয়া আমি এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়াছি।" দিগম্বরকে আমরা বিয়ে পাগলা বলে কত ব্যঙ্গ করেছি, এখন এই দিগম্বরীকে দেখে তা' যেন কতকটা স্তিমিত হ'য়ে আসে। যাঁর এইরকম উগ্রচণ্ডী গৃহিণী বর্তমান তিনি যে জীবনে কত কি পেয়েছেন তা সহজেই অনুমেয়। তবে আর যাই পান না কেন, কোন মহৎ বা গভীর কিছুই পাননি। জীবনকে শুধু প্রবৃত্তির আগুনে জ্বেলেছেন, প্রেমের ছোঁয়ায় পবিত্র করে নিতে পারেননি। আর যেখানে প্রেম নেই, কোন প্রীতির বন্ধন নেই সেখানে মানুষ তো আর মানুষ থাকে না, ক্রমান্বয়ে পশুত্বের সোপান দিয়ে নামতে থাকে। দিগম্বর তাই তাঁর ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী পরিবৃত সুখের সংসারে ডুবে গিয়ে নিজের সুখকে তাদের সুখের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার শিক্ষা অর্জন করেননি। বার বার, টাকার লোভ দেখিয়ে, শাস্ত্র পিতাকে বশ করে, তাদের বালিকা কন্যাদের

সর্বনাশ করবার জন্যে এগিয়ে আসেন। আর সকলের সামনে এসে নিজেকে অমানুষ বলে পরিচয় দেন, হাস্যকর হয়ে ওঠেন, ক্ষমার অযোগ্য হয়ে ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে দাঁড়ান। দিগম্বরীর সিঁদুর-লেপা কপাল দেখে লেখক তাঁর সতীত্ব নিয়ে ব্যঙ্গ করতে যে পারেন তা' আমরা জানি। কেননা যে পত্নী স্বামীর সঙ্গে একান্ত তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞাভরে সকলের সামনেই বলেন, "কৈ! কোথায় সে ফোক্‌লা কোথায়! সে মুখপোড়া নচ্ছার কোথায়?"—তাঁর অন্তরে পতি-ভক্তি যে কতখানি তা' আমরা জানি। ভক্তিতে মানুষ কি এত উদ্ধত, ভয়ঙ্কর হতে পারে! সে যাই হোক, দিগম্বরের মত স্বভাবের লোকের জন্য ঐ জগদম্বা রামণীই উপযুক্ত। এতক্ষণ বিবাহের আসরে কুসীকে লইয়া দিগম্বর যে পাগলামী করছিলেন তাতে আমরা যথেষ্ট কৌতুক উপভোগ করলেও, মনে মনে যথেষ্ট রুষ্ট হয়েছি। কিন্তু এবার পত্নীর সম্মুখে দিগম্বরের অসহায়, ভয়ার্ত, ভাব দেখে আরও বেশী মজা পাই। আর দিগম্বরীকে প্রথমে নিন্দা করলেও তারই জয়ে পুলকিত হই। দিগম্বরের সমগ্র রূপটি এক নিমেষে আমাদের চোখের সামনে স্বচ্ছ হয়ে ওঠায় যেন দিগম্বরকে শক্ত ধীক্কার দিই, তার কাপুরুষত্বই তাকে যেন তীব্র ব্যঙ্গে জর্জরিত করে তোলে। অবশ্য লেখক দিগম্বরী চরিত্রের অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, কুশ্রীতাকে প্রকাশ করে তাকেও কম ব্যঙ্গ করেননি। এখানে দিগম্বরীর অনুগত চাকরাণী বিন্দীর কথা কিছু না বললে যেন সমগ্র আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দিগম্বরীর মত মহিলার অনুরাগী হ'তে হ'লে তা'কে যে বুদ্ধিমতী হতেই হবে তা' সহজেই অনুমেয়। বিন্দীর যে বুদ্ধি কিছু পরিমাণে ছিল তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তার কথায়। সে সব সময়ে গিন্নী-মার মন রেখে কথা বলে—"এই দেখ দেখি গা। মিন্‌সের একবার আঁক্কেল। আর একবার অমনি করিয়াছিল! তোর বয়স হইয়াছে! ঘরে অমন গিন্নী রহিয়াছে! কিন্তু আমার গিন্নী-মা দেখিতে মন্দ কি? চক্ষের কোল একটু বসিয়া গেছে, এই যা!……আমার গিন্নী-মা কেমন শক্ত, কেমন দড় রহিয়াছেন।" বিন্দী বাবুগুলোকেও ভয় করে না। তাই সে নির্ভয়ে বলে—"এই কার দোষ দিব। এই বাবুগুলোই বা কি বল দেখি? চোখের মাথা খেয়ে গয়নার লোভে এই তিনকেলে ফোক্‌লা বুড়োর হাতে তারা মেয়ে গুঁজে দেবে, তা ও বেচারাই বা করে কি?"—স্পষ্টতই এখানে বিন্দী রসময়-শ্রেণীর লোকদের ব্যঙ্গ করেছে। এই বিন্দী যে একজন ক্ষমতাশালী নারী তা' আমরা কাহিনীর শেষ অঙ্কে এলেও দেখতে পাই। শেষ পর্যন্ত সে তার

উদ্ধব-দাকে জোগাড় করে তাকে পুরোহিত করেছে ও নিজে মাইজী স্বামী হয়েছে। আর এই মাইজী-স্বামী হওয়ার জন্যে রং করা আলখেল্লা পরিধান করেছে। এইভাবে সে যে মজাটি আবিষ্কার করেছে তা'তে সত্যি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে। কলকাতা সহরের সব আধুনিকা গৃহিণীদের সহিত তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছে। কারণ সাবিত্রীব্রতের বদলে ঐ আধুনিকা, শিক্ষিতাদের দিগম্বরী ব্রত শিখিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই ব্রতের আদর সঙ্গে সঙ্গে মাইজী-স্বামীর আদরও দিন দিন বেড়ে চলে। কারণ এই ব্রত পালন করলে সব স্বামীরা পদানত থাকে আর "ফিরে জন্মে গলাভাঙ্গা দিগম্বরীর মত তাঁহার রূপ হয়, গুণ হয়, ও পতি-ভক্তি হয়, আর ফোক্‌লা দিগম্বরের মত রূপবান্, গুণবান্, স্ত্রীপরায়ণ স্বামী তিনি লাভ করেন।" লেখক বিন্দী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে একসঙ্গে দিগম্বর, দিগম্বরী, শিক্ষিতা আধুনিকা গৃহিণীদের ব্যঙ্গ করতে পেরেছেন। বিন্দী তার সাধ্যমত সকলকে ঠকায়, কিন্তু নিজে সর্বত্র জয়ী হয়। এ ধরনের চরিত্র আমাদের পাশে পাশেই থাকে। আমরা তাদের চিনতে পারি না। তাদের কথায় মুগ্ধ হই। আর বিন্দী-শ্রেণী হয়তো আমাদের সেই মুগ্ধতা দেখে হাসে, পয়সা রোজগারের পথ তাদের চির-দিন খোলা থাকে। এক এক সময়ে এক এক ভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। আর আমাদের উপহাস করে চলে যায়। তার সেই ভণ্ডামিকে লেখক উপন্যাসের স্বল্প পরিসরে হলেও যেভাবে অঙ্কন করেছেন তা' সু-চিত্রিতই হয়েছে।

'পাপের পরিণাম'

ব্যঙ্গ-শিল্পী তাঁর স্বাভাবিক প্রেরণাবশত মানুষকে সৎ, সুন্দর করে তুলতে চান। একটা জাতির সগৌরবে দাঁড়াতে হলে যে সর্বোতভাবে সত্যনিষ্ঠ হতে হয় এ কথাও তিনি জানাতে চান। আসল কথা, মানুষকে, জাতিকে, দেশকে, বিশ্বকে তিনি পাপ থেকে, অধর্ম থেকে, দুর্নীতি থেকে তুলে ধরতে চান। এজন্য ব্যঙ্গ-সাহিত্যে মানুষের চরিত্রের সৎ-দিকটি যেমন থাকতে পারে, অসৎ দিকও তেমনি থাকতে পারে। সৎ এর পাশে অসৎকে স্থাপন উদ্দেশ্যমূলক। শিল্পীর ক্ষীণ আশা, যদি মানুষ ঐ অসৎকে দেখে, তার পরিণামকে চিনে একটু পরিবর্তিত হয়, একটু হৃদয়বান হয়, প্রকৃত মানুষরূপে পরিচয় দেওয়ার শক্তি অর্জন করে। এ জন্যে কখনও কখনও শিল্প-ধর্মের দিক থেকে তাঁর সৃষ্টি বাঁধা পেতে পারে, কিন্তু তিনি অসহায় মহৎ সংকল্পে উজ্জীবিত। তাই শিল্প ধর্মের সামান্য ত্রুটি স্বীকার করে নিয়েই তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়। ত্রৈলোক্যনাথের "পাপের পরিণাম"—উপন্যাসে জীবনের ভয়াবহ পরিণতির চিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে মিলনাত্মক সুখময় পরিণতি—আর তার সঙ্গে আছে লেখকের ব্যাকুলতম আবেদন। তিনি যেন সমগ্র বাঙালী জাতিকে, তথা ভারতবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলতে চান যে, সে যে বর্তমান দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়েছে তার একমাত্র কারণ তার সত্যহীনতা। সে যদি পুনরায় সত্যনিষ্ঠ হয় তা' হলে আবার অতীত গৌরব ফিরে পাবে, সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হবে। এই দিক থেকে "পাপের পরিণাম" উপদেশাত্মক উপন্যাস।

তবে "পাপের পরিণাম" উপদেশাত্মক বা উদ্দেশ্যমূলক যাই হোক না কেন, ব্যঙ্গও এখানে যথেষ্ট আছে। এ ব্যঙ্গ এত মৃদু,এত অনাবৃত যে অনেক সময় তাকে চিনে নিতে ভুল হতে পারে। মনে হতে পারে পাপের পরিণাম দেখানোই লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য, কিন্তু তা'ই একমাত্র কথা নয়। তিনি এ উপন্যাসে যারা ব্যঙ্গের যোগ্য, তাদের যথাযথভাবেই ব্যঙ্গ করেছেন। সুতরাং ব্যঙ্গ-সৃষ্টিও উপন্যাসের অন্যতম উদ্দেশ্য। মোট কথা, সব কিছুর মূলেই লেখকের সেই মহৎ আশা লুকায়িত, মানুষকে মানুষ করে তোলা।

ভ্রান্তি মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলে। কিন্তু একবার ভ্রান্তির আবর্তে পা দিলে কূলে ফিরে আসার তখন আর কোন উপায়ই থাকে না। কিন্তু মানুষ

তার লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষকে যখন এই নিষ্ঠুর নিয়তির দিকে টেনে আনে, তখন সে মানুষ ক্ষমার অযোগ্য, ঘৃণ্য জীবে পরিণত হয়। আশ্চর্য, এত যে ঘৃণা করি তাকে, তবু তার লজ্জাও নেই, আর দুঃখ তো নেই-ই। এই ঘৃণ্যতর, লজ্জাহীন জীবগুলোকে লেখক ব্যঙ্গের আঘাতে তাদের সকল তামসিকতা, নীচতা, নিষ্ঠুরতাকে ভেঙে দিতে চেয়েছেন। এই রকম একটি ব্যঙ্গাত্মক চরিত্র কালাবাবা, পরে যে খাঁদা ভূতে রূপান্তরিত হয়েছে।

সকল প্রকার ভণ্ডামিই ব্যঙ্গ-শিল্পীর আক্রমণের উপাদান। এজন্য তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠে এক স্পর্শকাতর মন, যে মন মানুষের নির্লজ্জ ভণ্ডামিতে, অথবা নির্বোধ বুদ্ধিহীনতায় অতিশয় সঙ্কুচিত, লজ্জিত হয়ে পড়ে। তাই তিনি ব্যঙ্গ করেন। কালাবাবার মত ভণ্ডকে তাঁর ব্যঙ্গ না করে উপায় নেই। কালাবাবার প্রকৃত পরিচয় দুইটি রূপের মধ্যে ফুটে উঠেছে, একটি তার সন্ন্যাসরূপ, অপরটি তাঁর ভৌতিক রূপ। লেখক তাঁকে খাঁদা ভূত রূপে চিত্রিত করে তাঁর যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন, শুধু ভূত হলেও তাঁকে সহ্য করতে পারতাম, কিন্তু নাসিকাহীন, বিকট শব্দকারী, ভূতকে সহ্য করা অসম্ভব। তাঁর সেই ঘোর কৃষ্ণকায় নাসিকা-বিহীন ভীষণ রূপ দেখে গ্রামের কুকুরগুলি তাড়া করলো, বালকগণ ঢিল বর্ষণ করতে লাগল, গৃহস্থগণ সভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করলো। আর সেই বহুপরিচিত সোনাবৌ ও কালাবাবার গ্রামের লোক তাকে ভূত ভূত বলে পালিয়ে গেল। "কিন্তু এই খাঁদা ভূত যে কালাবাবা, তাহা কেহ জানিতে পারিল না।" এইখানেই হয়তো কালাবাবার মত লোকের জিত। খাঁদা ভূতের মুখের সমস্ত কাহিনীই শুধু মিথ্যায় ভরানো। এই মিথ্যাকে তিনি যে-ভাবে গোপন রেখে তাঁর সমগ্র কর্মপ্রণালীর সু বর্ণনা দিতে থাকেন তাতে তাঁর প্রতি ঘৃণায়, অবজ্ঞায় মন বিষিয়ে যায়, তাঁর দুঃখ কষ্টে আমরা যেন কতকটা কৌতুক অনুভব করি, আর ভালও লাগে। তাঁর পাপকে যখন তিনি ধর্ম আর শাস্ত্রের পবিত্র বচন দিয়ে ধুয়ে নিতে চান তখন আমরা তাঁর ধূর্তমিকে ধরে ফেলি, আর তাঁর স্বভাবের অসঙ্গতির দিক, লজ্জার দিক, ঘৃণার দিক প্রকটতর হয়ে ওঠে। খাঁদা ভূত গ্রামের অনেকের রন্ধনশালা হতে চুরি করে ভাত, তরকারী, ইত্যাদি খায়, এমন কি রাঁধা মাংস গাছের ডালে তুলে নিয়ে গিয়ে খায়। এই বিভিন্ন জাতের ছোঁয়া খাবার খাওয়াতে নিশ্চয়ই কালাবাবা জাতিচ্যুত হয়েছিলেন। বড়াল মশায়ের এরূপ সন্দেহের উত্তরে তিনি শাস্ত্রের কথা উচ্চারণ করে নিজ কর্মের সমর্থন খোঁজেন

—বলেন, "ব্রহ্মে অর্পণ করিলে কোন বস্তুতে দোষ থাকে না—...গঙ্গাজলে ও শালগ্রাম শিলায় বরং দোষ হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মার্পিত বস্তুতে স্পর্শ দোষ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া আমি বীর, কুলাচারী। খাদ্যাখাদ্যের বিচার আমাদের নাই। তবে লোকাচারের বশবর্তী হইয়া কখন কখন আমাদিগকে নিরামিষভোজী হইতে হয়। অথবা দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়।" তাঁর মুখে এ ধরনের কথা দিয়ে লেখক যেন তাঁর কথা দিয়েই তাঁকে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন। যে লোক নীচ, অসাধু, মিথ্যাবাদী, তার মুখে যদি ধর্মের, সত্যের, কথা শুনি তবে তা হাস্যের ও ব্যঙ্গের উভয়েরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কালাবাবার অবস্থাও সেই প্রকার হয়েছিল। তিনি ভাবেন আমরা তাঁর চালকে বোধ হয় বুঝতেও পারি না, অবশ্য বুঝতে যে পারি সব সময় এরূপ অহঙ্কারও করা যায় না। কেননা সোনাবৌ বুঝতে পারেনি বলেই তার এই সর্বনাশ, তার পরিবারের এই ধ্বংস। কিন্তু বড়াল মশায়ের মত, রাজাবাবুর মত মানুষেরা এঁর চালকে কতকটা বুঝতে পারেন। রাজাবাবু প্রকৃত সৎ তাই কালাবাবাকে দূরে দূরে রাখতে চান, আর বড়াল মশাই কিছুটা কালাবাবার স্বভাবের, তাই কালাবাবাকে চিনতে তাঁর অসুবিধে হয় না, কালাবাবার উপরেও চাল খেলতে চান। কিন্তু অসৎ উপায়ে কেউই প্রকৃত লাভবান হতে পারে না, বড়াল মশাইও পারেন নি, কালাবাবাও পারেননি। কিন্তু দু'জনেই তাঁদের উদ্দেশ্যকে চেপে রাখতে চেয়েছেন, বড়াল মশাই তাতে সফল হলে, সাধুরূপে লোকের সামনে ঘোরাফেরা করেছেন, কালাবাবা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে ধরা পড়ে গেছেন। কালাবাবার প্রত্যেকটি উক্তিই হাস্যকর, "আমরা সন্ন্যাসী, দেবতাগণ দ্বারা রক্ষিত, সহজে আমাদের মৃত্যু হয় না।"......"দেখিলাম যে, তাঁহার পত্নী জপ-তপরতা ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোক। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে সদ্‌গুরু লাভ হয় নাই। সেজন্য আমি তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলাম। ক্রমে তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল, তখন শক্তিরূপে আমি তাঁহাকে বরণ করিলাম। কিন্তু রাজাবাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন না।..... আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাবাবু আমাকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।..... ক্রমে আমার চক্ষুও প্রস্ফুটিত হইল। প্রস্ফুটিত জ্ঞান চক্ষু দ্বারা আমি দর্শন করিলাম যে, রাজাবাবু দেবীর ভক্ষ্য, তাঁহাকে বলি দেওয়া কর্তব্য। কেননা......শাস্ত্রে আছে, "নরবলি প্রদান মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও অষ্টসিদ্ধির অধিকারী হয়।" এইভাবে কালাবাবা

যখন সোনাবৌকে এর সর্বনাশ করে, শূলিনী দেবীর ভক্ষ্যরূপে রাজাবাবুকে অজ্ঞান করে তাঁকে সোনাবৌকে দিয়ে শূলবিদ্ধ করার মানস করেন ও মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত করেন, এমনি সময়ে সোনাবৌ এর কাপড়ে আগুন ধরে যাওয়াতে এক প্রবল বিপত্তি দেখা দিল। কালাবাবা রাজাবাবুর চাকর বীরুর হাতে ধরা পড়লেন। কিন্তু কালাবাবা জাতের লোকগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে এঁরা ভাঙ্গেন কিন্তু মচকান না—তাই অক্লেশে বলতে পারেন, "তোমরা পশু, নিষ্ঠুর ধর্মাধর্ম-জ্ঞানশূন্য। তোমরা বুঝিলে না যে, আমি সাক্ষাৎ শিব।" কালাবাবার শিবত্ব প্রবল হাস্যকরতায় ভরে ওঠে তাঁর শূলিনী দেবীর মন্ত্র পাঠে, "যথাবিধি মন্ত্রপাঠ করিয়া শূলিনী দেবীর অর্চনা আরম্ভ করিলাম। —জ্বল জ্বল শূলিনী দুষ্টগ্রহ হু ফট্ স্বাহা। শূলিনী দুর্গে হুঁ ফট্ স্বাহা। শূলিনী বরদে হুঁ ফট্ স্বাহা। শূলিনী বিন্ধ্যবাসিনি হুঁ ফট্ স্বাহা। শূলিনী অসুরমর্দ্দিনি যুদ্ধপ্রিয়ে ত্রাসয় ত্রাসয় হুঁ ফট্ স্বাহা।" • ···এত দেবীপূজা করেও দেবীর রোষবহ্নি তাঁর পরে নেমে আসে, নাসিকা হারিয়ে তাই তাঁকে পথে পথে, দ্বারে দ্বারে, গাছে-গাছে, ভূতের মত বা তার থেকেও অধম হয়ে অসহ্য লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। তবুও তাঁর লোভের শেষ হয় না। সোনার ইট সংগ্রহের তাড়নায় তিনি আবার ফিরে আসেন। কিন্তু এ যে তাঁর লোভের তাড়না তা তিনি বলতে চান না, ঘুরিয়ে রাজাবাবুর নামে বলেন— "তোমার ভয় নাই। মন্ত্রপূত করিয়া তুমি আমাকে উৎসর্গ করিয়াছিলে। দেবী আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। আমি স্বর্গে গমন করিয়াছি। কিন্তু এখনও তোমার দক্ষিণা প্রদান করা হয় নাই। তুমি অবগত আছ যে, অনেকগুলি সোনার ইট আমি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। দক্ষিণাস্বরূপ সেই ইটগুলি আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। যাও, আমার বাটীতে গমন কর। স্বর্ণনির্মিত সেই ইটগুলি গিয়া গ্রহণ কর।" প্রবলতম লোভ, দুর্নীতি, অসাধুতা, নিষ্ঠুরতা দিয়ে এই কালাবাবার চরিত্র গঠিত। কোনপ্রকার গুণের এক কণাও এঁর চরিত্রে নেই। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলির দীর্ঘতর ক্ষেত্রে অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী, সাধুর সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ঘটে, কিন্তু সকলের ঊর্ধ্বে কালাবাবার স্থান। তিনি নরবলি, নারীহরণ, ব্যাভিচারের চূড়ান্ত করেছেন। তিনি ঘৃণ্যতর জীব, সর্বদা পরিত্যজ্য, তাই উপন্যাসের মধ্যে তাঁর লোলুপতাকে সর্বদিক থেকে প্রকাশ করে লেখক তাকে তীব্র ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন।

মানুষ যখন ভুল করে তখন তাকে চিনতে পারে না। যখন চিনতে পারে তখন আর সময় থাকে না। লেখক মানব চরিত্রের এক করুণতম অসঙ্গতির চিত্র, সেই ভুলের চিত্রকে সোনাবৌ এর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে অঙ্কন করেছেন। সোনাবৌ বসন-ভূষণে, আদরে-সোহাগে, দাস-দাসীতে রাজরাণী হয়ে ছিলেন। কিন্তু মানব স্বভাবের কি পরিহাস, যে সে সুখকে চিনতে পারে না। সে চির-অতৃপ্ত। সোনাবৌ এর এই অতৃপ্তি তাকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ করল। এই সময় তার সামনে কালসর্পরূপী কালাবাবার আবির্ভাব। স্বামীকে ত্যাগ করে এই কালাবাবাকে সর্বস্ব মনে করে তাঁর পায়ে সোনাবৌ যেভাবে আত্মসমর্পণ করে তা এক বিরাট অসঙ্গতি নিয়ে আমাদের সামনে জেগে থাকে। সোনাবৌ জীবনের মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে এই অসঙ্গতি, এই ভুলকে বুঝতে পেরেছিল। তখন সে অনুতপ্ত। তাই তখন সে আমাদের সহানুভূতিতে জড়িয়ে যায়, ব্যঙ্গ করতে পারি না, লেখকও তা' করেননি। কিন্তু যখন সোনাবৌ গুরুদেবরূপে কালাবাবাকে বরণ করে সেই সময়ে তার চরিত্রে যে অসঙ্গতি দেখা দেয় তাকে যেন লেখক একটু ব্যঙ্গই করতে চেয়েছেন। সোনাবৌ এর কথাতেই সে সময়ের সমস্ত ঘটনাটি জানা যায়।

"তপস্বী জ্ঞানে তাঁহাকে আমি পূজা করিতে লাগিলাম। এ বস্তু খাইবে, সে বস্তু খাইবে না,—ইহাই ধর্ম। প্রথম প্রথম তিনি দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। আমিও তাঁহার পূজা করিতে লাগিলাম। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি আমাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তুমি, রাজাবাবু, নানা বস্তু আহার করিতে, তিনি দুগ্ধ খাইয়া থাকিতেন। তাহাতে আমি বুঝিলাম যে, তুমি ঘোর অধার্মিক, তিনি দেবতা। তোমার প্রতি ঘৃণা ও তাঁহার প্রতি ভক্তি দিন দিন আমার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি আমার গুরুদেব হইলেন।"

এবার এই গুরুদেব যখন স্বর্গে গমনের সহজতর পথটি দেখিয়ে দিলেন, তখনও সোনাবৌ সে পথকে সহজভাবেই গ্রহণ করে। লেখক মানুষের এই মোহময় ভুলগুলিকে ব্যঙ্গ করতে চান। গুরুদেবের কথা তো পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছেই। সোনাবৌকে প্ররোচিত করবার বিশেষ ধরনের শাস্ত্রীয় বচনকে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে পারি।

"দাতাকর্ণ বা কি করিয়াছিলেন! তাহা অপেক্ষা স্বামী বলি শতগুণ

ফলপ্রদ। স্বয়ং ইন্দ্র স্বর্গ হইতে পুষ্পক রথ প্রেরণ করিবেন। তাহাতে আরোহণ করিয়া আমরা তিনজনে স্বর্গে গমন করিব।”

মানুষ কতদূর আত্মবিস্মৃত হ'য়ে এ ধরনের সর্বনাশকেও স্বর্গ মনে করতে পারে তা অনুমান করে নিতে হয়। সোনাবৌ সেই আত্মবিস্মৃতিতে হারিয়ে গিয়েছিল। তাই স্বর্গের নামে নরকের দিকে ছুটে চলেছিল। লেখক মানব-স্বভাবের এই ধরনের অকারণ ছুটে চলাকে, ভ্রান্ত নেশায় মত্ত হওয়াকে ব্যঙ্গ করতে চান, তাই সোনাবৌ এর মুখে তিনি বলিয়েছেন,—“সে সময় যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিত যে, তুমি সুরা চাও, কি প্রাণ চাও? অকাতরে আমি বলিতে পারিতাম যে, আমি সুরা চাই, প্রাণ চাই না।”—সোনাবৌ চরিত্রের সামগ্রিক রূপান্তর আমাদের কাছে এক বিস্ময়। উন্মত্ততাজনিত এই রূপান্তর ব্যঙ্গের যোগ্য। লেখক তাই সোনাবৌ এর মত উন্মত্ত চরিত্রকে ব্যঙ্গ করেছেন, যদিও যেখানে সে অনুতাপরত সেখানে তিনি তার প্রতি সহানুভূতিশীল।

মানব স্বভাবের নীচতা, নিষ্ঠুরতা, লোভ, দেখে দেখে লেখক বিচলিত হয়ে পড়েন। তাদের স্বভাবের এই হৃদয়হীনতাকে তিনি দূর করতে চান। কিন্তু পারেন না। দেখতে পান কত শত রায়চরণ রায়কে, যারা একজনের সত্যবাদীতাকে বিনা দ্বিধায় পদদলিত করেন, প্রবঞ্চনা করেন। সত্যের কথা, ঈশ্বরের চিন্তা তাদের সামনে কখনও আসে না। মিথ্যার সহস্রধারায় তারা জড়িয়ে, তিলে তিলে মৃত্যুমুখীন হয়, তবু নিজের স্বভাবের এক তিলার্ধ পরিবর্তন করে না, বা করতে চায় না। রায় মশাই-এর কনিষ্ঠভ্রাতা বিজয় যখন বেণীবাবুর সম্পত্তি লাভের কথা ব্যক্ত করেন, তখন রায় মশাই-এর মত পাপী মন কিছুতেই বুঝতে পারেন না যে এ ঘটনা কি করে সম্ভব হল। এই সংবাদ সম্পূর্ণ আশ্চর্যজনক বলে মনে হল। কোথাকার কে একজন নিষ্পর যার সঙ্গে এই অল্পদিন হল আলাপ হয়েছে সে যে কিভাবে এত টাকার বিরাট সম্পত্তি দান করবে তার কারণ তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না। লেখক যেন ব্যঙ্গ করে বলতে চান যে পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনাই, অনেক দুঃখবরণ, অনেক ত্যাগই রায় মহাশয়ের মত লোকের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হবে। এরা যে শুধু নিতেই জানে, দিতে জানে না, দান বলে কোন শব্দ তাদের অভিধানে নেই। এই ধরনের মানুষগুলোর মুখের আর মনের কথায় এক পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান রয়েছে। তাই বিজয়ের প্রস্তাবে রায় মহাশয় মুখে

আহ্লাদ প্রকাশ করলেন, কিন্তু মনে মনে তাঁর প্রবল হিংসা হল। রায় মহাশয়ের গৃহিণী তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী। তাই তাঁর মুখে শুনি, "পুরুষ মানুষের সাহস থাকে। কিন্তু তোমার মত ভীরু পুরুষ কখন আমি দেখি নাই। লোকে কত কি উপায় অবলম্বন করিয়া সম্পত্তি লাভ করে। দেশে বড় মানুষ আছে; কি করিয়া তাহাদের বিষয় হইয়াছে, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।" যে যেমন জগতকেও সে সেই দৃষ্টিতে দেখে। রায়-রায়ণীর দলই আজ অধিক। রায় মহাশয় যেভাবে বেণীবাবুর সম্পত্তিকে নিজের নামে লিখে নিলেন, তাতে তার সুচতুর বুদ্ধির পরিচয় পাই, কিন্তু যে বুদ্ধি আমাদের মনুষ্যত্বহীন করে তোলে, তা' কোন মতেই কামনার হতে পারে না। তার চাইতে মহামূর্খ হয়ে যাওয়া অনেক ভাল। রায় মহাশয় ভাইকে প্রবঞ্চিত করে সম্পত্তি লাভ করেছিলেন, আর মনে মনে নিজের জয়ের রূপকে প্রত্যক্ষ করে আনন্দও পেয়েছিলেন। কিন্তু লেখক তার সেই জয়ের পাশেই পরাজয়ের গ্লানিকেও লক্ষ্য করলেন, ভূত ভয়ে ভীত, ঘোর অশুভ আশঙ্কায় শঙ্কিত, পক্ষাঘাতগ্রস্থ, শোকসন্তপ্ত, একাকী মৃত্যুশয্যায় ভয়ঙ্কর প্রহেলিকায় আতঙ্কিত যে রায় মশায়কে তিনি দেখালেন, তার চারপাশে কোথাও সুখ, আনন্দের, জয়ের কোন চেহারাই ছিল না। প্রতিটি কর্মই প্রতিফল প্রদান করে। এই ফল শুভ, অশুভ দুই-ই হতে পারে। রায় মশায়ের সমগ্র জীবন দুরাচার, দুর্নীতি, লোভ, হিংসায় প্রজ্জ্বলিত। তাই তাঁর এই ভয়াবহ পরিণতি। এই পরিণতির কথা জেনেও আমরা লোভ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি না। রায়ণী যদি তা' পারতেন তা'হলে শেষে মৃত্যুটুকুকে হয়তো তিনি শান্তিতে গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু পারেননি। চারিদিকের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যেন ভূতিনী হয়ে তিনি সম্পত্তিকে পাহারা দিয়েছেন, তবু বিজয়কে দিতে পারেননি—মানুষের লোভ হিংসার এই ভয়ঙ্কর সমাপ্তি লেখক চান না, তাই তো তাঁর কাতরতর মিনতি একটু সৎ, সত্য, ধর্মের উপরে যেন আমরা মনকে স্থাপন করি। রায়-রায়ণীর চরিত্রের পরাজয়ের, গ্লানির কালিমাকে স্পষ্টতর করে তাদের চরিত্রের প্রতি ব্যঙ্গই বর্ষিত হয়েছে। এ ব্যঙ্গ সংযত, গম্ভীর, হলেও তীক্ষ্ণ, শাণিত। কেননা লেখক যে মানবদরদী, মানবের এই অপমৃত্যু তাঁর কামনার নয়।

গ্রাম্য জীবনের নানারূপ কুসংস্কার, ভয় ইত্যাদিকে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর কাহিনীর এক দীর্ঘ পরিসরে স্থাপন করে, এর অকিঞ্চিতকরতা ও হাস্যকরতা

আবিষ্কার করে এগুলিকে ব্যঙ্গ করেছেন। শিক্ষার অভাবে গ্রাম্য জীবনে যুক্তিহীনতা, বিচারহীনতার প্রাবল্য দেখা যায়। অহেতুক ভয় ও দুর্বলতার চিত্রগুলি সত্যই হাস্যকর। এই হাস্যকর চিত্রের মধ্যে প্রথমেই খাঁদা ভূতের কথা ও পরে জোড়া শাঁকচুন্নীর কথা মনে পড়ে। খাঁদা ভূতের আবির্ভাবে গ্রামের লোকে একেবারে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লো। কিন্তু তাদের কিছুতেই এ কথা মনে হ'ল না যে, ভূত কখনও মাংসের বাটি, ভাতের হাড়ি, তরকারির পাত্রের সবকিছু নিঃশেষে খেয়ে ফেলতে পারে না। একটা আস্ত মানুষকে খাওয়াও ভূতের পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর জোড়া শাঁকচুন্নীর চেহারাটা একবার দেখে নেওয়া দরকার—"তাহারা দেখিল যে, সাদা কাপড় পরিধেয় দুইটি স্ত্রীলোক বাগানের ভিতর দাঁড়াইয়া আছে।...স্ত্রীলোক দুইটির পায়ের গোড়ালি সম্মুখ দিকে। গ্রামের লোকের বুঝিতে আর বাকী রহিল না। সেই দুইটি স্ত্রীলোক মানুষ নহে, তাহারা শঙ্খচুর্ণী, যাহাকে শাঁকচুন্নী বলে। পরদিন মালী দুইজন রায় মশায়কে বলিল যে, স্ত্রীলোক দুইটির গায়ে বড় বড় কৃমি ঝুলিতেছিল। তাহাদের দাঁতও প্রায় এক হাত লম্বা। উপর দিকে পা রাখিয়া, হাতে ভর দিয়া, দেড় হাত জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া, বাগানের ভিতর তাহারা বন্ বন্ শব্দে ঘুরিতেছিল।" আমরা সকলেই জানি এই শাঁকচুন্নীদ্বয়, চঞ্চলা ও চপলা, এই দুই ভগ্নী ছাড়া আর কেহ নয়। কিন্তু লোকের মুখে মুখে এরাই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এই খাঁদা ভূত ও শাঁকচুন্নীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে গ্রামবাসীগণের রক্ষাকালীর পূজা করা ও আকুল হয়ে প্রার্থনা করার দৃশ্য হাস্যবহুল। "হে মা রক্ষাকালি। তোমার কাছে আমরা আর কিছু চাই না, খাঁদা ভূত ও শাঁকচুন্নী জোড়ার দৌরাত্ম্য হইতে তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। হে মা। ভূতের উপদ্রবে আমরা জরজর হইয়াছি। তুমি খাঁদা ভূতের দমন কর, শাঁকচুন্নী জোড়াকে তুমি দূর কর। যদি না কর, মা, তাহা হইলে আর কেহ তোমার পূজা করিবে না।" মাকে জোর করে, পূজো না দেওয়ার ভয় দেখিয়ে, যেভাবে গ্রামবাসীরা ধন, মান, যশ না চেয়ে শুধু ভূত মুক্ত করবার জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছে তা' একাধারে হাসির ও ব্যঙ্গের।

এবার সেই গ্রামের লোকেরা যে আশ্চর্যজনক "তুকে"র সংকটে পতিত হয়েছিল, লেখক তাকে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন। গ্রামবাসীদের আশ্চর্য মনোবিকার। সামান্য জিনিষের কত গভীর মূল্য দেয় তা ভাবলে আশ্চর্য

হই। গ্রাম্য জীবনের সহজ বিশ্বাস ও ভয় বিহ্বলতাকে লক্ষ্য করে একদল লোক রোজগারের কিছু উপায় করে নিত। লেখক ব্যঙ্গচ্ছলে তাই বলেছেন, "এই দুর্ভাগা গ্রামের কি কপাল। বিধাতা কি ইহাদিগকে সুস্থির হইয়া কাল যাপন করিতে দিবেন না?" একদিন গ্রামের ছেলে হেরম্ব তেমাথার পথে এক ছিন্ন বস্ত্রের পুটুলি মাড়িয়ে ফেলল। সুতরাং মহাবিপদ। মৃত্যুর হাত থেকে বালককে রক্ষা করা যাবে না। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সকলে সরবে কাঁদতে লাগল। সব চাইতে মজার কথা, "গ্রামের বিজ্ঞ লোকেরা আসিয়া পুটুলি তিনটি দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। ভয়ে তাহারা হতভম্ব অবাক হইয়া রহিল। বলিবে আর ছাই ভস্ম কি। এ ঘোর সর্বনাশের কথা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারা যায় না। সেজন্য অতি গম্ভীর-ভাবে দুই চারি বার ঘাড় নাড়িয়া তাহারা স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কিন্তু গ্রামের লোক নির্বোধ নহে। বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না। উহাকে তুক্ বা গুণ বলে। অতি সাঙ্ঘাতিক তুক্। এ তুক্ মাড়াইলে বা ডিঙাইলে আর রক্ষা নাই।" এই মারাত্মক তুক্‌গ্রস্থ বালকটিকে কেহই আর সুস্থ করতে পারে না। ভাগ্যে গ্রামে গৌরবিণী তিওরণী ছিল। সে এসে সকলকে অভয় দিয়ে বলল, "ভয় নাই, ভয় নাই, আমি ছেলেকে বাঁচাইব।" তার ঝাড় ফুক শেষ হলে ঔষধ সম্বলিত একটি নেকড়ার পুটুলি বালকটির গলায় পরিয়ে দিল। ...শুধু সেই বালকটির গলদেশে ঐ পুটুলি শোভায়মান হল তাই নয়, "গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গলায় বড় বড় নেকড়ার পুটুলি পরিধান করিল। কিছুদিন গ্রামের লোকের গলদেশ অপূর্ব শোভা ধারণ করিল।" এখানে যে স্পষ্টতই লেখক সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীর ভূত-প্রেত-দৈত্য শাঁকচুন্নী গুণ-তুক্ ইত্যাদি সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণাকে কৌতুক করেছেন ও ব্যঙ্গ করেছেন তা' বুঝতে পারি। এই অবকাশে গৌরবিণীর মত আরও দু'পাঁচজন রোজার আবির্ভাব ঘটতো এবং তারা দেবীকে সন্তুষ্ট করবার অজুহাতে বেশ কিছু আয় করে নিত। প্রায় প্রতি গ্রামেই এই ধরনের ভয় ও ভয়-ভাঙানোর রোজার আবির্ভাব ঘটেছিল। এক শ্রেণীর মানুষ দিনের পর দিন যে কিভাবে অহেতুক ভয়কে আঁকড়ে ধরে থাকতো, আর, আর এক শ্রেণীর মানুষ ছিল, যারা আসল দুর্বলতাকে বুঝতে পেরে কিছু উপার্জন করে নেবার চেষ্টায় থাকতো। এই দুই শ্রেণীকেই লেখক ব্যঙ্গ করেছেন।

এই কাহিনীতে ধনুকধারী চরিত্রটি অদ্ভুত প্রতিহিংসাপরায়ণ চরিত্র।

সুবালার সঙ্গে তার আবাল্য সখ্য হলেও সুবালা কোনদিনই তাকে প্রেমাস্পদ-রূপে বরণ করেনি। ভাই-বোনের মত একটা নিকট সম্পর্ক হয়তো তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ধনুকধারীর মত চরিত্র সেই স্নেহের সম্পর্ককে অন্যরূপে গ্রহণ করে, লালসার আলোতে তাকে দেখতে চায়। মাঝখান থেকে প্রতিবন্ধক রূপে যেন দেখা দেয় বিনয়, যাকে সে "ঝেকড়াচুলো" বলে অভিহিত করেছে। যথার্থ প্রেম দুঃখবরণের দীক্ষা দেয়, পরম প্রিয়জনকে একমাত্র দুর্বল মুহূর্তে, মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে, জয় করতে চায় না। ধনুকধারী তাই করেছিল। চারিদিকে জল আর জল। সেই নির্জন দিগন্ত বিস্তৃত জলাশয়ে এক ক্ষুদ্র নৌকায় সুবালা আর ধনুকধারী। সুবালা তীরে ফিরে যেতে চায়, বাঁচতে চায়, আর ধনুকধারী তাকে অপমানিত করে, ভয় দেখিয়ে দূরে নিয়ে গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। সুবালা সত্যনিষ্ঠ। হাজার বিপদও সে সহাস্যে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু কোন দুর্বলতার প্রশ্রয় দিতে পারে না। ধনুকধারী সুবালাকে চেনে না। ধনুকধারী চাতুর্য দ্বারা মৃত্যুর অতলে গিয়ে সুবালাকে লাভ করে ধন্য হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে। তার ঘৃণ্য, নিষ্ঠুর, পৈশাচিক মন এক জঘন্যতর মিলনসুখের কল্পনা করে, বলে, "এক সঙ্গে দুই জনে জলমগ্ন হইব। দুই হাতে তুমি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিবে, সেই অবস্থায় প্রাণ বাহির হইবে। ইহার অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে। স্ব-ইচ্ছায় তুমি আমার সহিত সহমরণে যাইবে। তুমি আমার পতিব্রতা সতী হইবে। অরুন্ধতীকে লইয়া বশিষ্ঠ যেরূপ স্বর্গে বাস করিতেছেন, তোমাকে লইয়া সেইরূপ আমিও যুগযুগান্তর—কত মন্বন্তর স্বর্গধামে বাস করিব। হাঃ, হাঃ, সুবালা আমার সহিত সতী হইবে। এ কথা মনে করিলে হাসি পায়, দুঃখ হয় না।" ধনুকধারীর এই উপহাসের কথায় সুবালা বিচলিত হয় না। নীরবে ধ্যান করে। ঈশ্বর সে ডাক বুঝি শুনতে পান। তাই সত্যনিষ্ঠ সুবালার কোন সর্বনাশ আসে না, ধনুকধারীই জলে ডুবে গেল। তবে সঙ্গে কোন সুবালার শীতল বাহু তাকে আলিঙ্গন করে থাকলো না। কালাবাবার বজ্রবন্ধনে মারামারি, হানহানি করতে করতে ধনুকধারীর মৃত্যুবরণে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। লেখক কিন্তু এই চরিত্রের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতেও বিচলিত হন না। বরং তার এই শোচনীয় মৃত্যুও আমরা ভুলে যাই, শুধু মনে থাকে তার চরিত্রের অসংযমের কথা, নীচতার কথা, নিষ্ঠুরতার কথা। সুবালাকে দৈবাৎ সুযোগমত কাছে পেয়ে যেভাবে জুলুম করে, তাতে তাকে

কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি না। সুবালা তার চরিত্রের দৃঢ়তা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে, সত্যনিষ্ঠা দিয়ে যেভাবে তাকে অবজ্ঞা, অবহেলা করেছে তাতে প্রকটতর ব্যঙ্গই যেন ঝরে পড়েছে।

এই কাহিনীতে কালাবাবা ছাড়া আর একটি বীরপুরুষ সভ্য ভব্য নব্য বীরপুরুষ সন্ন্যাসীর আমদানী করা হয়েছে, যাকে দেখে প্রকাশ্যেই মনে হয় যে ব্যঙ্গ করার জন্যেই যেন একে গ্রামের মধ্যে ধরে আনা হয়েছে। এই গুরু-ঠাকুরটি সেকালের শাস্ত্রে নূতন বিজ্ঞান জোড়া দিয়ে গুরুগিরি করেন। এঁর বচন সব নূতনত্বে ভরা, গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত কুসংস্কারগ্রস্থ মানুষগুলোর কাছে তাই গুরুদেবের আধিপত্য এবার বেড়ে গেছে। তাঁর আরক্ত নয়ন, নৃসিংহ মন্ত্র, কুপোর মধ্যে থাঁদা ভূতকে ধরে দেওয়ার প্রস্তাব—সব মিলিয়ে তিনি গ্রামবাসীর কাছে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর কথাগুলোতে যতই বীরত্ব থাকুক, সে বীরত্বের কোন প্রকাশ ঘটতে দেখি না। তিনি বলেন, "নৃসিংহ মন্ত্রবলে থাঁদা ভূতকে ধরিয়া কুপেতে বন্ধ করিয়া আনিব। তখন তোমরা আমার বিক্রম দেখিবে—আমি সাক্ষাৎ জাগ্রত গুরু। গুরুকে মানুষ জ্ঞান করিতে নাই কেন, তখন তোমরা বুঝিবে।" তাঁর এই আস্ফালন চরম হাস্যরসসিক্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। সেই জলার মধ্যে থাঁদা ভূতের এক একটা হুঙ্কার তাঁর স্বরূপকে যেন পরতে পরতে অনাবৃত করেছে। প্রথম থেকেই তিনি থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করে দিলেন। তাঁকে থাঁদা ভূত খেয়ে ফেলবে এই আশঙ্কায় তিনি বিড় বিড় করে বলতে থাকেন—"ক চ ট ত প। জ ড় দ গ ব। হ ব ঠ" এ কি ধরনের মন্ত্র আমাদের তা অজানায়। এরপরও যখন নৌকা ফেরানো হ'ল না তখন তিনি তাঁর গৃহিণী ভোমরার নাম ধরে কাঁদতে লাগলেন। গৃহিণীকে নীলাম্বরী শাড়ী না দিতে পারার দুঃখে ও পুত্র নিতুকে বিলাতী বিস্কুট কিনে না দিতে পারার আফশোষে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন। থাঁদা ভূত যে ব্রহ্ম রাক্ষস এ কথাও তিনি বললেন। এত বিপদেও তিনি নিজের অহঙ্কারটুকু একেবারে ছাড়তে চান না, তিনি বলেন যে শাস্ত্রে পড়া সমুদয় লক্ষণের সঙ্গে ব্রহ্ম রাক্ষস-রূপী থাঁদা ভূতের লক্ষণ মিলে যাচ্ছে। সুতরাং এ যাত্রা মৃত্যুই তাঁর একমাত্র অবলম্বন। সর্বশেষে এই বীর গুরুটি যেভাবে উচ্চৈস্বরে কাঁদতে থাকেন তাতে আমরা তাঁর সবটুকু ছলনাকে বুঝতে পারি। অতিশয় ভীরু, শক্তিহীনরূপে

তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। আমরা যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করি। এই গুরুদেব চরিত্রটি একাধারে ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যাত্মক।

'পাপের পরিণাম' উপন্যাসে বিচ্ছিন্নভাবে যেসব ব্যঙ্গ আছে তার আলোচনা করা হল। এই সব ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে লেখকের শিল্পীসত্তার একটি দিকেরই উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে। তিনি মানুষের ব্যবহারে একদিকে যেমন আঘাত পেয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে আনন্দও পেয়েছেন। রায় মহাশয় ও রায়গৃহিণী, কালাবাবা, সোনাবৌ, ধনুকধারী, পুণ্ডরীক এবং গ্রাম বাংলার অশিক্ষা, কুসংস্কার ও এরই মাঝে গৌরবিণী, বীরপুরুষ সাধু ইত্যাদির স্বভাব ও ব্যবহারে তিনি হতাশ হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, আবার বিজয়বাবু, বেণীবাবু, বিনয়, সুবালা, সুবালার মা—এঁদের মত সুন্দর স্বভাবের মানুষগুলি তাঁর অন্তরে আশা জাগিয়েছে। এই আশা-হতাশার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি শিল্প রচনা করেছেন। তাই এই উপন্যাসের ব্যঙ্গ-চিত্রগুলি হাস্যরস সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। বরং কতকটা করুণ, বিবর্ণ। তবু তিনি ব্যঙ্গ করেছেন, পাপ, মিথ্যা, দুরাচারকে দূর করার জন্যে। বাঙালীর জন্যে যে তাঁর অন্তরের শুভাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এ জাতির অপমৃত্যু তাঁকে তীব্রতর যন্ত্রণা দেয়, বিপথগামী পুত্রকে দেখে মাতৃহৃদয়ের করুণ কাতরতার মত। তাই তো তিনি সেই জাতিকে ব্যঙ্গ করলেন, "বাঙালী জাতি ভীরু, বাঙালী সত্য কথা বলে না, প্রতিজ্ঞা পালন করে না, কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া সে কার্য্য সম্পন্ন করে না। .....অন্য জাতির জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও বাঙালীর জ্ঞান হয় না!"

বাঙালীর সকল প্রকার কলঙ্ককে তিনি মুছিয়ে দিতে চান। শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে, কর্মে, ধর্মে, বাঙালীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। পাপের পরিণামের কাহিনী বর্ণনা ও চরিত্র চিত্রণের মধ্যে দিয়ে কখনও বা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে, কখনও বা মিনতি করে, লেখকের এই শুভ-অভিলাসই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ডমরু-চরিত

ব্যঙ্গ-সৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথের "ডমরু-চরিত" এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। হাস্য ও ব্যঙ্গের পুঞ্জীভূত নির্ঝর এই ডমরু-চরিত। জীবনের নিগূঢ় সত্যকে একটি হালকা comic mood-এ ব্যক্ত করা হয়েছে। তাই সেই হালকা হাস্যরসের উচ্ছলতার মাঝে কঠিন বাস্তব সত্যের রূপটি কখনও ভারী হয়ে ওঠেনি। বরং সে রূপ অতি গতিময়, প্রাণচঞ্চল।

ডমরু-চরিত যেন আমাদেরই চিত্ত-মানসের এক স্বচ্ছ দর্পণ। তাই এতে আমাদেরই দোষ, ত্রুটি, দুর্বলতার প্রতিটি চিহ্নকে অতি স্পষ্টরূপে দেখতে পাই। লেখক তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনকে দেখেছেন, জীবনকে চিনেছেন। দেখেছেন মানুষের প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি, লোভ, লালসা, নিষ্ঠুরতা, কদর্যতাকে। জীবনের এই কুশ্রীতাকে দেখে দেখে তিনি অশেষ নির্যাতন লাভ করেছেন। মানব-স্বভাবের দীনতায়, দুর্বলতায় তিনি এক সুতীব্র বেদনা অনুভব করেছেন। তৎকালীন সমাজ ও জীবনের প্রতি এক কঠিন বিরূপতা তাঁর অন্তরে জেগেছে। কিন্তু যেহেতু তিনি শিল্পী তাই জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা হারাতে পারেন না। তাই তাঁর স্বাভাবিক শিল্পসুলভ ভঙ্গীতে তিনি জীবনকে গ্রহণ করেছেন। আর ডমরু-চরিতের মাধ্যমে আমাদের স্বভাবের সেই হাস্যকর অসঙ্গতিময় দুর্বলতা-গুলিকে সব ব্যক্ত করে দিয়েছেন। তাই ডমরুধরের মধ্যে কোন ব্যক্তিবিশেষকে তিনি ব্যঙ্গ করেননি, করেছেন তৎকালীন ও চিরকালীন বাঙালী সমাজ ও মানব স্বভাবকে।

ডমরুধর একটি comic চরিত্র। তাকে দেখে আমরা হাসি, কৌতুক অনুভব করি। বুঝি না তার স্বভাবের অসঙ্গতি, শুধু তার একারই নয়, হাজার হাজার ডমরুধর আমাদের সামনে অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাদের কৃত প্রতিটি কর্মই যেন উপহাসের। তাই তাদের একটি কর্মই যেন আর একটি কর্মকে ব্যঙ্গ করে। তবে এ ধরনের ব্যক্তি থেকে ডমরুধর যেন আলাদা। ডমরুধর জীবনকে তার সর্বদিক থেকে চিনেছেন। তার ভালকে দেখেছেন, মন্দকেও দেখেছেন। ভাল ও মন্দের পরিণতিকেও বুঝেছেন। তাই এখন তিনি আর কোন সূক্ষ্ম অনুভূতির ধার দিয়ে যান না। অতি স্থূল জিনিষ

নিয়েই তাঁর কারবার। জীবনের অসহ্য দারিদ্র্যকে তিনি দেখেছেন, সেই দারিদ্র্যের দহনে তিল তিল করে দগ্ধ হয়ে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

"টাকায় কি না হয় ?"

অথবা, "যাহা হউক, এই স্থানে যাহা আমি শিক্ষা পাইয়াছিলাম, পরে তাহাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, টাকা উপার্জন করিলেই টাকা থাকে না; টাকা খরচ না করিলেই টাকা থাকে।"

অথবা, "টাকা হইলে কেহ তখন জিজ্ঞাসা করে না যে, অমুক কি করিয়া সম্পত্তিশালী হইয়াছে। জাল করিয়া হউক, চুরি করিয়া হউক, যেমন করিয়া লোক বড়মানুষ হউক না কেন, অমুকের টাকা আছে, এই কথা শুনিলেই ইতর, ভদ্র সকলেই গিয়া তাহার পদলেহন করে, সকলেই তাহার পায়ে তেল মর্দন করে, রও, একবার আমার টাকা হউক, তখন দেখিব যে, তুমি বাছাধন আমার বাড়ীতে ক্যান চাটিতে যাও কি না।"

—ডমরুধরের এই অভিজ্ঞতা সঞ্চিত উক্তিগুলি বিশেষ ভাবেই ব্যঙ্গাত্মক। এ ব্যঙ্গ সাধারণ জনগণকেই করা হয়েছে। ধনী ও দরিদ্র দু'জনের স্বভাবের পরিচয় এতে আছে। যাঁরা ধনী হয়েছেন তাঁদের দ্বারা কত সময়ে কত অন্যায় যে বিনা দ্বিধায় সাধিত হচ্ছে তার আর অন্ত নেই। অনেক সময় তাদের অমানবিক ব্যবহার, ও অর্থ সঞ্চয়ের অদম্য বাসনা হাস্যকর হয়ে পড়ে। তবু তারা তা' করে। অতদূর ঘৃণ্য, অর্থলোলুপ তারা না হলেও পারে। লেখক এদের দেখেছেন। অতি নির্লিপ্তভাবে ডমরুধরকে তিনি সেগুলি বলে যান। ডমরুধর যখন কলকাতায় হর ঘোষের কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন, তখন সেই মনিবের গৃহেই তাঁকে আহার করতে হত এবং পাঁচ টাকা করে হাত খরচা পেতেন। এই মনিবগৃহে আহারের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা' একাধারে হাস্যাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক।

"মসুর দালে কেবল একটু হলুদের রং দেখিতে পাইতাম, দালের সম্পর্ক তাহাতে থাকিত কি না সন্দেহ। তাহার পর বলিহারি যাই গৃহিণীর হাত। কি করিয়া যে তিনি সেরূপ ঝিঁঝির পাতের ন্যায় বেগুন কুটিতেন; তাহাই আশ্চর্য্য! অভ্রের চেয়ে বোধ হয় পাতলা। বাজারে যে চিংড়িমাছ বিক্রয় হইত না, যাহার বর্ণ লাল হইয়া যাইত, বেলা একটার সময় কালে ভদ্রে সেই চিংড়ি মাছ আসিত। তাহার গন্ধে পাড়ার লোককে নাকে কাপড় দিতে হইত। সেই চিংড়ি মাছের খড়গুলি বাবু ও তাহার গৃহিণী খাইতেন;

মাথাগুলি আমাদের জন্য ঝাল দিয়া রান্না হইত। যেদিন চিংড়ি মাছ হইত সেদিন আর আহ্লাদের সীমা থাকিত না। সেই পচা চিংড়ি অমৃত জ্ঞান করিয়া আমরা খাইতাম। দুইবার ভাত চাহিয়া লইতাম। অধিক ভাত খরচ হইত বলিয়া চিংড়ি কিছুদিন পরে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর একগাঁট তেঁতুল ট্যাকে করিয়া আমি ভাত খাইতে বসিতাম। তাহা দিয়া কোন রূপে ভাত উদরস্থ করিতাম।"

এই সব ব্যবহারই ডমরুধরকে পরবর্তী জীবনে অসাধারণ কৃপণ করেছে। ডমরুধর "সাধ্য মত একটি পয়সাও" খরচ না করেই এবং সৎ-অসৎ নানা উপায়ে অর্থ-উপার্জন করেই প্রভূত ধনশালী হয়েছিলেন। ডমরুধর ভিখারীকেও একটিও পয়সা দিতেন না। বলতেন এতে তারা অলস হয়ে পড়বে। তিনি নিজে মুখে খুব ভাল ভাল উপদেশাত্মক কথা বলতেন, কিন্তু কাজে তা' করেন না। অধিকাংশ মানুষেরই স্বভাব এই। তা' ছাড়া ডমরুধর জীবন থেকেই শিখেছেন যে সৎ মানুষের স্থান এই স্বার্থ-কুটীল জগতে অতি অল্প। যাঁরা প্রকৃত মহৎ তাঁদের আমরা বুঝতে পারি না। এই মহত্বের সঙ্গে একটু খাদ না মেশালে টিকে থাকাই দায় হয়। তাই ডমরুধর প্রবঞ্চনা, জাল, মিথ্যা, চুরি, কৌশল—সব কিছুই অবলম্বন করেছেন জীবনে প্রতিপত্তি লাভ করবার কামনায়। তাই বলে ডমরুধর আত্ম-প্রবঞ্চক নয়। পরকে তিনি প্রতারণা করেন কিন্তু নিজেকে তিনি প্রতারণা করেন না। পরকে প্রতারণা করা অপরাধ, আর নিজেকে প্রবঞ্চনা করা পাপ। ডমরুধর অপরাধ করলেও পাপ করেন না। নিজে যা' তাই-ই প্রকাশ করে দেন। আর পাঁচ জনের মত নিজের যথার্থ রূপটিকে আত্মগোপন করে ভাল মানুষ সেজে ঘুরে বেড়ান না। তাঁর সত্যবাদিতা ও সাহস সাধারণ মানুষের মিথ্যাচারণ ও কাপুরুষতাকে ব্যঙ্গ করতে চায়।

ডমরুধর চুরি করেছেন। একবার নয়, দুই বার, সুযোগ পেলে, সুবিধা মনে করলে আরও করতে পারেন। কিন্তু তাঁর প্রতিটি কার্য যুক্তি সমর্থিত। পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষই তার প্রতিটি কাজকে নিজ মতের অনুকূলে যুক্তিযুক্ত করে তোলে। মানবমনের এই চিরকালীন স্বরূপকে লেখক যেন ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে দেখতে চান। ডমরুধর যখন মোহর চুরি করে তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের রীতিটি কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক। তিনি বলেন, "চিরকাল পরিশ্রম করিলেও কখন আমি এত টাকা উপার্জন করিতে পারিতাম না।" দ্বিতীয়ত,

"ভগবান্ আমাকে মোহরগুলি দিয়াছেন। সে টাকা ফিরাইয়া দিলে আমার মহাপাতক হইবে।" ডমরুধরের যা কিছু শিক্ষা সবই এই পৃথিবী থেকেই। ডমরুধরের কথার মধ্যে দিয়ে অর্থলিপ্সু এক শ্রেণীর জনগণের মনের গোপন কথাটিই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ডমরুধর মনের কথাকে লুকিয়ে রাখেন না, আর অন্য সাধারণে লুকিয়ে রাখে, এরা সত্যই ব্যঙ্গের পাত্র। কেননা অর্থ জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হলেও, যে অর্থ উপার্জন মানুষকে অমানুষ করে তোলে তা' থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা অর্থের মানদণ্ডেই জীবনকে দেখেন। তা' ছাড়া, জনগণেরও একটা দুর্বলতা আছে যে ধনীদের সব সময়ে একটা বিশেষ নজরে দেখা। তারা মনে করে না যে, ওরা তাদেরই বঞ্চনা করেই ধনী হয়েছে। এইভাবে দুই শ্রেণীই সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। ডমরুধর ধনী-দরিদ্র সকলকে চেনেন, তাই এখন তিনি যে কোন প্রকারে অর্থ সঞ্চয় করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চান। এই বাসনায় তাকে অনেক সময় অনেক হাস্যকর কাজও করতে হয়। যেমন দ্বিতীয় বিবাহের সময় পাঁচশত টাকার গহনা একশত টাকায় দান, তৃতীয় বিবাহের সময় কন্যার আঁচলে নোট বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব; স্বদেশী কোম্পানী খোলা, কুমীর-বিভ্রাটে পড়া, নারকেল মশাইয়ের বাড়ীতে চুরিতে সহায়তা করা, ইত্যাদি নানা সময়ে নানা কাজ করতে হয়। সব কিছুর মূলে রয়েছে ডমরুধরের অর্থাকাঙ্ক্ষা। এমন কি তাঁর যে মা দুর্গার প্রতি অচলা ভক্তি তাও এই মোহসঞ্জাত। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁর যে বিগলিত ভক্তি তার কারণও একই। মোট কথা, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা ডমরুধরের মধ্য দিয়েও লেখক সেই একই লালসাকে প্রস্ফুট করেছেন। উদ্দেশ্য আমাদের বিপুলতম অর্থলোলুপতাকে তীব্র ব্যঙ্গ করা।

ডমরুধরের এই অর্থপ্রীতি অতি হাস্যকরভাবে রূপায়িত হয়েছে যে সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে তার দু'একটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমত আমরা তাঁর সুন্দরবন অঞ্চলে আবাদ ক্রয়ের কথা উল্লেখ করতে পারি। কি নিদারুণ কষ্টকে তিনি স্বীকার করেছেন। পাঁচ হাজার টাকার সম্পত্তি এক হাজার টাকায় ক্রয় করে তিনি ভেবেছিলেন প্রভূত সম্পদশালী হতে পারবেন। কিন্তু সুন্দরবন অঞ্চলের সেই চড়ুই পাখীর মত মশার শিকার এক অদ্ভুত হাস্যকরতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। নানা কারণে আবাদটির

সব সম্ভাবনা যখন ব্যর্থ হতে চলল তখন ডমরুধর এত কষ্টের টাকা সব বৃথায় গেল ভেবে বড় আকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু সহজে কোন কাজে হতাশ হওয়ার পাত্র তিনি নন। এই সময়ে তাঁর মশা শিকারের দৃশ্য এক অবিশ্বাস্য কৌতুক সৃষ্টি করে।

"গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, বৃহৎ একটি মশারি প্রস্তুত করিলাম। কাপড়ের মশারি নহে, নেটের মশারি নহে, জেলেরা যে জাল দিয়া মাছ ধরে, সেই জালের মশারি। তাহার পর পাঁচজন সাঁওতালকে চাকর রাখিলাম। একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া সেই পাঁচজন সাঁওতালকে সঙ্গে নিয়া পুনরায় আবাদে গমন করিলাম। চারি কোণে চারিটি বাঁশ দিয়া চারি জন মাঝি ভিতর হইতে মশারি উচ্চ করিয়া ধরিল। তীর-ধনু হাতে লইয়া চারিপার্শ্বে চারিজন সাঁওতাল দাঁড়াইল। একজন সাঁওতালের সহিত আমি মশারির মাঝখানে রহিলাম। মশারির ভিতর থাকিয়া আমরা দশজন আবাদের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অধিক দূর যাইতে হয় নাই। বৃহৎ মশকগণ বোধ হয় অনেক দিন উপবাসী ছিল। মানুষের গন্ধ পাইয়া পালে পালে তাহারা মশারির গায়ে আসিয়া বসিল।......সাঁওতাল পাঁচজন ক্রমাগত তাহাদিগকে তীর দিয়া বধ করিতে লাগিল। সেদিন আমরা আড়াই হাজার মশা মারিয়াছিলাম।"—এইভাবে মশা বধ করবার যে দৃশ্য তা' নিঃসন্দেহে হাস্যকর। মানুষের বিষয় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার যে প্রবলতম বাসনা তা' যেন কিছুটা অতিরঞ্জনের সঙ্গে এখানে চিত্রিত হয়েছে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কিছুটা ব্যঙ্গ করা ছাড়া। তৎকালীন সমাজের কিছু বাঙালীর যে কোন স্থানে, যে কোন প্রকারে সম্পত্তি করার যে লোভ ছিল, তা' কখন কখন অর্থহীন বলে মনে হয়, উগ্র লোভের উদ্ভট প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। এ লোভ হাস্যকর মনে হয়েছে লেখকের কাছে। ডমরুধর তাঁর শতচেষ্টাতেও সুন্দরবনের আবাদটি চাষ-উপযোগী করে তুলতে পারেননি। তাঁর সমুদয় টাকা প্রায় খরচ হতে চলল। এখন আরও একহাজার টাকার প্রয়োজন। কি করে যে এই টাকার সঞ্চয় করবেন ভেবেই পেলেন না। শেষে নারকেল মশায়ের নিকট থেকে কিভাবে যে তিনি এই টাকা সংগ্রহ করলেন তা' অতি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। কেন যে ডমরুধর নারকেল মশায়ের বাড়ীতে গমন করেছিলেন তার কারণটি আমরা ডমরুধরের কাছে যখন শুনি

তখন সত্যের সহজতর স্বীকৃতি থেকে ব্যবসায়িক অসাধুনীতির কিছুটা আভাস পাই। ডমরুধর এই অভিজ্ঞতা তাঁরই জীবন থেকে সঞ্চয় করেন।

"দোকানদারের রীতি এই। আলাপী লোকেরা আমাদিগকে বিশ্বাস করে, আলাপী লোককে ঠকাইতে দোকানদারের বিলক্ষণ সুবিধা হয়। বড় বাজারে বসিয়া প্রতিদিন হাজার হাজার মিথ্যা কথা বলিতাম; শত শত লোককে আমরা ঠকাইতাম। না ঠকাইলে আমাদের কাজ চলে না। এই সূত্রে সারকেল মশায়ের সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল।"

এই স্বরূপ সারকেল মশায়ের কাছ থেকে তিনি এক হাজার টাকা ঋণ করবেন স্থির করলেন। অবশ্য এ ঋণ তিনি পরিশোধ করতেন কি না তাতে প্রচুর সন্দেহ ছিল। তবু ঋণী হওয়ার হাত থেকে সন্ন্যাসীর দলই তাঁকে বোধহয় রক্ষা করেছিল। এই সময় সারকেল মশায়ের গৃহে সন্ন্যাসীগণ কর্তৃক যে চুরি অনুষ্ঠিত হয় তার সঙ্গে ডমরুধর যুক্ত হয়ে পড়েন, আর এই চুরিই তাঁকে ঋণের দায় হইতে বাঁচায়। অবশ্য তিনি যে চুরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এ কথা মানতে চান না। লম্বোদর যখন বললেন, "সে চোরগণ তোমার অপরিচিত লোক ছিল না।" তখন ডমরুধরের উক্তি সত্য হলেও কৌতুক-প্রদ।

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"সমুদয় মিথ্যা কথা, হিংসায় লোকে কি না বলে।"

ডমরুধরের তথা এই শ্রেণীর ধুরন্ধর চতুর লোকের এ উক্তি বিশেষ ভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ। এই শ্রেণীর লোকেরা চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে, কিন্তু সেই চুরি বা মিথ্যাকে কিছুতেই লোকের কাছে প্রকাশ করে না, আর যদি বা প্রকাশ হয়ে পড়ে তো তাকে অন্যভাবে চিত্রিত করার চেষ্টায় থাকে। এখানে তাই ডমরুধর বলেছেন যে, হিংসায় লোকে কি না বলে। এ কথা ঠিক হিংসায় আমরা এমন সব কাজ করে ফেলি যেগুলির পিছনে সত্যি আছে কি না সব সময়ে খুঁটিয়ে দেখি না। একজনে বড় হয়ে যাচ্ছে, সম্পদশালী হচ্ছে এ ব্যাপার আমাদের সহ্য হয় না, আমরাও তার সমগোত্রীয় হয়েও যে ঐ লোকটির সমকক্ষ হতে পারছি না এইটাই আমাদের হিংসার কারণ। তাই আমরা ডমরুধরের উক্তিকে সত্যের অপলাপ এ কথা বলতেও পারি না। আবার এই উক্তি যেন আমাদের স্বভাবের দীনতা এবং ধূর্ত ব্যক্তির মিথ্যা— এই দুইকেই ব্যঙ্গ করে।

ডমরুধরের অর্থকামনার হাস্যকর চিত্রণ আর একটি ঘটনায় বিশেষভাবেই প্রকট হয়ে ওঠে। ডমরুধরের আবাদের কাছে নদী ছিল। আর সে নদীতে ছিল প্রচুর কুমীর। একটি ছিল ভীষণ আকৃতির ও ভয়ানক। একবার এক পূর্বদেশীয় ভদ্রলোক কলকাতা থেকে সপরিবারে দেশে ফিরছিলেন। হঠাৎ সেই ভীষণ কুমীরটি নৌকা ডুবিয়ে সকলকে গিলে ফেললো। এদের মধ্যে একটি মহিলা ছিলেন, যিনি সর্বাঙ্গ বহুমূল্য অলংকারে ভূষিত ছিলেন। ডমরুধর এই দৃশ্যকে লক্ষ্য করলেন। ভাবলেন ঐ কুমীরটি বধ করতে পারলে তিনি হয়ত পাঁচ, ছয় হাজার টাকার মালিক হবেন। অনেক খরচ করে কুমীর শিকার করে পেট কেটে যা' দেখলেন তা'তে তাঁর সমস্ত আশা আহত হয়েছিল। কিন্তু আমরা প্রচুর হাস্যরসের খোরাক পেয়েছিলাম।

"ডমরুধর বলিলেন,—বলিব কি ভাই, আর দুঃখের কথা, কুমীরের পেটের ভিতর দেখি না যে, সেই সাঁওতাল মাগী, চারিদিন পূর্বে কুমীর যাহাকে আস্ত ভক্ষণ করিয়াছিল, সেই মাগী পূর্বদেশীয় সেই ভদ্র মহিলার সমুদয় গহনাগুলি আপনার সর্বাঙ্গে পরিয়াছে, তাহার পর নিজের বেগুনের ঝুড়িটি সে উপুড় করিয়াছে, সেই বেগুনগুলি সম্মুখে ডাঁই করিয়া রাখিয়াছে। ঝুড়ির উপরে বসিয়া মাগী বেগুন বেচিতেছে!"

ডমরুধরের এই হতাশায়ও আমরা না হেসে পারি না। কিন্তু ডমরুধর জীবনকে যেন কোন শিল্পীর নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন, তাই কোন আশাহত দুঃখ তাঁর মধ্যে স্থায়ীত্ব লাভ করে না। সহজভাবেই সুখ-দুঃখ, পাওয়া-না-পাওয়াকে গ্রহণ করতে পারেন। তাই মনে ভাবেন, "কপালে পুরুষের ভাগ্যও সকল সময় প্রসন্ন হয় না।" ডমরুধর এমন সহজভাবে এই ঘটনায় ব্যর্থতাকে গ্রহণ করলে কি হবে, সকলে হয়তো পারে না। তারা তাদের সর্বনাশে হাহাকার করে। এক কণাও যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তা' তাদের সহ্য হয় না। মানুষের চরমতম অর্থমোহ ডমরুধরের "কুমীর বিভ্রাট" শীর্ষক গল্পাংশে দেখিয়ে লেখক হাস্যরসের হাল্কা গতিতে ব্যঙ্গ করেছেন।

ডমরুধর মানুষকে ঠকিয়ে প্রবঞ্চনা করে অর্থাগমের পথটিকে সুগম করার চেষ্টা করেন সাধারণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি দু'বার কোম্পানী খুলেছেন। দুইবারই সব টাকা আত্মসাৎ করেছেন। ডমরুধরের লোক চরিত্রের প্রতি অদ্ভুত জ্ঞান। তিনি ধূর্তকেও চেনেন, মূর্খকেও চেনেন। আর এদের চিনে তিনি এদের ওপর দিয়ে যাবার চেষ্টায় থাকেন। কোন এক

পুজোর পর চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের সুশ্রী যুবাটি যখন রং ফরসা হওয়ার এক-টাকার ওষুধ আট আনায় ডমরুধরের নিকট বিক্রয় করল, তখন ডমরুধরের মনের অবস্থাটি আমাদের লক্ষ্য করার মত। তিনি বুঝতে পারলেন যে, সেই যুবকটি তাঁকে ঠকিয়ে পয়সা নিয়ে যাচ্ছে তবু এক শ্রেণীর মানুষের মনের গোপন কোণের একটি বাসনা যেন জয়ী হয়ে ওঠে। বিক্রেতার কথায় তাই ডমরু যেন কেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন—"আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু মন আপনার বৃদ্ধ হয় নাই। মনটি আপনার নব যৌবনে ঢল ঢল করিতেছে। আর কোন ওষুধ লউন আর নাই লউন, আপনাকে এই রং ফর্সা হইবার ঔষধটি লইতে হইবে। দিন কয়েক মুখে মাখিয়া দেখুন। আপনি ফুট গৌর বর্ণ হইয়া পড়িবেন। সুন্দর সুকুমার কুড়ি বৎসরের যুবক হইবেন।" বিক্রেতার এই ধাপ্পাতে ডমরুধরের মত লোকও দুর্বল হয়ে পড়েন। ভাবেন "এই ঔষুধটি পরীক্ষা করিয়া দেখি না, কেন? যদি আমার রং ফর্সা হয়, তাহা হইলে দুর্লভী বাগ্দিনী আমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইবে।" আমাকে পাঁচজনে দেখে প্রশংসা করবে। এক ধরনের লোকের এই মনোভাব এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ডমরুর মতই আমাদের চারপাশে তারা রয়েছে। সুতরাং ডমরু এখানে হাস্যাস্পদ নয়, হাস্যাস্পদ আমাদের মধ্যেকার একটি বিশেষ শ্রেণী, এই শ্রেণীটি ক্ষীণ নয়, বরং বৃহৎ বলা যেতে পারে। সুতরাং এখানে লেখকের ডমরুধরকে ব্যঙ্গ করা মানেই আমাদের স্বভাবের দীনতাকে ব্যঙ্গ করা। তাই আমাদের মনের গোপন ইচ্ছাকে ডমরুর সত্যভাবণের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই ধরনের বক্তাদের তিনি কৌতুক করে "ছেলে-খেকো বক্তা" বলেছেন। এরা তাদের বক্তৃতার জোরে ধনী-নির্ধন সকলের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে। তাই এদের উদ্দেশ্য করে পিং মহাশয় ডমরুধরকে বলেছিলেন, "আপনাকে আরও এক বিষয়ে সাবধান করি। কিছুদূরে আপনি ছেলে-খেকো বক্তাদিগের প্রেতগণকে দেখিতে পাইবেন। তাহাদের বক্তৃতা যেন আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে। গো অশ্ব মেষ মহিষ খর শূকর বিড়াল কুক্কুর ইন্দুর বাঁদরের মৃত পচিত দেহ উদ্ভূত চর্বি সম্ভূত, অবিকৃত, বিশুদ্ধ, পবিত্র পূষ রূপে বিভূষিত গলিত মড়া-গন্ধে আমোদিত, ময়রা মহলে সমাদৃত সর্বত্র প্রচলিত ঘৃত সদৃশ আপনার হৃদয় গলিয়া যাইবে। তখন আপনি যা নয়—তাই করিয়া বসিবেন।

বক্তৃতাবলে ইনি অনেক অপোগণ্ড শিশুর ইহকাল পরকাল ভক্ষণ

করিয়াছিলেন। অনেক সংসার ছারে-খারে দিয়াছিলেন।…পাতালে অসুরদিগের কানের পোকা হইলে, তাঁহারা ইহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আগমন করে। পাঁচ মিনিট কাল ইহার বক্তৃতা তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেই কানের পোকা ধড়-ফড় করিয়া বাহির হইয়া যায়।"

লোকচরিত্রে ডমরুধরের অসাধারণ জ্ঞান ছিল বলেই তিনি সেই ঔষুধ বিক্রেতা শঙ্কর ঘোষকে চিনতে পারলেন। তাই কিছু দূর যেতে না যেতেই তাঁর মনে হ'ল,—"আমি ডমরুধর। সুমিষ্ট বক্তৃতা করিয়া আমাকে ঠকাইয়া এ আট আনা লইয়া গেল। এ সামান্য ছোকরা নয়।" এই অসামান্য ছোকরাটিকে হাত করার চেষ্টা করলেন। এবং সে চেষ্টা সফলও হয়েছিল। এই শঙ্কর ঘোষকে নিয়েই ডমরুধরের স্বদেশী কোম্পানী স্থাপন।

এই স্বদেশী কোম্পানী স্থাপনের মধ্যে দিয়ে শুধু ডমরুধরের স্বভাবটি প্রকট হচ্ছে তাই নয়, তাঁর স্বভাবের আলোতে আমাদের স্বভাবও আলোকিত হয়ে উঠছে। অর্থপ্রীতি শুধু একা তাঁরই নয় আমাদের মধ্যে পনেরো আনা লোকেরই। তবে পার্থক্য এই আমরা মূর্খের মত অর্থলাভের আশায় হাত বাড়াই আর ডমরুধর শ্রেণীর চতুরেরা আমাদের সেই দুর্বলতার সুযোগটিকে গ্রহণ করে বেশ কিছু করে নেয়। এমনকি শঙ্কর ঘোষের চাতুর্যও পরাজিত হয়ে যায়। আমাদের দুর্বল বা মোহগ্রস্থ স্বাদেশিকতাকে লেখক এই স্বদেশী কোম্পানীর মাধ্যমে ব্যঙ্গ করেছেন। বিদেশী জিনিষ বর্জন, স্বদেশী কোম্পানীর উপর আস্থা স্থাপন, বাঙালীর হুজুগপ্রিয়তা ইত্যাদিতে সে ব্যঙ্গের প্রকাশ ঘটেছে। তা' ছাড়া বক্তৃতার স্রোতের সামনে পড়ে আমাদের যে দুর্বল আচ্ছন্নতা সেদিকেও কটাক্ষ আছে। যারা একটু ইংরাজী শিখেছে, দু'তিনটে পাস দিয়েছে তাদের কথার পরে জনগণের গভীরতর আস্থাও হাস্যকর ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিছু উদ্ধৃতিতে ব্যঙ্গের স্বরূপটি স্পষ্ট হবে,—

"এঁটেল মাটী ও কাগজের নমুনা দেখিয়া বড়লোকেরা ঘোরতর আশ্চর্য হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজন বলিলেন,—"এঁটেল মাটী দিয়া কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। আমি মনে করিতাম যে, খড়িমাটি দিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়।"

শঙ্কর ঘোষ উত্তর করিলেন,—"খড়ি মাটি দিয়া হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে খরচ অধিক পড়ে।"

কাগজ সম্বন্ধে ইহার এইরূপ গভীর জ্ঞান দেখিয়া অন্য সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল যে, আর আমাদের ভাবনা নাই। যখন এঁটেল মাটী হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে, তখন বালি হইতে কাপড় হইবে। বিদেশ হইতে কোন দ্রব্য আর আমাদিগকে আমদানি করিতে হইবে না। দেশ টাকায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া কলিকাতায় বাঙ্গালীরা একদিন সন্ধ্যাবেলা আপন আপন ঘর আলোকমালায় আলোকিত করিল।

প্রথম প্রথম শত শত লোক শেয়ার কিনিতে লাগিল। হুড় হুড় করিয়া টাকা আসিতে লাগিল।"

লেখক যে এইসব উদ্ধৃতস্থানে জনগণের মূর্খতা ও ডমরুধর শ্রেণীর লোকের চতুরতা উভয়কেই ব্যঙ্গ করেছেন, তা' বলাই বাহুল্য।

অর্থকামনার সঙ্গে সঙ্গে নারীসঙ্গ কামনা ও ভোগাকাঙ্ক্ষা ডমরুধরের মধ্যে অতি পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। ডমরুধরের মধ্যে দিয়ে লেখক তৎকালীন সমাজকেই যে শুধু ব্যঙ্গ করেছেন তাই নয়, চিরকালীন সমাজের অসংখ্য জনগণকে তিনি এইভাবে হাস্যকর করে তুলতে চান। এবং তাঁর সে চেষ্টা অতি সার্থকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ডমরুধরকে এমন ভাবে আঁকা হয়েছে যে তাঁর স্বভাব ও কার্যকলাপ অপরকে আক্রমণ করলেও তিনি নিজে কখনও কোন অবস্থাকেই চরম বা চূড়ান্ত বলে মেনে নেন না। তাই বার বার ব্যর্থতাও তাঁকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে দেখি। হিউমারিস্টের দৃষ্টিতে যেন তিনি জীবনকে দেখেছেন। এইজন্যেই বোধহয় কোন অবস্থাই তাঁকে একেবারে নিস্তেজ করে দিতে পারে না। ডমরুধরের কামনা বাসনাগুলো অতি স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিক সহজ সত্যটুকুকে লেখক বর্ণে বর্ণে, রেখায় রেখায়, তুলে ধরেছেন। মনের গোপন সত্যকে প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত করেছেন। গোপনকে দৃষ্টিগোচর করাতে যেন আমাদের মনে হচ্ছে এ এক বিরাট অসঙ্গতি। ডমরুধর অতি অমার্জিত, অশিক্ষিত পুরুষ। নারীকে শুধু দেখেন ভোগ বাসনার ইন্ধনরূপে। নারী তাঁর চোখে শুধুই কামনার। তাই তিনি সারাজীবন এই সঙ্গ-সুখ লাভের আশায় ছুটেছেন, পেয়েছেন কি তা' ভাবলে অবাক লাগে। দাম্পত্যজীবন হয়েছে দুর্বিবহ, আর নিজের ব্যক্তি-জীবনে কোন মহত্তর কিছুরই সূচনা হয়নি, শুধুই ঠাট্টা আর উপহাস। তবু

এই ধরনের কামনার্ত পুরুষের কোন চেতনা নেই, লোভ আর লোভে জর্জরিত হয়ে তারা এই ডমরুধরের মত ঘুরে বেড়ায়, তাদের চিনতে পারি না, যদি তাদের হাতে হাতে ধরে দিতে পারি তবে ঠিক বুঝবো এরা ডমরুধরেরই সহোদর।

ডমরুধর যেভাবে বার বার বিবাহ করেও তাঁর দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি এমন হয়তো সে-সমাজে সম্ভব ছিল ; এ সমাজে তা' সম্ভব নয় তবু সেই মনোবৃত্তি আজও বেঁচে আছে, আর মনে হয় চিরদিনই এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে থাকবে। ডমরুধরের প্রথমা পত্নীবিয়োগ হয়েছে পঁচিশ বছরে। এর পর তিনি দশবছর অ-বিবাহিত, অতি দারিদ্র্যে জর্জরিত। এরই পর হঠাৎ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রহ্লাদবাবুর কন্যার সহিত তাঁর সাক্ষাৎ। "আমি তাহাকে যখন দেখিলাম, তখন অকস্মাৎ আমার মনে উদয় হইল—কে যেন আমার কানে কানে বলিয়া দিল যে,—ডমরুধর। এই কন্যাটি তোমার দ্বিতীয় পক্ষ হইবে। তোমার জন্যই বিধাতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" মালতীকে দেখা পর্যন্ত ডমরুধরের মানসিক যে চাঞ্চল্য তা' অনেকের মনেই ঘটতে পারে। স্বভাব-বিরুদ্ধ কিছু নয়। তবু আমরা কৌতুক পাই ; ডমরুধর যখন ভাবেন "বয়স আমার পঁয়ত্রিশ বৎসর, রূপ আমার এই, অবস্থা আমার সেই—কথা উত্থাপন করিলে তিনি হয় ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন।" তখন হয়তো আমরা প্রচুর হাসি। এমন কি ধীরে ধীরে রোগাক্রান্ত কন্যার গৃহে বার বার যাতায়াতের সুযোগ রচনা করা, বড়বাজার থেকে ছাড়ানো বেদানা এনে দেওয়া, অথবা ঝিকে মাঝে মাঝে দু'একটি সন্দেশ রসগোল্লা, বা জিলিপি দিয়ে বশ করে মালতীর সংবাদ লওয়া, এবং নিজে যে প্রতিপত্তিশালী লোক তা' জাহির করার মধ্যে হাস্যরস থাকলেও, অসঙ্গতি থাকলেও, এ ধরনের ভীরুতা বা দুর্বলতা সেই অবস্থায় এলে আরও অনেক ডমরুধরের ঘটতে পারতো সে কথাকে আমরা যেন না ভুলি। বরং ডমরুধরের চাইতে কখনও কখনও তারা আরও শতগুণ অমানুষিকতার, দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে ফেলতো। ডমরুধর comic চরিত্র, তাই আমাদের হাস্য উৎপাদন করতে পারেন, কিন্তু ডমরুধর সরল তাই আমাদের ঘৃণার পাত্র তিনি কখনই হয়ে ওঠেন না, কিন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে এমন অনেক চরিত্র রয়েছে যাঁরা সৎও নন্, স্বাভাবিকও নন্। তাঁরা বিকৃত, তাই ঘৃণ্য। পুরোপুরি ব্যঙ্গের পাত্র তাঁরা।

ডমরুধরের তৃতীয় বিবাহ অতি হাস্যকরভাবে চিত্রিত হয়েছে। ঘটকের কাছে বিবাহের প্রস্তাব শুনে অবধি ডমরুধর মনে মনে কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলেন—তাঁর এই চঞ্চলতা বা অস্থিরতাও হাস্যের ও ব্যঙ্গের। ডমরুধর নিজের ত্রুটি, দুর্বলতাকে জানেন পুরোপুরিভাবেই। তাঁর রূপ-সচেতনতাই বড় বেশী যেন হাস্যের। দেহে বার্ধক্য, মনে ভোগ করবার আকুল পিপাসা। শক্তি নেই, কিন্তু সাধ আছে, এই যে অসঙ্গতির পাঁকে পড়ে ডমরুধর অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন—লেখক অনাবিল হাস্যরসের মাধ্যমে তা' প্রকাশ করে ব্যঙ্গই করতে চেয়েছেন।

তৃতীয় বিবাহে যখন কন্যার মাতা-পিতা যখন কন্যার সর্বশরীরে গহনা দাবী করলেন, তখন কৃপণ, ডমরুধর সেই ব্যয়ভার বহন করতে চান কোন যুক্তিতে তা' বিশেষভাবেই লক্ষ্য করার মত।

"অবশেষে আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর, তাহার পর আমাকে দেখিয়া কেহ বলে না যে, ইনি সাক্ষাৎ কন্দর্প-পুরুষ। নিজের কথা নিজে বলিতে ক্ষতি নাই,—এই দেখ, আমার দেহের বর্ণটি ঠিক যেন দময়ন্তীর পোড়া শোউল মাছ। দাঁত একটিও নাই, মাথার মাঝখানে টাক, তাহার চারিদিকে চুল, তাহাতে একগাছিও কাঁচা চুল নাই, মুখে ঠোঁটের দুই-পাশে সাদা সাদা কি সব যেন হইয়াছে। এইসব কথা ভাবিয়া সব গহনা দিতে আমি সম্মত হইলাম।"—এখানে ডমরুধরের স্পষ্টোক্তিতে আমরা যথেষ্ট কৌতুক উপভোগ করি। কিন্তু ডমরুধর রূপহীনতাতে ভয় পান না; কুণ্ঠিত হন না, লজ্জিত হন না। বরং টাকা দিয়ে সেই অভাবকে পূরণ করতেই চান। মোট কথা তাঁর এই তৃতীয়পক্ষের বিবাহ-বাসনা লালসা ছাড়া কিছু নয়। তৎকালীন সমাজে এ বিবাহের প্রচলন ছিল। লেখক বৃদ্ধের এই ভোগাকাঙ্ক্ষাকে ব্যঙ্গ করেছেন। এই ব্যঙ্গ বিবাহ-সভায় ডমরুধরের লাঞ্ছনার মধ্যে রসিকতার ছলে প্রকাশ পেয়েছে। "বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিত্তি রক্ষে"—এই কথা বলে সেই তাড়কা রাক্ষসীর সাড়াশীর মত হাত দিয়ে, ও ছোট ছোট ফচ্‌কে ছুড়ীর লক্কারাঙ্গা হাত দিয়ে যেভাবে লেখক ডমরুধরের কর্ণমর্দন করেছেন, তাতে এই ধরনের দুর্বল, কামার্ত, বৃদ্ধের প্রতি এক হাস্যকর উপেক্ষা, কৌতুকময় ব্যঙ্গই নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

প্রায় প্রত্যেক মানুষের স্বভাবের দুটি দিক, যাকে কিছুটা বিকৃত বা

অসঙ্গতিময় বলে লেখকের মনে হয়েছে তাকেই তিনি প্রধানতম করে ডমরুধর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আঁকতে চেয়েছেন। এই দুটি দিক হল, একটি আমাদের অর্থাকাঙ্ক্ষা, অপরটি আমাদের কামনা। এই দুই-এর টানাপোড়েনে পড়ে একবার ডমরুধর যে কি ভীষণ বিপদে পড়েছিল, এবং তার সেই বিপদকে আমরা যে কি ভাবে উপভোগ করেছিলাম তার কাহিনী অতি সুকৌশলে সন্ন্যাসী সঙ্কটের গল্পটিতে বলা হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে দিয়ে ভণ্ড সন্ন্যাসীকে ব্যঙ্গ করাও আছে এবং তার কামনা-বাসনা ও ভোগাকাঙ্ক্ষার দিকটির উদ্‌ঘাটনও আছে। ডমরুধরের মত ধূর্ত, লোকচরিত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তি সন্ন্যাসীর প্রবঞ্চনায় পতিত হওয়া এক অবিশ্বাস্য ঘটনা বলা যেতে পারে। কিন্তু এইরূপই ঘটেছিল। সমুদয় সম্পত্তি দ্বিগুণ করে পাওয়ার লোভই তাঁকে এই সংকট-সম্মুখীন করে। কিন্তু লেখক এই অবসরে ডমরুধরকে জ্ঞানহীন করে, ডমরুধরের অবচেতন মনের সমগ্র জগতটিকে আমাদের সামনে এনে দিয়েছেন। এর ফলে ডমরুধরের বুদ্ধিজাত ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্তার বাইরে, তাঁর সুপ্ত কামনাবাসনার রূপটি অতি হাস্যকরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ডমরুধর জ্ঞান-হীন হয়ে না পড়লে আমরা তাঁর সেই কামনা-জর্জর বিষয়-আসক্ত মনের আকুলি-বিকুলি, চঞ্চলতা ইত্যাদিকে সত্য করে অনুভব করতে পারতাম না। সন্ন্যাসী ডমরুধরের দেহ ধারণ করে, তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করছে, অকৃপণভাবে দান করছে, আর তাঁরই সঙ্গে বিবাহ-নির্দিষ্ট পাত্রীকে বিবাহ করতে যাচ্ছে—তার এই চিন্তাগুলো অবাস্তব চিন্তা বা কাহিনী বলে আমরা একেবারে হালকা করে দেখতে পারি না। বরং বলতে পারি এই অসঙ্গত, অবিশ্বাস্য কাহিনীটিতে ডমরুধরের আসল রূপ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। কল্পনা ও সত্যে মেশামেশি হয়ে গেছে। এখানে লেখক মানব মনের দ্বৈত সত্তার উদ্‌ঘাটন করেছেন। ডমরুধরের সন্ন্যাসীর রূপ ধারণও দেহে-মনে দারুণতম যাতনা ভোগের দৃশ্যে ডমরুধর কেবলই বলেছেন "সন্ন্যাসী বেটা আমার সমুদয় সম্পত্তি নষ্ট করিতেছে দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল," "একে আমার টাকার শ্রাদ্ধ, তাহার উপর সন্ন্যাসী আমার শরীরে আমার জন্য মনোনীত কন্যাকে গিয়া বিবাহ করিবে, এই দুঃখে মনের ভিতর আমার দাবানল জ্বলিতে লাগিল।" ডমরুধর সন্ন্যাসীর ভাবনায় এত অস্থির হয়ে পড়লেন যে শেষে মনের বেদনায় বসে বসে কাঁদতে লাগলেন। ডমরুধরের বিবাহ-বাসনা তাঁর কান্নার মধ্যে অতি হাস্যকরভাবে দেখানো হয়েছে। তা'

ছাড়া বিপদে পড়ে আমরা যে কিরূপ অসহায়ভাবে দেবতাদের ডাকতে থাকি তারই একটি হাস্যময় ব্যঙ্গাত্মক দিক নিয়ে উদ্ধৃত হল,—

"না এদিক্, না ওদিক, না মরা, না বাঁচা, আমার অবস্থা ভাবিয়া আমি আকুল হইলাম। আজ "আমি" সাজিয়া সন্ন্যাসী আমার কন্যাকে বিবাহ করিবে, বাসরঘরে সন্ন্যাসী গান করিবে, তাহার পর ফুলশয্যা হইবে,—ওঃ! আর আমার প্রাণে সয় না। হায় হায় আমার সব গেল। হঠাৎ এই সময় মা দুর্গাকে আমার স্মরণ হইল। প্রাণ ভরিয়া মাকে আমি ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—"মা। তুমি জগতের মা। তোমার এই অভাগা পুত্রের প্রতি তুমি কৃপা কর। মহিষাসুরের হাত হইতে তুমি আমাকে নিস্তার কর। মনসা লক্ষ্মীর কখন পূজা করি নাই, ঘেঁটু পূজাও করি নাই, কোন দেবতার পূজা করি নাই। কিন্তু এখন হইতে, মা, প্রতি বৎসর তোমার পূজা করিব।"

হয়তো মা দুর্গা ডমরুধরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, তাই তো ডমরু অত সহজে এক শূন্য ব্যাঘ্রদেহ দেখতে পেলেন এবং তারই দেহে প্রবেশ করে বর ও বরযাত্রীদের ওপরে অত বীরবিক্রমে পডতে পেরেছিলেন। সন্ন্যাসী ও বরযাত্রীদের ভীত করে, পালিয়ে যেতে বাধ্য করে যেভাবে নিজেই একটি ঢোল কুড়িয়ে নিয়ে তিনি ঢ্যাং ঢ্যাং করে বাজাতে লাগলেন, ও বিবাহ করতে গেলেন—তার মধ্যে ডমরুধরের মনের তীব্র বিকৃত বাসনাই তাঁর অবচেতন মনের স্তর থেকে তুলে এনে আমাদের সামনে মেলে ধরে তাঁর স্বভাবের অসঙ্গতির রূপটি অতি স্পষ্ট ও প্রকট করে তুলেছেন। ডমরুধরকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আনা ও সন্ন্যাসী-সঙ্কটে ফেলা বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বার্ধক্যলাভ করা সত্ত্বেও তিনি যে বিবাহের জন্যে কতটা পাগল তা অতি হাস্যকরভাবে চিত্রিত হয়েছে। বিবাহের জন্যে তিনি এখন সব করতে পারেন, কিন্তু পাত্রীকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারেন না। ডমরুধরের কোন কিছুতেই লজ্জা নেই; কোন বিপদেই গ্রাহ্য নেই তাই বিবাহের পরদিন, কন্যা নিয়ে যখন তিনি বাড়ী ফিরছিলেন সেই সময় ঢাকি ঢুলিদের পরিত্যক্ত যন্ত্রগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে যেতে তিনি লজ্জিত হননি। কিছুদিন পরে যখন তারা তাঁর কাছে এলো তখন তাদের যন্ত্রগুলিই ফেরৎ দিলেন, ডমরুধর ভাল করেই জানতেন যন্ত্র পেলে, তারা আর লজ্জার খাতিরে টাকা চাইতে পারবে না। কেন না লোকস্বভাবে যে তাঁর অদ্ভুত জ্ঞান।

ডমরুধরের বিবাহের মধ্যে দিয়ে স্ত্রী-স্বভাবের আর একটি অসঙ্গতিময় দিকের প্রতি লেখক স্পষ্ট কটাক্ষ করেছেন। বিবাহের সময় ডমরুধরের রূপ দর্শন করে ও পরে কন্যার অঙ্গের আলোকরা ঝকমকে গহনা দেখে তাঁর শাশুড়ীর কান্নার যে প্রসারণ ও ক্রম-সঙ্কোচন তাতে হাস্য ও ব্যঙ্গ দুইই প্রস্ফুট। প্রথমে তাঁর কান্নার সুর ছিল—"ও গো, মা গো, ও পোড়া বাঁদরের হাতে তোরে কি করিয়া দিব গো! ওগো মাগো! ও বুড়ো ডেক্‌রার হাতে কি করিয়া তোকে দিব গো। ঘরে যে কালীঘাটের কালীর পট আছে, যা এক পয়সা দিয়া কিনিয়াছিলাম, তার মত তোর যে মুখখানি গো!"……একটু পরে কন্যার কালো দেহে গহনার ঝক্‌মকি দেখে শাশুড়ীর কান্নার সুরে ঢিলে পড়ল—পোড়া বাঁদরের হাতে, বুড়ো ডেকরার হাতে…কি করে দেব ইত্যাদি অংশ বাদ পড়লো · শেষে "ওগো মাগো কালীঘাটের কালী ঠাকুরের মত তোর যে মুখখানি গো"। তারপর দুই হস্তে গহনা পরানো হলে তাঁর কান্না আর একটু নিয়ে নামলো–এবার শুধু—কালীঘাটের কালীঠাকুরের মত, ক্রমে "কালীঘাটের—" বলেই তাঁর কান্নার "সুর মৃদু ও ছন্দ পাপড়ি ভাঙ্গা" হ'ল—শেষে সমুদয় গহনা পরানো হলে চোখ মুছে তিনি বললেন—"তা হউক! আমার এলোকেশী সুখে থাকিবে।" শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর এ ধরনের কান্নার যে ব্যঙ্গের আমেজটি প্রতিফলিত হয়েছে তা' অতি স্পষ্ট। ডমরুকে দেখে যে কান্না তা' আস্তে আস্তে কেমন করে ফুরিয়ে গেল, তা' আমাদের অবাক করে। গহনাই এই কান্নাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। তাই শাশুড়ী শেষে বলতে পারলেন যে তার এলোকেশী সুখে থাকবে। আসল ছেড়ে নকল নিয়েই তাঁর সন্তুষ্টি। জীবনের সবটুকু সুখ ঐ গহনার মধ্যে লুকিয়ে আছে যেন। স্বভাবের এ এক অসঙ্গতি ছাড়া কি বলা যায়। নারী স্বভাবের এ এক প্রবলতম অসঙ্গতি ছাড়া আর কিছু নয়। এ অসঙ্গতি হাস্যের ও ব্যঙ্গের।

আমাদের স্বভাবের মধ্যে আরও এমন কতগুলি দিক আছে যা হাস্যকর। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা নিজেকে কন্দর্পতুল্য মনে করে। হয়তো তাদের রূপ সুরূপ বলে তো নয়ই, এমন কি কুরূপ বলে সকলের কাছে মনে হয়, তবু তাদের রূপের গর্বের শেষ নাই। এই আত্ম-গৌরব হাস্যকর। এই দিকটি গল্পের মধ্যে নানাস্থানে অতি সুন্দররূপে বলা হয়েছে। ডমরুধরের স্বভাবে এই রূপ সচেতনতা অতি হাস্যকর রূপেই দেখানো হয়েছে। ডমরুধরও নিজেকে কন্দর্পতুল্য মনে করতেন। এলোকেশীর রূপের কথা আমরা সবাই

জানি। ডমরুধর যাকে কালীঘাটের মা কালীর বাচ্চা বলে মনে করতেন, ভূতও যাকে দেখে তিন লাফে পালিয়ে যায়, তিনিও রূপহীন শুনলে মুখ হাঁড়ি করেন, গজর গজর করেন। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এই রূপ অহংকার অত্যন্ত হাস্যকর। ডমরুধর বলেন, "সাধে কি এলোকেশীর মনে সর্বদা আমার প্রতি সন্দেহ।......আমার কিরূপ একটা শ্রী-ছাঁদ আছে, কিরূপ একটা লাবণ্য আছে যে, তাতে রাহুরও ভুল হয়। আর মাগীগুলোও আমার গায়ে যেন ঢলিয়া পড়ে। অবাক হইয়া ধাঙ্গড় মাগী আমার টাক পানে চায়, আর মুচকে মুচকে হাসে" —এই উক্তিতে স্পষ্টই ব্যঙ্গ আছে। ডমরুধরের যে কিরূপ শ্রী-ছাঁদ ছিল তা যথার্থভাবে ধাঙ্গড়ের কথায় ধরা পড়েছে, ধাঙ্গড় বলেছে, "ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের ঐ রকম টাক হয়। ভদ্রলোকের ঐ রকম কিম্ভূতকিমাকার চেহারা হয়! আর মাঝিনীর পছন্দ, আমাকে পসন্দ হয় না, তোকে পসন্দ।" এর পরে ডমরুধর ক্রমাগত দুইটি করে কিল খেয়েছে। এ সময় তিনি বলেন, "দারুণ প্রহার বরং সহ্য হয়, কিন্তু সে যে আমাকে কুৎসিত বলিল, সে কথা আমার প্রাণে সহ্য হইল না।" স্বদেশী কোম্পানীতে বেশ দু'পয়সা করে যখন ডমরুধরের মনের সুখ বাড়লো, তখন দেহের কান্তিও বাড়লো। ডমরুধর ভাবলেন, "যখন কন্দর্প পুরুষের ন্যায় আমার নাদুস-নুদুস নধর শরীর হইল, তখন আমি মনে করিলাম যে, চুপি চুপি দুর্লভীকে দেখাইয়া আসি,—যেন এলোকেশী জানিতে না পারে।" এই সব স্থানেই একই ধরনের ব্যঙ্গ দেখা যায়।

আমাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই দ্বৈতসত্তার আবির্ভাব ঘটে। আমাদের বাইরের কার্যকলাপ, ঘটনা-বৈচিত্র্যে একটি সত্তার প্রকাশ থাকে, আর একটি সত্তা সকলের দৃষ্টির বাইরে, এমন কি আমাদের নিজেদেরও অজ্ঞাতসারে আমাদের মধ্যে প্রকটতর হয়ে ওঠে। "ঘরে গোতম বাইরে গোতম" অংশে এই দ্বৈত সত্তার পরিচয় আছে। ডমরুধরের দুইটি দেহ দুইটি সত্তার প্রকাশ। ডমরুধর তাঁর তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীকে কিছুটা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁর নিজের স্বভাব দিয়ে তাঁকে বিচার করেন। একদিন ডমরুধর তাঁর দ্বিতীয় সত্তার আবির্ভাবে ব্যস্ত হয়ে, নিদ্রিত গৃহিণীকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে যখন তিনি নীচে গিয়েছিলেন, তখন ঘরে কেউ এসেছিল কি না। এলোকেশীর স্বভাবটা কিছু উগ্র, তিনি তাই বোধ হয় বললেন, "মুখপোড়া, বুড়ো ডেক্‌রা। এখনই ঝাঁটাপেটা করিব।" কিন্তু ডমরুধর এইখানেই

সন্দেহ-জ্বালা শেষ হয় না। এই উপদ্রব থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে তিনি সুন্দরবনের আবাদে গিয়ে বাস করতে থাকেন। কিন্তু তবু মনের দ্বিধা যায় না। দূর হতে যেন, দেখতে পান আর একটা "আমি" বাসার ভিতর গট হয়ে বসে আছে। আবার বাইরে একটা আমি, ভিতরে একটা আমি। আবার "ঘরে গৌতম বাইরে গৌতম।" অনন্যোপায় হয়ে ডমরুধর বাড়ী চলে এলেন। এবং তাঁর এই দ্বৈত-সত্তা এক অসম্ভব হাস্যকর উপায়ে এক হয়ে গেল। এলোকেশীর হস্তের প্রহারই তাঁর মনের সব সন্দেহ, দ্বিধা ঘুচিয়ে দিল। এবার ডমরুধর যখন গলায় কাপড় দিয়ে হাত জোড় করে এলোকেশীর পায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করেন "মা, তুমি কে বল?" তখন আমরা এই অসঙ্গতিময় আচরণে প্রচুর হাস্যরস পাই অন্যদিকে লেখক ডমরুধর শ্রেণীর দুর্বল, দ্বিধান্বিত, পুরুষকে ব্যঙ্গ করেছেন।

ডমরুধরের এই দ্বৈত সত্তা এক হয়ে গেলে কি হবে, তাঁর মনের খণ্ডিতরূপটি কখনই সম্পূর্ণ এক হয়ে যায়নি। তৃতীয় পক্ষের বিবাহও তাঁকে একনিষ্ঠ করতে পারেনি। মানব মনের বহুচারী রূপটিও যথেষ্ট হাস্যকরতার সঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ডমরুধর তাঁর এই স্বভাবের জন্যে যে কত সময়ে কত লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন তার যেন অন্ত নেই, তবু ফুরায় না তাঁর বাসনা, কামনার দংশন। ধাঙড়ের হাতে মার খেয়ে ক্লান্ত হয়ে তিনি পুষ্করিণীর ঘাটে শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। ক্লান্তিতে কখন যে রাত শেষ হয়ে গেছে টের পাননি। সকালবেলা গ্রামের বধূগণ ঘাটে জল নিতে এলেন। উলঙ্গ ডমরুধরকে দেখে "ভূত! ভূত!" বলে চিৎকার করে পালিয়ে যান। ডমরুধর তবু লজ্জা পায় না। তিনি যে কত বড় কদাকার, মেয়েদের এই ভূত-ভয়ে ভীত হওয়ার মধ্যে তা' লুক্কায়িত। লাঞ্ছনার তাঁর শেষ নাই। এর পরে ঘাগরা চুরিও পরিধান, নিজেকে সুন্দর বলে কল্পনা করে দুর্লভী বাগ্‌দিনীর ঘরে আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি পর্ব এত অসঙ্গতিপূর্ণ যে আমরা প্রচুর হাসি। এর পরও কেষ্টা ও তার পিতার হাতে পড়ে ডমরুর যে দুর্দশা তাও যথেষ্ট কৌতুককর। ডমরুধরকে দুর্লভীর ঘরে আটকে রেখে লেখক তাঁর সেই গোপন লালসাকে এমনভাবে সকলের সামনে ধরে দিয়েছেন যে ডমরুধর এক অসহায় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। এখানে সাধারণ মানুষের হুজুগপ্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করা আছে। সাধারণ লোক কোন কিছুর সত্যতা বা গুরুত্ব না ভেবেই হুজুগে মেতে সব কিছু করতে পারে। এই যেমন, ডমরুধর ও দুর্লভী যখন দুর্লভীর ঘরের মধ্যে আটকা

পড়লেন, তখন কেষ্ট এই মজা সকলকে দেখাবার জন্তে যে উপায় অবলম্বন করে ও গ্রামের লোকে তা' দেখবার জন্তে যে ভাবে ভীড় করে তা' বিশেষ-ভাবেই চোখে পড়ে। মনে হয়, লেখকও এ দৃশ্য একবার আমাদের না দেখিয়ে পারেন না।

"কেষ্টা ছোঁড়ার একবার বদমায়েসি শোন। কোথা হইতে একটা টুল চাহিয়া আনিল। লোককে সেই টুলের উপর দাঁড় করাইয়া ঘরের ভিতর আমাকে ও দুর্লভীকে দেখাইতে লাগিল।

পুঁটিরাম চাকী বলিলেন,—"অমনি দেখায় নি। এক পয়সা করিয়া টুলের ভাড়া লইয়াছিল। দেখিতে আমার একটু বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া আমার নিকট হইতে সে চারি পয়সা লইয়াছিল।"

আধকড়ি ঢাক বলিলেন,—"চারি পয়সা! আমাকে সাত পয়সা দিতে হইয়াছিল।"

ডমরুধর মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"কি দেখিবার জন্য পয়সা খরচ করিয়াছিলে? আমাকে কি তোমরা কখনও দেখ নাই?"—লেখকেরও এই একই জিজ্ঞাসা।

এখানেই ডমরুধরের লাঞ্ছনার শেষ নয়। কেষ্টার সংবাদে এলোকেশী মুড়ো খেঙরা নিয়ে এলেন, ডমরুর ভূত ঝাড়ানোর জন্তে। এলোকেশীর পরে দুর্লভীও মারতে লাগলো, আর বলতে লাগলো, "তুই যেমন ঠাকুর, তোর তেমনি ঘর করিয়াছেন। আমার মন ভুলাইতে রাঙা ঘাগরা পরিয়া সাজ-গোজ করিয়া আসা হইয়াছে, এখন আমি একবার ঝাড়াই।" এই ঘোরতর প্রহার সহ্য করবার পরে ডমরুধর গৃহে ফিরে আসবার পথে যখন গাছে ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন তখন তন্দ্রার ফাঁকে ডমরুধর স্বপ্ন দেখছেন, "এলোকেশী বুঝি স্পর্পনখার বেশ ধরিয়া আমার নাক কাটিতে আসিতেছেন। অথবা তাড়কা রাক্ষসী হইয়া আমাকে চর্বণ করিতেছেন।" এ দৃশ্যও হাস্যকর। দাম্পত্য-জীবনে পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের ভয়ে ভীত হওয়ার গোপনতাকে যেন ডমরুর স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

কিন্তু এ ভয় স্থায়িত্ব লাভ, করে না। তাই তো ডমরুধরের আবার একবার সাধ জাগে দুর্লভীর সঙ্গে আলাপ করবার। এবং গোপনে তিনি যানও। কিন্তু মানুষের মন এমন যে, সে এক ভাবে, আর এক হয়। মানুষের দুর্জয় লোভও কখনও কখনও মানুষকে এইভাবে ভুল পথে নিয়ে যায়। অন্তত

ডমরুর মত দুর্বল চিত্তের লোকেদের এরূপ হয়ে থাকে। কেননা এদের মন তো কোন দৃঢ়স্থানে বাঁধা নেই। তাই এলোকেশী থেকে দুর্লভী, দুর্লভী থেকে চঞ্চলা, চঞ্চলার পরেও শাহারজাদি ও দিনারজাদির দিকে ক্রমেই ডমরুধরের মন ভেসে চলে। কিন্তু যেখানেই যাক না কেন স্ত্রীর তাড়নায় এদের সব স্থানেই শেষে ঘরে ফিরে আসতে হয়। দাম্পত্যের এ এক হাস্যকর রূপ ডমরু-চরিত্রের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে। স্ত্রী এলোকেশীকে ডমরু ভয় করেন, কিন্তু তবু নিজের বিকৃত স্বভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না। অধিকাংশ মানবমনের এই অসঙ্গতিময় আকর্ষণকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে লেখক ডমরুধরকে অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক গরু করেছেন। ডমরুধর চঞ্চলার প্রতি আসক্ত। এদিকে এলোকেশীর ভয়। তাই স্বপ্নে তাঁর অভিসার যাত্রা। তাও আবার শুধু হাতে নয়। সেই লুকানো নয়হাতি কাপড়খানি হাতে নিয়ে চলতে চলতে চঞ্চলাদের গ্রামে উপস্থিতি ও তার বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ—এমনি সময়ে হঠাৎ মোটর গাড়ীর চাকায় ডমরুর দেহের দ্বিখণ্ডীকরণ, ও ভিখু ডাক্তারের আগমন ও চঞ্চলার গাই-গরুর কর্তিত দেহের সঙ্গে ডমরুধরের খণ্ডিত দেহের সংযোগ সাধন ইত্যাদির মধ্যে স্বপ্নজগতের অদ্ভুত অলৌকিক কল্পনা যতই থাক, ডমরুর অবচেতন মনের লালসা, ভয়, ভাবনা, যাতনা, আসক্তি, শাস্তি—সবই অতি সার্থকভাবে রূপক-আশ্রিত হয়ে ব্যক্ত হয়েছে। এই অভিব্যক্তি ব্যঙ্গাত্মক। মোটকথা, ডমরুধরের সর্বপ্রকার নির্বুদ্ধিতাই এত স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে তাঁর স্বভাবের কোন অলি-গলিও আমাদের আর অপরিচিত থাকে না।

ডমরুধরের চরিত্র চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে লেখক কখনও কখনও তাঁকে এমন সব ঘটনায়, পরিবেশের সামনে উপস্থাপন করেছেন সেগুলিতে লেখকের কল্পনাশক্তির যথেষ্ট স্ফূরণ ঘটেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই কল্পনাময় জগতের মধ্যে নিয়ে গিয়ে নানা অসঙ্গতিকে বুঝে নেওয়ার আমাদের প্রচুর অবসরও দিয়েছেন। যেমন ডমরুধরের যমপুরীতে প্রবেশের দৃশ্যটি। যমপুরীর সমস্ত কার্যকলাপ, বিচার পদ্ধতি, কথাবার্তা আমাদেরই ভ্রান্তধর্মবোধ, শাস্ত্রীয় চেতনাকে ব্যঙ্গ করেছে। "চিত্রগুপ্তের গলায় দড়ি—মোটা দড়ি নয়" এই অংশ হইতে এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। ডমরুধরের সূক্ষ্ম শরীর দেহ হতে বের হয়ে যখন শূন্য পথে বিচরণ করছে এমন সময় দুই বেটা যমদূতের সঙ্গে দেখা। ডমরুধরের ভয় হল। কিন্তু যমদূতরা তাঁকে থপ করে ধরে ফেলেই, জিজ্ঞাসা করল,—

—"তুই বেটা কে রে? সত্যযুগের রাজা হরিশ্চন্দ্র ভিন্ন বেওয়ারিশ হইয়া আর কাহারও এখানে বেড়াইবার হুকুম নাই। নিশ্চয় তুই বেটা কুম্ভীপাক অথবা রৌরব নরকের ফেরারী আসামী।" এই বলে তাকে বেঁধে ফেললো এবং মারতে মারতে নিয়ে চলল। এ চিত্রে যমরাজ্যের নিয়ম-কানুন ও কার্যকলাপে মর্ত্যের মানুষের ভুল ভ্রান্তিকে আরোপ করে ব্যাপারটিতে অসঙ্গতি স্থাপন করে হাস্যকর করে তোলা হয়েছে।

যমরাজ্যের পাপ-পুণ্য বিচার পদ্ধতিও যথেষ্ট ব্যঙ্গাত্মক। এখানে মানুষের কর্ম দিয়ে মানুষকে বিচার করা হয় না।

যম বলছেন,—"চিত্রগুপ্ত! তোমাকে আমি বার বার বলিয়াছি যে, পৃথিবীতে গিয়া মানুষ কি কাজ করিয়াছে, তাহার আমি বিচার করি না। মানুষ কি খাইয়াছে, কি না খাইয়াছে, তাহার আমি বিচার করি। ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা করিলে এখন মানুষের পাপ হয় না, অশাস্ত্রীয় খাদ্য খাইলে মানুষের পাপ হয়। তবে শিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্র মতে সংশোধন করিয়া খাইলে দোষ হয় না।"—এসব স্থানে স্পষ্টতই যে দেশীয় আচার অনুষ্ঠানের অসারত্বকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে তা' বলাই বাহুল্য।

এ ধরনের হাস্যকর আরও উক্তি আছে।

"যম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিলাতি পানি? যাহা খুলিতে ফট্ করিয়া শব্দ হয়? যাহার জল বিজবিজ করে?"

সে উত্তর করিল,—"আজ্ঞা না।"

যম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য করিয়া বল, কোনরূপ অশাস্ত্রীয় খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলে কি না?"

সে ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল,—"আজ্ঞা একবার ভ্রমক্রমে একাদশীর দিন পুঁইশাক খাইয়া ফেলিয়াছিলাম।"

যমের সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"সর্বনাশ। করিয়াছ কি! একাদশীর দিন পুঁইশাক! একাদশীর দিন পুঁইশাক! ওরে এই মুহূর্তে ইহাকে রৌরব নরকে নিক্ষেপ কর।"

যমপুরীতে এইরূপ বিচার প্রহসন দেখে ধূর্ত ডমরুধর পূর্ব হইতেই চিৎকার করে বলেন,—"মহারাজ! আমি কখন একাদশীর দিন পুঁইশাক ভক্ষণ করি নাই।" তাঁর এই রূপ পুণ্য আচরণে যমরাজ প্রীতি হয়ে তাঁকে বরণ করে

নিলেন এবং একটি নূতন স্বর্গরাজ্য নির্মাণ করে সেখানে তাঁকে নিয়ে যেতে বললেন। যমরাজের আদেশটি লক্ষ্য করবার মত,—

"হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তিনি বলিলেন, "সাধু সাধু! এই লোকটি একাদশীর দিন পুঁইশাক খায় নাই। সাধু সাধু! এই লোকটি একাদশীর দিন পুঁইশাক খায় নাই। সাধু সাধু! এই মহাত্মার শুভাগমনে আমার যমালয় পবিত্র হইল। যমনীকে শীঘ্র শঙ্খ বাজাইতে বল। যমকন্যাদিগকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে বল। বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া আন,—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোক পারে ধ্রুবলোকের উপরে এই মহাত্মার জন্য মন্দাকিনী কলকলিত, পারিজাত-পরিশোভিত, কোকিল কুহরিত, অপ্সরাপদ নূপুর-ঝুনঝুনিত, হীরা-মাণিক্য-খচিত নূতন একটি স্বর্গ নির্মাণ করিতে বল।" যমরাজের এই আদেশে যে যথেষ্ট হাস্যরস ও ব্যঙ্গ আছে তা' বলাই বাহুল্য।

আমাদের ইংরাজী শিক্ষার বিকৃত পরিণতিকে অতি হাস্যকরতার সঙ্গে নিয়ে দেখানো হয়েছে—

"দেখ চিত্রগুপ্ত! তুমি এ কেরাণীগিরি ছাড়িয়া দাও। পৃথিবীতে তোমার বংশধর কায়স্থগণ কি করিতেছে, একবার চাহিয়া দেখ। উড়ে গয়লার মত এক এক গাছা সূতা অনেকে গলায় পরিতেছে। ব্রাহ্মণকে তাহারা আর প্রণাম করে না। ইংরাজী পড়িয়া তাহাদের মেজাজ আগুন হইয়া গিয়াছে। তাই বলি যে, চিত্রগুপ্ত! তুমিও ইংরাজী পড়। ইংরাজী পড়িয়া তোমার হেডটি গরম কর। হেডটি গরম করিয়া তুমিও গলায় দড়ি দাও। মোটা দড়ি নয়। বুঝিয়াছ তো? গলায় দড়ি দিয়া 'চিত্রবর্মা' নাম গ্রহণ কর।"

বাঙালীর হুজুগপ্রিয়তা, ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস, খবরের কাগজের সেই হুজুগ ও বিশ্বাসকে প্রকাশ করার ধারাকে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন "গাছে ঝোলা সাধু" অংশতে। বাঙালীর বুদ্ধিহীন, যুক্তিহীন ভক্তি হাস্যকর। এই দুর্বলতাকে আশ্রয় করে কত সময় যে কত সাধু,সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয় তা' আমরা ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের নানাস্থানে পাই। এরা ধর্মকে, ভক্তিকে পয়সা উপায়ের একটি মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে। বাঙালী আমরা, একটুতেই কাতর হয়ে পড়ি, বড় দুর্বল, বড় ভয়ার্ত, তাই যেন একটুতে ভক্তি বিহ্বল হয়ে পড়ি। ভাবি সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট থেকে অতি সহজে মুক্তির উপায় ঐ সাধু-সন্ন্যাসীর দল দেখিয়ে দেবেন। অহেতুক ভক্তিতে ভরপুর বাঙালীকে ভণ্ড সাধুর দল নানা অলৌকিকতা দেখিয়ে ভুলিয়ে দেয়, কারও সমুদয় অর্থ ও সম্পত্তি দ্বিগুণ করে দেওয়ার

প্রলোভন দেখান, কারও বা রোগগ্রস্ত চক্ষু, কর্ণ, পা নূতন করে জীবন পাবে এই আশ্বাস দেন, কোথাও বা ভক্তের দল কিছু চাইতেই ভুলে যায়, শুধু সেই সাধুর পা টেপে, বাতাস করে, আর পাদোদক খায়। আবার এমনও দু'এক জন আছেন যাঁরা এই সব সাধু ও তার দলের চতুরতাকে ধরে ফেলেন এবং তাদের লাভের অংশে ভাগ বসান। ডমরুধর এই দলের। তিনি তাই বলেন,—

"ঠাকুর! সন্ন্যাসী মোহান্তের প্রতি আমার যে ভক্তি নাই, তাহা নহে। তবে কি জান, আমি বিষয়ী লোক। তুমি আমার জমিতে আস্তানা গাড়িয়াছ। দু' পয়সা বিলক্ষণ তোমার আমদানী হইতেছে। ভূস্বামীকে ট্যাক্স্ দিতে হইবে।" সাধু দেখলেন ডমরুধরকে রাগালে চলবে না। তিনি তাঁর আয়ের অংশ থেকে কিছু তাঁকে দিতে স্বীকৃত হলেন। অমনি সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার ভক্তি দিনে দিনে প্রগাঢ় হতে লাগলো। এবং সন্ন্যাসীর আয় যাতে বাড়ে সেজন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ডমরুধরের নিজের কথায় তার মনোভাবটির ব্যঙ্গ অতি সহজতর হয়।

"কোনদিন চারি টাকা কোনদিন পাঁচ টাকা আমার লাভ হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীর প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি হইল। যাহাতে তাহার পসার প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি হয়, দেশের যত উজবুক যাহাতে তাহার গোঁড়া হয়, সে জন্য আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম যে, দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় সন্ন্যাসীটিকে আমি পুষিয়া রাখিব।"

কিন্তু ডমরুধর তাকে পুষে রাখবার ইচ্ছা করলে কি হবে, সে গ্রামে রসিক মণ্ডলের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার কণ্ঠে মাকাল ঠাকুর অধিষ্ঠিত হলেন। সে মাকাল ঠাকুরের ভার সে কন্যা সকলকে ওষুধ দিতে থাকেন। অমনি দেবদত্ত ওষুধের গুণে অন্ধের চক্ষু, বধিরের কর্ণ, পঙ্গুর পা হতে লাগলো। এ সংবাদ পেয়ে বাঙালী ভক্তের দল আকুল বিশ্বাস নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল, এমন কি তুলসীর মালা গলায় দিয়ে সে ইংরাজী কাগজের লেখকও সেইস্থানে গিয়ে উপস্থিত হল। "ভক্তিতে গদগদ হইয়া কত কি তাহাদের কাগজে লিখিয়া বসিল।"

আর একটি চিত্র উদ্ধৃত করতে পারি। এখানে ভণ্ড সাধুর প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ করা আছে।

"চারিদিকে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। যাহারা বি-এ, এম-এ পাস করিয়াছে,

সেই ছোঁড়ারা আসিয়া সাধুর কেহ পা টিপিতে লাগিল, কেহ বাতাস করিতে লাগিল, সকলেই পাদোদক খাইতে লাগিল। একখানি হুজুগে ইংরেজী কাগজের লোক আসিয়া সাধুকে দর্শন করিল ও তাহাদের কাগজে সাধুর মহিমা গান করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল। ফল কথা, দেশের লোকের ভক্তি একেবারে উথলিয়া পড়িল।"

বাঙালীর বুদ্ধিহীনতা ও হুজুগপ্রিয়তার আর একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই ডমরুধরের দেবীর কাছে বর প্রার্থনার মধ্যে। ডমরুধর অনেক ভেবে-চিন্তে বর প্রার্থনা করলেন,—

"মা! সুন্দরবনে আমার আবাদে মৃগনাভি হরিণের চাষ করিবার নিমিত্ত স্বদেশী কোম্পানী খুলিব মনে করিতেছি। ভেড়ার পালের ন্যায় বাঙলার লোক যেন টাকা প্রদান করে।......

দেবী বলিলেন,—"কৈলাস পর্বতের নিকট তুষারাবৃত হিমাচলে কস্তরী হরিণ বাস করে। সুন্দরবনে সে হরিণ জীবিত থাকিবে কেন?"

আমি বলিলাম,—যে কাজ সম্ভব, যে কাজে লাভ হইতে পারে, সে কাজে বাঙালী বড় হস্তক্ষেপ করে না। উদ্ভট বিষয়েই বাঙালী টাকা প্রদান করে।

ব্যর্থ সমালোচনাকে কটাক্ষ করতেও লেখক ছাড়েননি। দু'একটি লাইনে সেই ব্যঙ্গ এত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে যে, সেই দু'একটিকে অনেক গুণ বর্ধিত করলেও অনেকের কাছে হয়তো তা' ঠিক তেমনিটি হয় না।

"আধকড়ি ঢাক বলিলেন,—"চমৎকার গল্প"।

লম্বোদর বলিলেন,—"অতি চমৎকার। বন্ধুদিগের পুস্তক সমালোচনা করিবার সময় কোন কোন লেখক যেরূপ প্রেমে মজিয়া রসে ভিজিয়া ভাবে গেঁজিয়া বলেন,—মরি মরি! আহা মরি! এও সেই আহা মরি!"

অন্যত্র ভিকু ডাক্তারের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক আমাদের দেশের হাতুড়ে ডাক্তারকে হাস্যকরভাবে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। ভিকু ডাক্তারের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে লেখক খুব অল্প কথায় যা বলেছেন তাতে যথেষ্ট কটাক্ষ আছে। "ভিকু কলিকাতায় কোন ডাক্তারখানায় ছয় মাস কম্পাউণ্ডারি করিয়াছিলেন। একবার কোন রোগীকে কৃমির ঔষধের পরিবর্তে কুচিলা বিষ প্রদান করিয়াছিলেন। রোগীর তাহাতে মৃত্যু হইয়াছিল। সেই জন্য ভিকুর ছয় মাস কারাবাস হইয়াছিল। এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ভিকু এখন স্বগ্রামে আসিয়া ডাক্তার হইয়াছেন।" লেখক ভিকুর ডাক্তারি

অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা অতি সংযত, সীমাবদ্ধ। তবু এইটুকুর মধ্যে দিয়ে ব্যঙ্গচ্ছলে ভিকু ডাক্তারকে একেবারে আনাড়ী বলেই বলা হয়েছে। তারপর এই ডাক্তারের মুখে যখন তাঁর চিকিৎসক জীবনের অপূর্ব ও অদ্ভুত সব কাহিনী শুনি তখন আমাদের বুঝতে আর বাকী থাকে না যে তাঁর সমুদয় কাহিনীই মিথ্যাশ্রয়ী। যদিও লেখকের উদ্ভট কল্পনার এতে প্রকাশ আছে, তবুও বুঝি একশ্রেণীর লোক আছে যারা তাদের দুর্বলতাকে কথার পাকে লুকিয়ে রাখে তাদের প্রতি ব্যঙ্গ আছে। লেখক এই ধরনের হাতুড়ে জাতীয় লোকদের মনে রেখেই ভিকু ডাক্তার প্রসঙ্গে বলেছেন—"সচরাচর হোমিও-প্যাথিক ডাক্তারদের বিশেষতঃ হাতুড়েদের যেরূপ হয়, ভিকুর মুখ দিয়াও সেইরূপ চড়বড় করিয়া কথায় যেন খৈ ফুটিতে থাকে।" চরিত্র-চিত্রণের এই প্রয়াস সার্থক। ভিকু ডাক্তার হাস্যকর হলেও দুর্লভী, চঞ্চলা বা গ্রামের অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁর ছলাকলাকে বুঝে না, ভাবে, "ইহার তুল্য বিচক্ষণ ডাক্তার জগতে নাই।" সুতরাং হাতুড়ে ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রাম্য সাধারণও ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে হাস্যকর হয়ে পড়ে।

দাম্পত্যের একটি সুন্দর হাস্যরসাত্মক চিত্র আমরা "ডমরুধরের বুকে প্যাঁচ" এই অংশে পাই। ডমরু তো গৃহিণীকে সর্বদাই ভীত নয়নে দেখেন। কিন্তু এলোকেশী যতই মারাত্মক মহিলা হোন না কেন, স্বামীকে যতবারই, প্রহার করুন না কেন, তিনি ডমরুর একেবারে কোন সর্বনাশ করতে পারেন না। ডমরুর পরে তাঁর প্রাণের টানও আছে। তাই নকুল ও রাঘব ভট্টাচার্য মহাশয় যখন ডমরুর রোগশয্যায় বসে তাঁর মৃত্যু কামনা করতে থাকে, এলোকেশী তখন যেমন করে খেঙরা হস্তে উগ্রচণ্ডার ন্যায় রণমূর্তিতে এসে সপ্ করে এক ঘা নকুলের পিঠে এবং অপর ঘা রাঘবের মাথায় ধসিয়ে দেয় তাতে আমরা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে যাই। নারী চরিত্রের রহস্যময়তা প্রচুর হাস্যের সঙ্গে লেখক এ দৃশ্যে দেখিয়েছেন। ডমরুধর পর্যন্ত তাঁর ভয়জড়িত কণ্ঠকে কিছুটা হাল্কা করে নিয়ে, ঈষৎ হাস্য সহকারে বলেন,—"এলোকেশি! তুমি এখন যাহা করিলে, তাহাতে আমার অর্ধেক রোগ ভাল হইয়া গেল। আর আমাকে কোনরূপ ঔষধ খাইতে হইবে না।" এলোকেশী এই কথায় চুপ করে রইলেন না। ডাক্তার ডাকতে পাঠালেন। ডাক্তার এসে ভাল করে পরীক্ষা করে তাঁর বুকের দু'চার জায়গায় প্যাঁচ আছে জানালেন। এই সময় ডমরুধরের যে উক্তি তা একসঙ্গে হাস্যরসের ও ব্যঙ্গের। এ ব্যঙ্গ কিছুটা

ডাক্তারের উদ্দেশ্যেও কিছুটা এলোকেশীর উদ্দেশ্যে বর্ষিত। ডমরুধর বলিলেন, "এইরূপ তিন চারিটা প্যাঁচের কথা তিনি বলিলেন। প্যাঁচ আছে শুনিয়া আমার মনে ভরসা হইল। আমি ভাবিলাম যে, আমার বুকে যখন এতগুলি প্যাঁচ আছে, তখন আমি মরিব না, বহুকাল আমি বাঁচিব।"

তৎকালীন হিন্দুদের আচারনিষ্ঠা, শাস্ত্রের নামে অধর্ম আচরণ পালন ইত্যাদিকে লেখক সপ্তম গল্পের মধ্যে এঁকেছেন। ঢাক মহাশয়ের নয় বৎসর বয়স্ক বিধবা বালিকা কন্যার প্রতি লেখকের করুণ সহানুভূতিতে এই কাহিনী অংশ পরিপূর্ণ। কিন্তু তৎকালীন সমাজে কোন সহানুভূতিকে সমাজ-প্রতিকূলে বলা যেত না। তাই বালিকা কন্যা গ্রীষ্মের একাদশীতে যখন ঘোর জ্বরে ও যাতনায় ছট্‌ফট্ করতে করতে জল জল করতে লাগলো তখন পিতা ডমরুধরকে ডেকে পাঠালেন। ডমরুধর এসে যা বল্লেন তা' তাঁর মনের কথা নয়, তবু ঢাক মহাশয়কে সন্তুষ্ট করবার জন্যে বলতে হয়,—

"বাপরে! জল কি' দিতে পারা যায়? ব্রাহ্মণের ঘরে বিধবা। একাদশীর দিন জল খাইতে দিলে তাহার ধর্মটি একেবারে লোপ হইয়া যাইবে।" ঢাক মহাশয়ও এই নির্দেশ মেনে নিলেন। কন্যাটি জ্বরে ও যাতনায় জ্ঞান হারালে কি হবে এই ঘটনার কথা যখন চারিদিকে প্রচারিত হল তখন ঢাক মহাশয়ের ধন্য ধন্য পড়ে গেল, এক মাসের মধ্যে তাঁর এক শতের অধিক নূতন শিষ্য হল। কন্যার মৃত্যু ঢাক মহাশয়কে আনন্দিত করল। কেননা তাঁর মত বিধবা কন্যার বেশীদিন বেঁচে থাকা অপেক্ষা মরাই ভাল। তাই মৃত্যুকে নিকটতর করবার জন্যেই হয়তো সেই সমাজে বিধবাদের এত শাস্তি, এত দুঃখ। সমাজের যারা প্রধান তারা ধর্মের নামে মানবিকতার যে রূপকে সমাজে তুলে ধরেছিলেন তা যেমন করুণ তেমনি মর্মান্তিক। এই সমাজ-বিধান বিধায়কের নিষ্ঠুরতা লেখককে ব্যথাতুর করে তোলে। তাই তো কুন্তলাদের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ টান তাঁকে ব্যঙ্গ করতে প্রণোদিত করে, তিনি ঢাক মশায়কে ব্যঙ্গ না করে পারেন না।

শুধু বিধবা কন্যার প্রতিই অত্যাচার নয়, সধবা কন্যারাও তাঁর হাতে নির্যাতিত হয়। তৎকালীন সমাজে সমুদ্র পারে যাওয়া অত্যন্ত অন্যায়, অধর্মের ছিল। ঢাক মহাশয়ের জামাতা বোগদাদ গিয়েছিলেন, ফিরে এসে তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে নিতে চাইলেন। "সে সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে গমন করিয়াছে। তাহার জাতি গিয়াছে।" এরূপ অবস্থায় তিনি কিছুতেই

জামাতার নিকট কন্যাকে পাঠাতে পারেন না। "সাগর অতি ভয়ানক বস্তু। সেই সাগর পারে কেউ যাইলে হিন্দুধর্মের গন্ধটি পর্যন্ত তাহার গায়ে থাকে না।"

ঢাক মশাইরা প্রকৃত শক্তিশালী ব্যক্তির সামনে পড়লে কেমন যেন অসহায়, ভীত, হয়ে পড়েন। জিনের আবির্ভাবে এক ডমরুধর ছাড়া সকলেই ভয় পেলেন। জিনের ভয়ঙ্কর রূপের সামনে, ঢাক মশায়ের সকল শক্তি কোথায় হারিয়ে যায়। তাই লেখক তাঁকে এক চক্ষুহীন, দামড়া গরুতে রূপান্তরিত করে দেন, যেন তাঁর সমুদয় পাপ কর্মের শাস্তিকে তিনি এইভাবে দেখাতে চান। প্রতিপত্তি ও সুখকে হারিয়ে গোয়ালে যেতে যেতে ঢাক মশায়ের দুই চক্ষু দিয়ে দর দর ধারায় অশ্রুপাত হয়। এ দৃশ্যে আমাদের করুণাই হওয়া উচিৎ, কিন্তু তা হয় না, বরং কৌতুক অনুভব হয়। দামড়া গরুর গায়ে শক্তি আছে, কিন্তু তার নিজস্ব কোন ইচ্ছার প্রকাশ নেই। তাকে যেমন চালাবো, তেমনি চলবে, পরের ভারই বয়ে বেড়াবে। মানুষ থেকে এই দামড়া গরুতে পরিণতি অত্যন্ত হাস্যকর। লেখকের সেই সমাজের প্রতি গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষ, ন্যায় ও ধর্ম ও মনুষ্যত্বের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠাই যেন ঢাক মহাশয়কে দামড়া গরুতে পরিণত করে, রূপকের আশ্রয়ে ব্যঙ্গ করেছে।

"ডমরু-চরিতে" ডমরুধর চরিত্রের ফাঁকে ফাঁকে লেখক তৎকালীন সমাজের নানা দিককে, নানা অসঙ্গতিকে ছোট ছোট চিত্রের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করেছেন। এ ধরনের ব্যঙ্গগুলি স্বভাবতই তৎকালীন সমাজের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচিবোধ, ধর্মচেতনা, শাস্ত্র চেতনা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ছোট্ট কয়েকটি লাইনে ব্যঙ্গ হয়তো ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ সমাজের একটি বিরাট পরিবর্তনের দিকে। যেমন এই ডমরুধর তাঁর দুর্গাপূজা উপলক্ষে বলেছেন, "এই যে দুর্গোৎসবটি, এটি তোমরা সামান্য জ্ঞান করিও না। কিন্তু এখনকার বাবুদের সে বোধ নাই। বাবুরা এখন হাওয়াখোর হইয়াছেন। দেশে হাওয়া নাই, বিদেশে গমন করিয়া বাবুরা হাওয়া সেবন করেন, আর বাপ-পিতামহের পূজার দালান ছুঁচো-চামচীকাতে অপরিষ্কার করে।" এখানে লেখক স্পষ্টতই ইংরাজী-সভ্যতাভিমানী বাঙালীর জীবনে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিবর্তনকে মেনে নিতে না পেরেই এরূপ মন্তব্য করেছেন। গ্রামীন জীবনের দুর্গাপূজার মধ্যে যে আনন্দ ছিল, প্রাণের সাড়া ছিল, তার মূল্যকে আজ আমরা ক্ষুণ্ণ করে', সেই আনন্দ সঞ্চয়ের জন্যে যে পূজায় ছুটীতে দেশবিদেশে

বেরিয়ে পড়তে চাই, এটা লেখকের ভাল লাগে না। একদিন ছিল যেদিন বাঙালী পূজার ছুটিতে দেশে যেত, সমস্ত আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিলিত হত, পূজাকে উপলক্ষ্য করে একটা বিরাট সাড়া পড়ে যেত। সেদিনের সেই আনন্দ আজ আর নেই। এই পরিবর্তনকেই লেখক মৃদু কটাক্ষ করতে চেয়েছেন, যেন তাঁর এই রুচি বদলের পালাকে মেনে নিতে পারছেন না। প্রাচীন ঐতিহ্যচ্যুত নব্য বাঙালী তাই তাঁর আক্রমণের পাত্র হয়ে পড়েছে। এইভাবে তৎকালীন বাঙালী জীবনের নানা পরিবর্তন, ভুল, দুর্বলতাকে তিনি ডমরুধরের চরিত্র-চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্ত করেছেন। এগুলি ছোট ছোট হলেও কম গুরুত্বের নয়।

তবু এইগুলিই তাঁর আক্রমণের প্রধানতম বস্তু নয়। ডমরুধরকে আঁকাই তাঁর যেন একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর সে অঙ্কন সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। ডমরুধরের মধ্যে দিয়ে একাধারে জন-মানস ও লেখকের শিল্পী-মানস দুই-ই প্রতিফলিত হয়েছে। তাই কখনও ডমরুর মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ অসঙ্গতিময় দুর্বলতাকে দেখানো হয়েছে, কখনও বা তাঁর স্বভাবের সত্যতা আমাদের স্বভাবের মিথ্যাকে ব্যঙ্গ করেছে. আবার কোথাও বা ডমরুধরকে লেখকের সঙ্গে একাত্ম করে আমাদের দোষগুলিকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে ডমরুধর সেই গ্রাম্য, কদাকার, বৃদ্ধটি হয়েও, লেখকের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করেও, যেমনভাবে অম্লান বদনে একটার পর একটা গল্প বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আমাদের মনের সামনে এসে দাঁড়ান তাতে তাঁকে অতি অসাধারণ শক্তিধর ব্যক্তি বলে চিনতে পারি। তাঁর এই গল্প বলার প্রয়াসকে অনেকাংশে আরব্য কাহিনীর সেই রমণীদের মত বলে মনে হয়। শাহারজাদি দিনারজাদি মূর্খ নবাবকে একটির পর একটি গল্প বলে চাতুর্যের সাহায্যে যেভাবে জীবন বাঁচিয়েছিলো, সেইরূপ ডমরুধরের বিভিন্ন গল্পাধ্যায় পর্বও যেন কতকটা আত্মপক্ষ সমর্থনের একটি উপায়স্বরূপ। ডমরুধর জীবনের কোন অবস্থাতেই নিস্তেজ হয়ে পড়েন না। হিউমারিস্টের স্বভাব-দৃষ্টি নিয়ে তাঁর জন্ম। তাই কোন পাওয়া, বা কোন না-পাওয়া তাঁর কাছে প্রবলতম হয়ে ওঠে না। তাই জীবনের চরমতম ব্যর্থতা, লাঞ্ছনার মুহূর্ত ও তাঁর হাস্য-উজ্জ্বল ছবি আমাদের মুগ্ধ করে। সাহেবের টুপিটি পরে ডমরুধরের যে কি যাতনা তা' তো আমরা জানি, কিন্তু তিনি সে যাতনাকে স্বীকার করতে চান না। বরং বলেন, "সামান্য সাহেবের টুপি

পরিয়াছিলাম, তাহাতে কি কাণ্ড না হইল।" এতে মনে হয় ডমরুধর যেন বুঝাতে চান যে এইটুকুতেই এই, যদি সমগ্র সাহেবী পোষাক পরতাম তাহলে না জানি কি হত। হয়তো গ্রামের সব মেয়েরা তার সামনে এসে ঘিরে ধরতো। সাহেবী পোষাকের প্রতি সামান্য ব্যঙ্গ থাকলেও ডমরুধরের হিউমারিস্ট সত্তার প্রকাশও আছে। আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, যে কুমীরকে ধরে তা' থেকে পাঁচ, ছয় হাজারের মত অর্থ লাভ করবার তাঁর বিপুল বাসনা, তাকে ধরার পর যখন তিনি দেখলেন তাঁর সমুদয় সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তখন তিনি কোনই আক্ষেপ করেন না। তিনি শুধু মনে মনে ভাবেন, "কপালে পুরুষের ভাগ্যও সকল সময় প্রসন্ন হয় না।" এ ধরনের উক্তিতে যথেষ্ট হিউমার আছে। কোন সূক্ষ্ম অনুভূতিকে তিনি হৃদয়ে স্থান দিতে চান না। কেননা, তিনি জীবন দিয়েই জেনেছেন যে সূক্ষ্ম-অনুভূতি নিয়ে সাধারণভাবে, স্বচ্ছন্দে, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির সঙ্গে জীবন কাটানো যায় না। তাই তিনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন, "দুর্লভী ভাল হইল। কিন্তু তাহার পর ডাক্তারকে ঘোড়ার ডিম। রোগ ভাল হইলে অনেকেই ডাক্তার-বৈদ্যকে কলা দেখায়।" অথবা, "পরীক্ষিৎ ঘোষ আমার নিকট হইতে দশ টাকা ধার লইয়াছিল। দেড় শত টাকা সুদ দিয়াছিল। তাহার পর যখন সে আসল পরিশোধ করিল, তখন তাহাকে হাতে রাখিবার নিমিত্ত খতখানি ফিরিয়া দিলাম না। তাহার বিপক্ষে আদালতে একবার মিথ্যা সাক্ষ্যও দিয়াছিলাম। মকদ্দমায় মিথ্যা বলিতে দোষ নাই।" ডমরুধরের জীবনে লজ্জা, অপমান, দুঃখ, ঘৃণা নেই। শক্ত একটা পরদা যেন তাঁর মনের উপর পড়ে গেছে সেই আবরণ ভেদ করে কোন সূক্ষ্মতার প্রবেশ ঘটে না। ডমরুধর নিজের দোষত্রুটীগুলোকে এমনভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে, রেখে-ঢেকে, বিবৃত করেন, তার মধ্যেও অনেক মিথ্যা, সত্য হয়; অনেক দোষ, গুণ হয়। বন্ধুর দলের অল্পবুদ্ধির সুযোগ ডমরুধরকে সম্ভব-অসম্ভবকে এক করে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নিজের জীবনকথাকে নবতর ছাঁচে প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছে। তা' ছাড়া তাঁর বলার ধরনটি এমন যে বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না।

ডমরুধর ত্রৈলোক্যনাথের এক অপূর্ব সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে এইরূপ কোন চরিত্র, তার স্বকীয় ঔজ্জ্বল্যে ও দীপ্তিতে, হাস্যে ও ব্যঙ্গে, ভরপুর হয়ে এর আগে আর আসেনি। ডমরুধর যত comic চরিত্রই হোন, তিনি কিন্তু জীবনের গভীর কথাকেই বলেন—মানুষের স্বভাবের সম্যক সত্যরূপটি তিনি আমাদের

সামনে তুলে ধরেছেন। ডমরুধরের মধ্যে দিয়ে লেখক আমাদের চিরকালীন লোভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, আসক্তি, কামনা, বাসনার সত্য স্বরূপকে উদ্ঘাটন করে দিলেন। ডমরুধর হাস্যকর হয়ে আমাদেরও হাস্যকর করে দিলেন। তবে ডমরুধর শুধুই ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে রইলেন না, তার উর্ধ্বে উঠে গেলেন। তাঁর সহজ সরল রূপের মধ্যে দিয়ে, সত্যভাষণের সাহসের মধ্যে দিয়ে। তাঁকে জগতের মিথ্যা, অসাধুতা, বঞ্চনা, লোভের পংের মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে এনেও অনেক উঁচুতে তুলে দেওয়া হল। আবার ডমরুধর জীবনে অনেক অন্যায় করেছেন তবুও তিনিই বেঁচে রইলেন, সব কিছুই পেলেন। তাঁর জীবনের এই দিকটি যেন আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে যে দুর্নীতির আশ্রয় আছে তা প্রত্যক্ষগোচর করে তোলে। এই দুর্নীতির পথ দিয়ে মানুষ কোথায় যাচ্ছে, তার সর্বশেষ পাওয়ারই বা কতটুকু দাম আছে, অর্থপ্রাপ্তিতে মানুষের অর্থাকাঙ্ক্ষার কতটুকু মেটে, মানুষের অর্থ বা যৌবন ভোগাকাঙ্ক্ষার যে উদগ্র লালসা তা' মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে—ইত্যাদি নানাধরনের গভীরতর প্রশ্ন যেন এই হাস্যমধুর কাহিনীর অন্তরালে থেকে যায়। লেখকের উদ্দেশ্য মানুষকে ভ্রান্তিমুক্ত, মোহমুক্ত করে কতকটা সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ, নির্লোভ, করে তোলা। তাই ডমরু-চরিতে এর আবেদন শুধু বাঙালীর কাছেই নয়, সমস্ত মানুষের কাছেই। এখানে শুধু বাঙালীর বিভিন্ন চারিত্রিক, সামাজিক, ধর্মীয় দুর্বলতাই প্রকাশিত হয়নি, চিরকালীন মানবের দুর্বলতাকেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তাই "ডমরু-চরিতে"র গৌরব শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, পৃথিবীর যে কোন ব্যঙ্গ সাহিত্যের পাশেই এর নিঃসন্দেহে স্থান দেওয়া যায়।

ভূত ও মানুষ

"বাঙ্গাল নিধিরাম" (ভূত ও মানুষ) একটি করুণ কাহিনী। একটি শোকসন্তপ্ত জীবনের করুণ ব্যর্থতা দিয়ে সমগ্র কাহিনী রচিত। তবুও এই কারুণ্যকে বড় করে দেখা বা দেখানো হয়নি বরং মানবজীবনের এক ব্যথাভরা অসঙ্গতিকে তুলে ধরে এ গল্পে ব্যঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছে। ব্যঙ্গ-শিল্পীর মুক্ত জীবনদৃষ্টির কাজই যে হ'ল এই। তিনি সুখ দুঃখকে সমান করে দেখেন, আর এরই মাঝখানে জীবনের যেটুকু অসঙ্গতি আছে তাকেই তুলে ধরে দেখান। সব সময়েই যে এই অসঙ্গতিগুলোকে ঝেড়েমুছে ফেলতে চান তা' নাও হতে পারে, কেননা জীবনের এমন কতগুলি অসঙ্গতি আছে যার হাত থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। যার মায়ার ফাঁদে আমরা বার বার করে পড়ি, আঘাত পাই, ব্যথা পাই, তবু আবার ভুলে যাই, আবার উঠি, আবার সুখের দিকে হাত বাড়াই। ভয় হয়, তবু যাই।

নিধিরাম শোকসন্তপ্ত। এই শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা ভুলবার জন্যেই সে গৃহত্যাগ করে এবং গঙ্গার কোলে এ জীবন সমর্পণ করে মৃত্যুর চির-শান্তিলাভ করবে এই তার বাসনা। মৃত্যুপথযাত্রী নিধিরামকে ঐ মৃত্যুর মধ্যে থেকে তুলে এনে নিয়তি যেন তার সঙ্গে আর একবার পরিহাস করে চলে গেল। নিধিরামের সঙ্গে এককড়ির সাক্ষাৎ, হিরণ্ময়ির সঙ্গে বিবাহ-প্রস্তাব, নিধিরামের পুনরায় বেঁচে ওঠার সাধ, হিরণ্ময়ীর জন্যে অশেষ কষ্ট বরণ, শেষ আঘাত লাভ—এগুলোর মধ্যে এনে নিয়তি নিধিরামকে এক করুণতম অভিজ্ঞতার মধ্যে স্থাপন করেছে। এই কাহিনী নতুন করে জীবনসত্যের সন্ধান দিয়ে আমাদের অবুঝ মনের ভয়ংকরী কামনা বাসনাগুলোকে ধিক্কার জানিয়েছে, ব্যঙ্গ করেছে।

'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পতে লেখক আমাদের তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ও তার নিষ্ঠুরতাকে, ধনীর সর্বব্যাপক প্রতিপত্তিকে ব্যঙ্গ করেছেন। তা' ছাড়া, রূপজ প্রেমের পাশাপাশি আত্মজ প্রেমের ছবি এঁকে, রূপজ প্রেমকে ব্যঙ্গ করেছেন।

মুমূর্ষুপ্রায় তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যখন জীবনের শেষ পদধ্বনি শুনছে, এক কৌটা জলের তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করছে তখন তার জাত-কুল বংশের পরিচয় চাওয়া এবং

জল না দিয়ে চলে যাওয়া যে কতদূর অমানবিকতার কাজ তা' সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তৎকালীন সমাজ মানুষের ওপরে জাত, কুল, মর্যাদার স্থান দিত। মানব-সমাজের এই হৃদয়হীনতাকে লেখক সেই যুগে, সেই সমাজে দাঁড়িয়ে যেভাবে অঙ্কন করেছেন তা' পড়লে আজ আমরা হাসতে পারি, কেননা একে জীবনের এক অসঙ্গতি বলে মনে হয়, কিন্তু সেই অবস্থাকে যদি সত্যি হৃদয় দিয়ে অনুভব করি তবে বুঝি যে মানুষের এই অধর্মকে লেখক যেভাবে ব্যঙ্গের আঘাতে দূর করতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে তাঁর দৃঢ় মনোশক্তিরই পরিচয় ঘটেছে। ব্যঙ্গ-শিল্পীর যথার্থ ধর্ম তিনি রক্ষা করে চলেছেন। তাঁর গল্পের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সামাজিক নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তারই সামান্য উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল,—

"দুই জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন। নিধিরাম ধীরে ধীরে তাহাদিগকে বলিলেন,— 'মহাশয়। পিপাসায় আমার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। কৃপা করিয়া যদি আমার মুখে একটু জল দেন, তাহা হইলে এই আসন্নকালে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করি।'

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাশয়ের নিবাস?'

নিধিরাম বলিলেন,—'আমার নিবাস পূর্বদেশে।'

পুনরায় সেই ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাশয়ের নাম?'

নিধিরাম উত্তর করিলেন,—'আমার নাম নিধিরাম দেবশর্মা। কিন্তু মহাশয়। আমার কথা কহিবার শক্তি নাই। তৃষ্ণায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আমি এক্ষণে পরিচয় দিতে পারি না। মুখে যদি একটু জল দেন, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।'

পুনরায় সেই ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনার ব্যাতোন?'

নিধিরাম বলিলেন,—'আমি চাকরি করি না। আমার বেতন নাই। যান্, আপনারা বাড়ী যান্। আমার জলে কাজ নাই।'

ব্রাহ্মণ, আপনার সঙ্গী অপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—'চল হে, এককড়ি! চল বাড়ী যাই, বেলা হইল, রৌদ্রে এখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।"

এবার লেখক এক ধনী মুসলমানকে এই গল্পের মধ্যে এনে দেখিয়েছেন যে আজকের দিনের মত সেদিনেও ধনীর একটা প্রবল প্রতাপ সমাজে প্রচলিত

ছিল। সেই সমাজে, যেখানে জাতিভেদ প্রথা একটা প্রগাঢ় মূল বিস্তার করে সমাজকে শাসিয়ে রাখতো, তখনও পয়সার জোরে কেউ কেউ সেই সমাজে সর্ব প্রকার মান, সম্মান প্রতিষ্ঠাকে আদায় করে নিত। লেখক এদের ব্যঙ্গ করে লিখেছেন—"বদরুদ্দিন সেখ বলিয়া একজন ডাক্তার আছেন। এখন আর তিনি বদরুদ্দিন নাই। চিকিৎসা করিয়া তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। ক্রমে জমিদারী কিনিলেন, এই স্থানে ইমারত বাড়ী করিলেন, ও টাকার মহাজনী করিতে লাগিলেন। তিনি এখন অনেক টাকার মানুষ! যখন তাঁহার অনেক টাকা হইল, তখন তিনি 'বদরুদ্দিন সেখ' নাম ছাড়িয়া 'বৈদ্যনাথ সেন' নাম লইলেন। টাকা হইলে কি না হয়? ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেই তাহাকে লইয়া চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে একগাছা সুতা তিনি পরিলেন। প্রথম প্রথম সুতাগাছটি কোমরে রাখিতেন, নাভির উপরে তুলিতেন না। ক্রমে আস্তে আস্তে সুতাগাছটি কাঁধের উপর তুলিলেন। তখন সেটি যজ্ঞোপবীত হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময় তিনি 'সেন' ছাড়িয়া 'শর্মা' উপাধি গ্রহণ করিলেন।"

গল্পের মূল কাহিনী নিধিরাম ও হিরণ্ময়ীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। হিরণ্ময়ী যুবতী, সুন্দরী। কিন্তু কুল যেখানে বড় সেখানে রূপের কোন দাম নেই। কুলীনের দ্বারা বেষ্টিত সমাজকে ব্যঙ্গ করেই বুঝি লেখক তাই বললেন, 'হিরণ্ময়ী পরমা সুন্দরী। কিন্তু কুলীনের ঘরে সৌন্দর্য্যের গৌরব নাই।' এই দরিদ্র কুলীন পিতামাতার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কোন উচ্চাশাও থাকতে নেই। হিরণ্ময়ীর পিতা তা ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি হিরণ্ময়ীর বিবাহের জন্যে ধনবান, রূপবান, গুণবান, পাত্রের সন্ধান করেছিলেন—কিন্তু যেখানে টাকাই সমস্ত কিছুর মূল্য নির্ধারক সেখানে দরিদ্রের ফিরে আসা ছাড়া উপায় নেই। লেখক তাই বুঝি ঐ ধনবান সমাজকে ব্যঙ্গ করে বলিয়েছেন, "যেমন উচ্চ আশা করিয়াছিলাম, সেইরূপ ফল পাইয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিলাম।" এই হিরণ্ময়ীকে নিধিরাম ভালবাসলো। হিরণ্ময়ীকে যখন সে মনে মনে গ্রহণ করলো তখন তার ভয়, কত ভাবনা। নিধিরাম সব জানে, সব বোঝে। তবু ভালবাসে, নতুন করে ভুলের মধ্যে পা বাড়ায়। হিরণ্ময়ীর বাক্য তার মনে আশার আলো আনে। যে ভালবাসার কথা শুনলে পূর্বে হেসেই উড়িয়ে দিত আজ তার অঙ্কুর উদগম দেখেও সে বিশ্বাস করতে পারে না। ভাবে পুস্তকে যে ভালবাসার কথা বলে, তা কি এই! মানুষ বিপদে

পড়ে অনেক কিছুকে স্বীকার করে নেয়, জোর করে সেই স্বীকারোক্তিকে ঘোষণা করে। কিন্তু তার অসারত্ব যখন প্রতিপন্ন হয়ে যায় তখন ঐ ঘোষণাকে যেন পরবর্তী কার্যকলাপই ব্যঙ্গ করে যায়। আমরা তখন নেশাচ্ছন্ন, মোহাচ্ছন্ন। তাই সত্যকে চিনতে পারি না, পাপের পঙ্কে ক্রমেই নেমে যাই। হিরণ্ময়ীর জীবন যেন এর এক প্রদীপ্ত উদাহরণ।

হিরণ্ময়ী বলেছিল,—"দেখুন মহাশয়! আমি এক্ষণে আর বালিকা নাই। সকল কথা আমি বুঝিতে পারি। মনে মনে আপনাকে পতি বলিয়া বরিয়াছি। আপনি আমাকে বিবাহ করেন, সে নিমিত্ত দেবতাদিগকে কত ডাকিয়াছি। চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আপনি আমার পতি।......আমি কুলটা নই যে, দুই দিন পরে আমার মনের পরিবর্তন হইবে। বৃদ্ধ হউন, আতুর হউন, যাহা হউন, দেবতাদিগকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আপনার পদে এখন যেরূপ আমার মতি রহিয়াছে, চিরকাল সেইরূপ থাকিবে।"

হিরণ্ময়ীর এই উক্তিকে যেন নিম্নের উক্তি ব্যঙ্গ করছে। "বৃদ্ধের কদাকার মুখ মনে করিতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না, ভয়ে সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে।"... "বাঙ্গাল কি করিতেছে দেখ। ঠাট করিয়া আবার বাবার কোলে শোয়া হইয়াছে।"

হিরণ্ময়ী যাকে বাঙ্গাল বলে, লেখক গল্পের নামকরণ করতে গিয়েও তাকে বাঙ্গাল বলেই অভিহিত করেছেন অবশ্য তিনি ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ করেছেন। বাঙ্গাল এই শব্দটি আমরা অবজ্ঞার্থেই প্রয়োগ করি। কাউকে বাঙ্গাল বলে আমরা যেন নিজেদেরই আত্মগৌরবের সূচনা করি। হিরণ্ময়ীও বোধহয় এইভাবেই নিজের আত্মমহিমাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিল, নিজেকে বুদ্ধিমান বলে মনে করেছিল। কিন্তু সত্যিকারের বুদ্ধিমান কে তাই আমাদের বুঝতে দেরী হয় না। "নিধিরাম কুরূপ, কদাকার বাঙ্গাল বটে, কিন্তু অভদ্র নয়।" নিধিরামের মহত্বই হিরণ্ময়ীর চরিত্রকে যেন ব্যঙ্গ করে। রূপজ প্রেমের জয়ের উজ্জলতা আত্মজ প্রেমের ব্যর্থতার গভীরতার পাশে ম্লান হয়ে যায়।

বীরবালা একটি রূপক কাহিনী। এই রূপক কাহিনী একটি মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ভারতের প্রাচীন গৌরব ও আকস্মাৎ সেই মহিমা থেকে তার পতন এবং পুনরায় হারানো গৌরবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পথের ইসারা রূপককে আশ্রয় করে বীরবালা গল্পে রূপায়িত হয়েছে। এখানে প্রাচীন গৌরব থেকে পতনের ছবিটিই বিশেষভাবে ব্যঙ্গাত্মক। এই কাহিনীটি রাজপুতের, বিশেষ-

ভাবে ক্ষত্রিয়ের। তৎকালীন ভারতের গৌরব ছিল, এবং সে গৌরব একান্ত-ভাবেই রাজপুতের। ভারতের যে দীন হীন অসহায় অবস্থার ছবি পরবর্তীকালে পাই তা' নানা কারণে, বিশেষ করে ভ্রান্ত ধর্মপ্রভাবে গড়ে উঠেছিল। শৌর্যে, বীর্যে, ত্যাগে, প্রেমে অতীত ভারত অতুলনীয় ছিল। কিন্তু তার এই মহিমাদীপ্ত রূপ এবং তার আলো যেন অমাবস্যা বাবাজীর মত ছদ্মবেশী ধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। চলল ধর্মের অপ্রতিহত অধিকার। ব্রাহ্মণ কায়স্থ তো ধর্মান্ধতার চাপে তার সব বলিষ্ঠতা হারিয়ে ফেললই, এমন কি ক্ষত্রিয় বীরেরাও স্ব-ধর্মচ্যুত হলেন। অমাবস্যাবাবাজী এই নামটিই বিশেষভাবে ব্যঙ্গপূর্ণ। ধর্ম যেন গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হয়ে রূপ গ্রহণ করেছে। তাই তার নাম অমাবস্যা। ভারতসিংহ রাজপুত ক্ষত্রিয়। কিন্তু অমাবস্যারূপ ঘন অন্ধকারের চাপে সে এখন মৃত, জড়ে পরিণত হয়েছে। লেখক তাই বলেছেন, "ভারতসিংহ এক্ষণে জড় পদার্থ। জ্ঞানগোচর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন,—যা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।" এই সুযোগের সদ্ ব্যবহার করতে অমাবস্যা বাবাজী ছাড়েনি। এখানে কমলাকে ধর্মের প্রতীক-রূপে যেন আঁকা হয়েছে। তাই অধর্মরূপী অমাবস্যা অতি সুকৌশলে ভারতসিংহের নবজাত শিশুকন্যা ধর্মরূপী কমলাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলে। অধর্ম এসে ধর্মকে যেন সমাধিস্থ করে দেয়। অপর দিকে, বীরবালা হ'ল একাধারে অতীত ক্ষাত্রতেজের মূর্ত প্রতীক এবং ভবিষ্যত ভারতের মুক্ত প্রাণের প্রদীপ্ত অগ্রদূত। লেখক বীরবালাকে প্রকৃত বীরা করেই এঁকেছেন। তাই সে বিপদে শুধু চোখের জলই ফেলে না। চোখের জল সহস্র কর্মে, কর্তব্যে, প্রেমের উত্তাপে বাষ্প হয়ে যায়। তাই তো বীরবালা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চলেছে, সমস্ত বিপদ ভয়কে অগ্রাহ্য করেছে, সহস্র দুঃখের কাঁটা পদদলিত করেছে। চলতে চলতে তাকে এনে ফেলা হয়েছে সেই ছোট্ট একটা দ্বীপে। লেখক ইংরাজদের ধর্মবোধ, উদারতায় আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। তিনি দেখেছেন আমাদের ধর্ম আচ্ছন্ন, অস্পষ্ট। আর ও দেশের ধর্ম স্বচ্ছ, প্রাণময়। তাই ভারতকে প্রকৃত স্বরূপে, স্বধর্মে, ফিরিয়ে আনতে হলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগ সাধন করা একান্ত দরকার। পাশ্চাত্যের সঙ্গে এই মিলন মানে এই নয় যে আমরা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হব, স্বজাতীয়ত্ব বিসর্জন দেবো। বরং বলা যেতে পারে, আমাদের জীবনে যে আলো জ্বলছিল ক্ষণকালের জন্যে যা চাপা পড়ে গিয়েছিল, পাশ্চাত্য

জীবনের প্রাণময়, স্বচ্ছ, সাবলীল শক্তি দিয়ে তাকে মুক্ত করে আনবো। যা ছিল, কিন্তু হারিয়ে গিয়েছিল, সেই হারানো গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হবে। বীরবালা যে সাহেব ভূতদের সহায়তায় কমলাকে উদ্ধার করল—এ যেন তারই ইঙ্গিত বহন করে। বীরবালার মধ্যে দিয়ে দাম্পত্যের একটি স্বরূপও উদ্ঘাটিত হয়েছে। দেবীসিংহের স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে হনুমানজী সেই সত্যকে দেখালেন। দেবীসিংহ যেভাবে রমণীর শুধু রূপেরই ধ্যান করে তা' ভারতীয়দের, বিশেষ করে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দুর্বলতারই পরিচয়, এই দুর্বলতার প্রতি ব্যঙ্গ আছে। ভারতীয় নারীর আদর্শ বীরবালা। তার মধ্যে পাশ্চাত্য জাতিসুলভ বীরত্ব ও ভারতীয় জাতির প্রেম ত্যাগ, দুঃখবরণ—দুই-ই, আছে। এদিকটা দেখানো লেখকের অপর একটি উদ্দেশ্য। গল্পের প্রথম দিকে টিকি নিয়ে হনুমানজীর রঙ্গ-ব্যঙ্গও লক্ষণীয়। সমগ্র কাহিনীতে লেখক রূপকের আবরণ গ্রহণ করেছেন, কেননা ধর্মের প্রতি, তৎকালীন জীবনের তামসিকতার প্রতি ব্যঙ্গ করা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি আনুগত্য দেখানো সেই সমাজে কিছু কষ্টসাধ্য ছিল। তাই ব্যঙ্গ ও সত্যকে রূপকের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ করেছেন।

"ভূত ও মানুষ" গ্রন্থের "লুল্লু" আপাতদৃষ্টিতে একটি ভূতের গল্প। লুল্লু একটি ভূতের নাম। এই ভূতটি গল্পের এক সুবিস্তৃত পরিসরে স্থান লাভ করে আছে। শুধু এই একটি মাত্র ভূতই নয়, এরই পাশাপাশি আছে গ্যাঁগোঁ, ঘ্যাঁঘো, নাকেশ্বরী,—ইত্যাদি নানা ভূত। যে ভূতের ভয়ে সকলে এত ভীত, তাদের লেখক এমন সহজ আর স্বাভাবিক করে তুললেন কেমন করে যে তা' ভাবলেও বিস্ময় জাগে। ভূতের কাণ্ড বলে এ ধরনের রচনায় আমরা তেমন গুরুত্ব দিই না। ভূতেদের কার্যকলাপ আমাদের শুধু হাসায়। ব্যঙ্গের দিকটা বাদ দিয়েও যদি শুধু ভূতের গল্পরূপে গ্রহণ করি তা' হলেও এর হাস্যরস আমাদের আচ্ছন্ন করে তোলে। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গসত্তাকে চেনা ও জানাই আমাদের কাজ। তাই লুল্লু আমাদের কাছে শুধু ভূত বলেই গ্রহণীয় নয়। লুল্লু ভূত বলে কোন অশরীরী সত্তা নয়, কোন **supernatural spirit** নয়, সে আমাদেরই স্ব-সত্তার একটা দিক, আমাদেরই স্বভাবের একটা অংশ, আমাদেরই চরিত্রের গ্লানি। যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়।....."অন্ধকারের অভাব নাই। নিশাকালের বাহিরে তো অল্প স্বল্প অন্ধকার থাকেই। তারপর

মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। ক্রমে সেই অন্ধকার রাশি জমিয়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। অবশেষে তাহা এক ভীষণ প্রকাণ্ড নরমূর্তিতে পরিণত হইল। নরমূর্তি ধরিয়া ভূত গাছ হইতে নামিয়া আসিল, বৃক্ষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।"—এই উদ্ধৃতি অংশ হইতেই লেখকের ভূত-ধারণাকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি। আমরা সকলেই মানুষ, লেখক যেন এ কথা মানতে চান না। তিনি বলতে চান যে এমন অনেক লোক আছে যারা অন্তরে মৃত, আর তাদের এই মৃত অবস্থার সুযোগে তাদের মধ্যে অনেক দুর্নীতি, পাপ, লোভ, হিংসা মূঢ়তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তখন আমরা ভূত-ত্ব প্রাপ্ত হই। লেখক বুঝি তাই বলেছেন, "ভাল, তোমরা যদি মরা ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে তো কেহ তোমাদের ভূতগিরি করিতে আসে না।"

নেহাত তামাসাছলেই যে গল্পের আরম্ভ তার ব্যাপ্তি কত বিস্তৃত। আমীর অতি সাদাসিদে, সাধারণ, পত্নীপ্রেমে আর চণ্ড নেশায় মশগুল ব্যক্তি। একটা মজা করবার জন্তেই তিনি পত্নীকে ভয় দেখিয়ে বলেছিলেন—"লে লুল্লু"। এই থেকেই যত বিপত্তি। লুল্লু কর্তৃক আমীর-রমণী হরণ, আমীরের কাতর রোদন, দেশত্যাগ, বিভিন্ন ব্যক্তির সহায়তায় ও চতুর কৌশল অবলম্বন ইত্যাদির সাহায্যে, অশেষ কষ্ট স্বীকার করে পুনরায় পত্নীলাভ ও দেশে প্রত্যাবর্তন ও নূতন করে আনন্দ লাভ—লুল্লু গল্পাংশে এই কাহিনী আছে। কিন্তু কাহিনী যা'ই থাক না কেন, লেখকের ব্যঙ্গ-দৃষ্টি ও হাস্যরস সৃষ্টি সমান তালেই এগিয়ে চলেছে। গল্পের প্রতিটি দৃশ্য যেমন হাসির, তেমনি মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের ছোঁয়ায় সজীব। হাসি আর ব্যঙ্গ মেশামেশি হয়ে রয়েছে। কোথাও প্রকটতর হয়ে রুদ্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেনি। কিন্তু যখনই যে দিকটাকে পেরেছেন ব্যঙ্গ করে গেছেন।

নিবিড় অন্ধকার রজনীতে একাকী সুন্দরী যুবতীকে কাছে পেলে, যে, সকল মানুষের মনেই এক কম্পিত আকুলতার অকস্মাৎ আবির্ভাব ঘটতে পারে তারই প্রতি লেখকের সরস কটাক্ষ দেখা যায় একটি লাইনে—"এরূপ সামগ্রী পাইলে দেবতারাও তদ্দণ্ডে নিকা করিয়া ফেলেন, তা' ভূতের কথা ছাড়িয়া দিন।" মানুষের মনে সব সময়েই একটা না একটা অহংকার আছেই, আমীরের অহংকার যে, সে বুঝি প্রেমের রাজ্যে একেবারে আদর্শস্থানীয়। তাই লোকে যখন বললো যে বিবি বোধহয় কোন পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গেছে, তখন

আমীর এই-জগৎ-সংসারের উপরে বীতরাগ হয়ে যেভাবে নিজেকে মজনুর সহিত ও স্ত্রীকে লায়লার সহিত একাত্ম করে নেয় তা' আমাদের কাছে যথেষ্ট কৌতুককর বলে মনে হয়, তাই হাসি। লেখকের উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। মানুষের মনের অজ্ঞানতা-প্রসূত গর্বভাবকে এখানে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন। অন্যত্র আবার একটি ব্যঙ্গ সৃষ্টি দেখি। আমীর যে বাঁশের নলটিতে করে আফিং খেতেন তার গায়ে চীনাভাষায় যে লেখাগুলো ছিল, সেগুলিও লক্ষ্য করার মতন। যেমন—"বাজে মেকরদিগের কাছে গিয়া যেন বৃথা অর্থনষ্ট না করেন। মোপিঙের নল ক্রয় করিয়া যদি কাহারো মনোনীত না হয়, তাহা হইলে নল ফিরাইয়া দিলে, মোপিঙ তৎক্ষণাৎ মূল্য ফিরাইয়া দিবেন।" বিক্রেতাদের এ ধরনের বিজ্ঞপ্তির অন্তসারশূন্যতাই প্রকাশ পেয়েছে; লেখক প্রচ্ছন্ন থেকে বিক্রেতাদের এই মিথ্যা স্তোকবাক্যকে ব্যঙ্গ করেছেন। কেন না অধিকাংশ সময়েই বিক্রেতাগণ জানেন যে দূর দূরান্ত পার হয়ে ক্রেতাগণ আর তার পয়সাটি ফেরৎ নেবার জন্যে হেঁটে আসবে না। ব্যবসায়িক অসাধুতা এইভাবে অনেক স্থলে প্রশ্রয় পায়। আমীর তার হারানো' স্ত্রীর অনুসন্ধানে এক গণৎকারের সামনে এলেন। এখানে লেখকের ব্যঙ্গ করবার আর একটি যেন অবসর মিললো। এই গণৎকারটির নাম 'জান'। ইঁনি "ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকলই প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। সংসারে তাঁহার কাছে কিছুই গুপ্ত নাই। অদৃষ্টের লিখন তিনি জলের মত পড়িতে পারেন।......ললাটে কি হাতে, যে ভাষায় বিধাতা কেন আঁচড়-পিচড় পড়িয়া থাকুন না,—ইংরাজীতে হউক, কি ফারসীতে হউক, দেবভাষায় হউক, কি দানব ভাষায় হউক,—সকলই তিনি অবাধে পড়িতে পারেন। চুরি-জুয়াচুরি সকলই বলিয়া দিতে পারেন। অবোধ গবর্নমেণ্ট যদিও তাঁহাকে একটিও পয়সা, কি একটিও টাইটেল দেন নাই সত্য, কিন্তু দূর-দূরান্তর হইতে তাঁহার নিকট লোক আসিয়া থাকে।" দূর দূরান্তর থেকে যে লোকগুলো তাদের দুরন্ত বিশ্বাস নিয়ে এই জাতীয় গণৎকারের কাছে আসে তাদের সব বুদ্ধি-বিবেক যেন এই গণৎকারের পায়ে সমর্পিত হয়েছে। যে-লোকটা সব লোকের সব সমস্যাকে জলের মত পড়ে দিতে পারেন, সমাধান করতে পারেন, তিনি তো নিজের সমস্যাগুলোকে আগে দূর করতে পারেন। লোকের দেওয়া পাঁচটি পয়সা আর পাঁচ ছটাক আটার পরে নির্ভর করেন কেন? আসলে তিনি গণৎকার হলেও জোর ধাপ্পাবাজিতে বোধহয় সিদ্ধহস্ত হননি। তা' হলে তার আরও প্রতিপত্তি, প্রসিদ্ধি হতে পারতো।

তার সেই প্রতিষ্ঠার কাছে হয়তো বড় বড় রাজারাও হার খেয়ে যেতেন। মূর্খ, অন্ধ লোকগুলোর অজ্ঞানতার সুযোগে যে গণৎকার অথবা গুরুর উদ্ভব, লেখক তাঁর গল্পরাজির বৃহৎ পরিধির স্থানে স্থানে, যেখানে সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই, তাঁদের হাস্যকর, নীচ, হিংস্র করে এঁকেছেন। এখানেও তার কিছু পরিচয় পেলাম। এবার লেখকের শানিত ব্যঙ্গধারা বর্ষিত হয়েছে রোজাকুলের ওপরে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতভূমিতে ভূত ও ভূতের রোজার একটা প্রবল আধিপত্য ছিল। কিন্তু ইংরাজরা আমাদের দেশে আসবার ফলে আস্তে আস্তে আমরা কিভাবে একটু একটু করে আমাদের অজ্ঞতা কাটিয়ে উঠেছি লেখক তা' স্বীকার করেছেন। সাধারণ পনেরো আনা মানুষের দুর্বলতা, অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে আমাদের দেশের কত লোক যে দিনের পর দিন তাদের সর্বপ্রকার সুখ সাচ্ছন্দ্য আদায় করে দিতেন তার ইয়ত্তা নেই। এদের সেইসব ব্যবসা পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শ লেগে অনেক নষ্ট হয়ে গেছে, আবার কিছু বা নবতর পদ্ধতিতে, উন্নততর ভঙ্গীতে ঘর জাঁকিয়ে বসেছে। তবে রোজার ব্যবসায় একেবারে ভাঁটা পড়েছে, এটা ভারতের পক্ষে মঙ্গলের, কিন্তু লেখক ব্যঙ্গ করে বললেন, "মরি! মরি! ভারতের সকল গৌরবই একে একে লোপ হইল।" পরক্ষণেই লেখক এমন একজনের সঙ্গে আমীরের সাক্ষাৎ ঘটালেন যে পূর্বে অতি দরিদ্র ছিল এই রোজাগিরির ফলেই আজ ধনী হয়েছে। সুতরাং একেবারে সকল ব্যবসা লোপ পেয়েছে এ কথা তো বলা চলে না। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ রোজার ভূত তাড়ানোর কৌশলটি অতীব উপাদেয়। এই ভূত তাড়ানোর কৌশলটি সে আবার একটি ভূতের কাছেই শিখেছিল। পূর্বেই বলা আছে ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় ভূত রূপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণের যে ভূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল সে একটি বদ্‌লোক ছাড়া আর কেহ নহে। সে শুধু কূট-কৌশলের দ্বারাই ভূত ছাড়ানোর পথ বলে দিল। অর্থাৎ মানুষকে ঠকিয়ে, তাদের মনে এমন এক বিশ্বাস উৎপাদন করানো হল যে, ব্রাহ্মণ এক মস্তবড় রোজা, পৃথিবীতে তার তুল্য রোজা আর কেহ নেই। এই কথাই চারধারে রটে গেল। আমাদের দেশ ভাবালুতার, হুজুগপ্রিয়তার দেশ। একবার একটি কথা রটলে হ'ল তার তখন জয় জয়কার। ব্রাহ্মণের অবস্থাও তেমনি হয়েছিল। তাঁতি এই চরিত্রটিও অদ্ভুত হাস্যকর। তাঁতি হয়তো সঙ্গীতরসিক। কিন্তু সঙ্গীত অনুরাগী হলেই তো গলার তারে তারে সঙ্গীতের সাতটি সুরের মায়াবী আবেশ জাগে না। আমাদের মধ্যে বহু রকমের পাগল

আছে। এরা নিজের নিজের শখকে এত গুরুত্ব দেন যে তার জ্বালায় আর পাঁচজনের প্রাণ রাখা দায় হয়। তাঁতির অবস্থাও কতকটা সেইপ্রকার। তার গান কেউ শুনতে চায় না। সে পয়সা খরচ করে গান শোনায়। লোকে গান গেয়ে পয়সা রোজগার করে, আর তাঁতি পয়সা দিয়ে গান শোনায়। তাঁতি নিজেকে বড় গাইয়ে মনে করে যেমন সাঙ্গোপাঙ্গা নিজেকে বড় বীর মনে করতো। তাঁতির গান শুনলে ভূত পর্যন্ত পালিয়ে যায়। এ ধরনের মানুষের পাগলামিকে লেখক ব্যঙ্গ করে গেছেন এবং গল্পের মধ্যে তার আবির্ভাব ঘটিয়ে প্রচুর হাস্যরস বিতরণ করেছেন। এই তাঁতিকে একবার গান গাইবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছিল, তাঁতির তখন যে আহ্লাদ, যে অহঙ্কার হয়েছিল তা' একাধারে ব্যঙ্গ ও হাস্যের কারণ। এবার আমীর চললেন ভূতদের মধ্যে গেজেটস্বরূপ ঘ্যাঁঘো ভূতের কাছে, তিনিই নাকি আমীর-রমণীকে কোন্ ভূতে নিয়েছে তার সন্ধান বলতে পারবে। এখানে আবার আর এক ধাক্কা হাসির পালা। কেননা এই ভূতটি এখন মনোদুঃখে জর জর হয়ে আছে। ভূতগিরি করতে করতে সে বুড়ো হয়ে গেল কিন্তু আজও পর্যন্ত সে বিবাহ করতে পারেনি। কেননা তার বিবাহের পথের প্রতিবন্ধক হল গোঁগোঁ নামে একটি ভূত। নাকেশ্বরীকে দেখেই তার মন মজেছে কিন্তু ঐ গোঁগোঁর উৎপাতেই তার বিবাহ হয়নি সেই বেদনায় সে সংসার ত্যাগ করে কূপের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে, যেন জগৎ সংসারের পরে তার এক উদাস বৈরাগ্য এসেছে। এই ঘ্যাঁঘো যখন বলে "সংসারে আমি আধখানা হইয়া আছি, পুরো ঘ্যাঁঘো হইতে পারিলাম না"—তখন আমরা তার ব্যথায় ব্যথা অনুভব করি না, বরং এক অস্ফুট চাপা হাসিতে ফেটে পড়তে চাই।

এতক্ষণ লেখক গল্পের দীর্ঘ পথের নানা অসঙ্গতিকে দেখিয়ে দেখিয়ে এলেন, রঙ্গ আর ব্যঙ্গের দ্বৈত শাসনে ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু গল্পের প্রধান চরিত্রের সঙ্গে আমাদের সামনাসামনি দেখা এবার ঘটলো। ভূত নিজেই বলছে, "আমি ভূত। আমার নাম লুল্লু। আমি সামান্য ভূত নহি, সভ্য ভব্য নব্য ভূত। আর এই ধনসম্পত্তি, এই গিরিগহ্বর আমার; আমি দুখিরাম চণ্ডালের ভূতগিরি করিতেছি। ভূত-সমাজে আমি অতি প্রবল-পরাক্রান্ত বলিয়া পরিচিত, আমার মান-মর্যাদা রাখিতে আর স্থান নাই।" অন্যত্র সে বলেছে, "দেখ, এখন আমি সাবান মাখিতে আরম্ভ করিয়াছি। রোজ সাবান মাখি। রং অনেক ফরসা হইয়া আসিয়াছে। আর কিছুদিন পরে লোকে

আমাকে আর চিনিতে পারিবে না। যেখানে যাইব, সকলে বলিবে, 'লুল্লু নয়, এ সাহেব ভূত; কোন লার্ডের ছেলে হইবে।"......"আমি আর আমার গেঁটে দাদা, দুই জনেই সভ্য ভব্য নব্য। দেখিতে পাও তো, ভোর না হইলে কখনও বাড়ী আসি না।" অধিক উদ্ধৃতির আর প্রয়োজন নেই। এই সামান্ত পরিচয় থেকেই আমরা বেশ বুঝতে পারি যে লেখক এই লুল্লু জাতীয় ভূতচরিত্র অঙ্কনের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকেই অতি স্বকৌশলে ব্যঙ্গ করেছেন। অন্ধ ইংরাজ-মোহ আমাদের সমাজের একশ্রেণীর লোককে যে কতদূর অমানুষ করে তুলেছিল এবং লেখককে তা' কতটা পীড়া দিয়েছিল তার জলন্ত প্রকাশ দেখা যায় ঐ শ্রেণীর লোকগুলোকে ভূতরূপে রূপকায়িত করার মধ্যে। এদের তিনি ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন। তাই যতদূর নীচ, ঘৃণ্য, লজ্জাসরমহীন, নির্বোধ—তার সবটুকুকে মিশিয়ে এদের সৃষ্টি করেছেন—যাতে এদের দেখলেই আমরা হাসি, বিদ্রূপ করি। এদের নৈতিক চরিত্র বলতে কিছু নেই। তা' না হলে পরের স্ত্রীর প্রতি লুল্লুর এত আকর্ষণ কেন, দেখবামাত্রই ধরে এনে অশোকবনে সীতার মতন বন্দী করে রাখা, আর তার অনুকম্পা লাভ করবার জন্তে শত চেষ্টা করা। এই শ্রেণীর লোকেদের ভূত বলাতে দোষেরও কিছু হয়নি। শোনা যায় ভূতরা নাকি নিশাচর, এরাও তাই। মদ্যপান ও অসৎ-সংসর্গে গমনই এদের জীবনের ধর্ম। কোন ব্যক্তিত্ব নেই এই লুল্লু শ্রেণীর মানুষগুলোর। গল্পের শেষে এই লুল্লুর যে পরিবর্তন দেখি, তা কিছুটা চণ্ডুর প্রভাবে হলেও বাকীটুকু নিশ্চয়ই মানুষের প্রভাবে হয়েছে। আমীর-রমণী লুল্লুর ঐ উগ্র বিদেশীয়ানার পরিবর্তন দেখেই তার কাছে সহজভাবে মিশেছে, কত জায়গায় বেড়াতে গেছে। লুল্লু তখন সহজ-স্বভাবে, স্বচ্ছ জীবন গতিতে এসে মিশেছে। তার সেই ইংরাজ হয়ে উঠবার ব্যর্থ প্রয়াস ও তার গর্বকে সে তখন জলাঞ্জলি দিয়েছে। এই গল্পের ভূত চরিত্র সৃষ্টি সর্বাংশে সার্থক। হাস্ত ও ব্যঙ্গ দুইই সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এখানেই এ গল্পে ব্যঙ্গ সৃষ্টি শেষ হয়নি। গল্পের দশম অধ্যায়ে লেখক আমাদের ভ্রান্ত ধর্মবোধকে ব্যঙ্গ করেছেন। আমরা আমাদের সংস্কার আচ্ছন্নতা দিয়ে ধর্মকে ঘিরে রেখেছিলাম। জাতিভ্রষ্ট হবার ভয় আমাদের পদে পদে বেধে রেখেছিল। ভারতের বাইরে গেলেই আমাদের ধর্মনাশের, জাতিনাশের সমূহ আশঙ্কা ছিল। আমাদের তৎকালীন সমাজের এই প্রথাবদ্ধতা, অন্ধকার-আচ্ছন্নতাকে লেখক অতি সার্থকভাবে ও স্পষ্টভাবে ব্যঙ্গ

করেছেন—"আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা। যেরূপ অপক্ব মৃত্তিকাভাণ্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্র-পারের বায়ু লাগিলেই আমাদের ধর্ম ফুস্ করিয়া গলিয়া যায়,......কেবল তাহা নহে, পরে আমাদের বাতাস যাঁহার গায়ে লাগিবে, দেবতা হউন কি ভূত হউন, নর হউন, কি বানর হউন, তিনিও জাতিভ্রষ্ট হইবেন।" গল্পের শেষ-অংশে সাহিত্যিক ব্যঙ্গ সৃষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে কাগজের সম্পাদক ও বিভিন্ন প্রবন্ধ-লেখকদের উদ্দেশ্যে এ ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রায় সময়েই দেখা যায় যে কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনের চাপে পড়ে বিভিন্ন লেখক ও সম্পাদকগণ তাঁদের কঠিন ও মহান ব্রতকে ভুলে যান। তাঁদের যেন স্বধর্মচ্যুতি ঘটে। একদল অপর দলের উদ্দেশ্যে অকথ্য বাক্য উচ্চারণেও দ্বিধাগ্রস্ত হন না। মোট কথা তাঁদের উদ্দেশ্য যেমন করেই হোক দু'পয়সা রোজগার করতে পারলেই হল। তাঁদের এই অর্থ উপার্জনের আকাঙ্ক্ষার স্রোতে কোন জনহিতকর চিন্তা দাঁড়াতেই পারে না। এই ভ্রান্ত জনসেবী, সাহিত্যসেবীগণ লেখকের আক্রমণের বস্তু। নিম্ন উদ্ধৃতিতে লেখকের এই ব্যঙ্গাত্মক মনোভঙ্গীকে চিনতে সহজতর হবে আশা করি—

"আমি একখানি খবরের কাগজ খুলিবার বাসনা করিয়াছি; সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন। ডিবের ভিতর যে ভূতটি ধরিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে সহকারী-সম্পাদক করিব। আর তোরে মনে করিয়াছি, সম্পাদক করিব।" গোঁগোঁ বলিল,—"আমি যে লেখাপড়া জানি না।" আমীর বলিলেন,—"পাগল আর কি। লেখা-পড়া জানার আবশ্যক কি? গালি দিতে জানিস ত?" গোঁগোঁ বলিল,—"ভূতদিগের মধ্যে যে সকল গালি প্রচলিত আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।" আমীর বলিলেন, "তবে আর কি। 'আবার কি চাই?......এখন দেশশুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব। আমার অনেক পয়সা হইবে।" সুতরাং পয়সা করাই যে সংবাদপত্র সম্পাদকের একমাত্র লক্ষ্য তারা তো দেশের শত্রু। কিন্তু তা' হলেই বা কি হয়, এমনিভাবেই সংবাদপত্রের কোন কোন স্থলে সুখ্যাতি হয়। মন্দ লোকের দ্বারা পরিচালিত লেখার কোন মূল্য নেই। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সব সময়েই মঙ্গলজনক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা' যেখানে না হয় সেখানে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তাই বুঝি লেখকের সাবধান বাণী—"ভূতগ্রস্ত হইয়া লেখকেরা কত কি যে লিখিয়া ফেলেন, তাহার কথা আর কি বলিব! তাই বলি লেখক দল! সাবধান!"

ছোট্ট একটি গল্পের মধ্যে দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ যেভাবে নবতর ভঙ্গীতে ব্যঙ্গ করেছেন তার মধ্যে যে কত বিভিন্ন বিষয় পড়েছে তা' আমাদের বিস্মিত করে, গল্পটি যেন ধর্ম, অধর্ম, ভ্রান্ত চেতনা, নানা দুর্বলতা, ভাবালুতা, অসঙ্গতি,—ইত্যাদির এক বিচিত্র ব্যঙ্গশালা।

"ভূত ও মানুষ" গল্পগ্রন্থের 'লুল্লু' গল্পতে ত্রৈলোক্যনাথ বলেছেন, "ইংরেজের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসাই একরূপ লোপ পাইয়াছে।" কিন্তু একথা সর্বাংশে সত্য নয়। যদি তা' হ'ত তা'হলে লেখক আবার নূতন করে "নয়ন চাঁদের ব্যবসা" গল্পটি লিখতে পারতেন না। নয়নচাঁদ যেভাবে তার বুদ্ধিকে মূলধন করে ব্যবসার ক্ষেত্রে শূন্যহাতে নেমেছিল এবং দু'হাতে পয়সা লুটেছিল তা' গল্পের বিষয় বলে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। একদিন নয়নচাঁদের পক্ষে হয়তো শীতলার ব্যবসা করাই নিরাপদ ছিল, তাই নয়ন শীতলার ব্যবসাই খুলেছিল। আজ হয়তো ঐ ব্যবসা আর তত চলেনা, তবে অন্য ব্যবসা তো চলছে। "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের" শ্যামানন্দ গণ্ডেরির ব্যবসাটির কথা এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি। শুধু রীতি-নীতিটি কিছু পালটিয়েছে অথবা উন্নততর হয়েছে—এইটুকুই যা' লক্ষণীয়। আসলে মানুষের যে কোন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চিরদিনই এক শ্রেণীর অসাধুতা প্রশ্রয় পাবেই। তবে, যুগ যত এগিয়ে চলছে ততই এই অসাধুতার রূপ যেন ভয়ংকর হয়ে উঠছে। নয়নচাঁদের ব্যবসায়ীক নীতিতে অসাধুতা ছিল, কিন্তু শ্যামবাবুর অসাধুতার কাছে তা' অতি নগণ্য। নয়নচাঁদ তো কারও গলায় ছুরি দিয়ে তার যথাসর্বস্ব নিয়ে আসে না! কেউ যদি ভুল করে কিছু ফেলে রেখে যায়, নয়নচাঁদ শুধু সেইটুকু কুড়িয়ে নিয়ে আসে। যদি কেউ ভুল না করে, তবে তো সে ঐ শীতলার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে না। তাই নয়নচাঁদ যেভাবে জলা থেকে দিব্য একটু এঁটেল মাটি দিয়ে শীতলা গড়িয়ে শীতলার পাণ্ডা থেকে ক্রমশ শীতলার ডাক্তার হয়ে ওঠে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। লোকে যদি তাকে মেনে নেয় তাতে কি দোষ নয়নচাঁদের, না সাধারণ জনগণের? নয়নচাঁদ যেভাবে তার নিজের কাহিনী বিবৃত করেছে, তাতে সে যত হাল্‌কা চালেই কথা বলুক না কেন, সে যেন আমাদের বুদ্ধিহীনতাকে, আমাদের ভ্রান্ত ধর্মচেতনাকে, আমাদের ভাববিলাসিতাকে, এমন কি শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মানুষেরই হুজুগপ্রিয়তা ও যুক্তিহীনতাকে অবলীলাক্রমে ব্যঙ্গ করে গেছে। অথচ তার এই ব্যঙ্গকে আমরা বুঝতে পারি না, তার কথায় বিশ্বাস করি

আর মাটিতে মাথা ঠুকে বলি—"হে মা কাটি গঙ্গ! হে বাবা ফণী মনসা। তোমাদের পায়ে গড়।" নয়নকে দেখতে অতি সাধারণ, গুলিখোর হলে কি হবে বুদ্ধিতে সে বেশ দড়। তাই তো, সে যে শীতলার ছড়া বেঁধেছিল, যা শুনে আমরা এখন হাসিতে লুটোপুটি খাই, তার জোরেই সে ধামা ধামা চা'ল আর গণ্ডা গণ্ডা পয়সা রোজগার করতে লাগলো। তার এই রোজগারের কাছে হাইকোর্টের জজেরাও হার খেয়ে যায়। গিন্নির কাছে প্রথম দিনের রোজগারটি এনে সে বলে নিয়েছে, "গিন্নি! একবার বাহির হইয়া দেখ দেখি বাপধোন। ব্যাপারখানা কি? বড় যে গুলিখোর বলিয়া মুখঝামটা দাও। গুলিখোর না হইলে এরূপ ফিকির বাহির করে কে; বাপধোন? এরূপ বুদ্ধি যোগায় কার?" নয়ন প্রতিটি কাজে নিজেকে যেভাবে জাহির করে ও বড় মনে করে তাতে আমরা প্রচুর হাসি। সত্যি নয়নকে এমনভাবে আঁকা হয়েছে যাতে স্বতই একটা হাস্যরস ঝরে পড়ে। তার প্রতিটি কথা, চাল-চলন, তার বাহাদুরী, তার ভয়, কান্না সব কিছুতেই আমরা অফুরন্ত হাস্যরস উপভোগ করি।

একবার নয়নের শীতলাটি এক মাতালে কেড়ে নিয়েছিল আর বেদম প্রহার করেছিল। সেই সময় নয়ন একবার মনে করেছিল যে শীতলার ব্যবসা ছেড়ে দেবে। কিন্তু সে আর এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। এ কাহিনী স্বর্গ-মর্ত-নরক পর্যন্ত বিস্তৃত, কল্পনায় আর বাস্তবে মেশামেশি হয়ে রয়েছে। আর প্রচুর হাস্যের পাশাপাশি লেখক আমাদের স্বভাবের, চরিত্রের, শাস্ত্রের, ও পাপ-পুণ্য ধারণায় নানা দিককে ব্যঙ্গ করেছেন।

এই গল্পে আমরা দুটি ভূতের সাক্ষাৎ পাই। নয়নচাঁদ বলেছে, "সন্ধ্যার পর, ভয়ে ভয়ে, কাঁপিতে কাঁপিতে, প্রাণটি হাতে করিয়া সেই মাতালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ন জনঃ ন মানবঃ। কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বাহিরের ঘরের দ্বারের নিকটে গিয়া একটু উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাপু রে! বলিতে এখনও সর্ব শরীর শিহরিয়া উঠে। বাহিরের ঘরের ভিতরে দেখি, না, বসিয়া আছে দুইটি ভূত!" ঘরের মধ্যে এইরকম দুইজন ভূত বসে থাকা এক অবিশ্বাস্য ও হাস্যকর বলেই মনে হয়। আসলে এদের ভূত, ভগবান না শয়তান কোন্‌টা বললে যথার্থ হয় তা' ভেবে দেখার মত। লেখক ভূত বলে অভিহিত করলেও এদের কার্যকলাপ থেকে বুঝতে পারি যে এরা অতিশয় ধূর্ত, অসৎ উপায়ে সকলকে কিভাবে হাতে

রাখতে হয়, জব্দ করতে হয়, তা' তারা জানে। এরা মদ্যপানে চুর হয়ে থাকে, ধর্ম-অধর্ম, শালীনতা-অশালীনতা বোধ এদের অতি সামান্যই। এই ভূত দু'টির আসল নাম মিত্তির জা, ও নেই আঁকুড়ে। মিত্তির জা অতিশয় বদমাইশ ব্যক্তি যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেননা সে নিজেই বলেছে,—"তোমার শীতলা কাড়িয়া মনে মনে আমার বড়ই আনন্দ হইল। কারণ এইরূপ কাজে যেরূপ আমার আনন্দ হইত, এমন আর কোনও কাজে নয়।"……আরও বলেছে, "পৃথিবীতে আসিয়া আমি কখনও কোন একটি পুণ্যকর্ম করি নাই। চিরকাল পাপ করিয়াছি। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, চুরি, জাল প্রভৃতি যাহা কিছু কর্ম করিয়াছি।" মিত্তির জা একবার পুণ্যকর্ম করেছিল—এক মরমর এঁড়ে-বাছুর একটি ব্রাহ্মণকে দান করেছিল, দড়িটি ধরে বাছুরকে বাড়ী নিয়ে যেতে না যেতেই রাস্তার উপর বাছুর শুয়ে পড়ল, আর সেখানেই মরে গেল।—লেখক এখানে আমাদের পুণ্যসঞ্চয়ের বিকৃত ধারণাকে ব্যঙ্গ করেছেন। তৎকালীন যুগের টিকি রাখার প্রথাটিকে লেখক নানাস্থানে নানা-প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করেছেন। এ গল্পে দেখি মিত্তির জার সঙ্গে যমের ঐ টিকি না রাখা নিয়ে ঝগড়া হয়। মিত্তির জা ভূতের মত দু'একটি শয়তান ব্যক্তিকে আমরা মন্দ ব্যক্তি বলে জানলেও তাদের সেই দুষ্ট বুদ্ধির কাছে কোন সৎ লোকও দাঁড়াতে পারে না, কৌশলে এদের বশে আনতে হয়। মিত্তির জাকে যমালয়ে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তার যে ক্রিয়াকলাপ,—প্রথমে পুণ্য ভোগ করতে চাওয়া, এঁড়ে বাছুরকে ডেকে এনে যম ও চিত্রগুপ্তকে তাড়া করানো, একে একে যমের ও চিত্রগুপ্তের, ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা ও শেষে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের কাছে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন এক অতীব হাস্যকর চিত্র রচনা করেছে। পরে দেখি নারায়ণ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে এই লোকটাকে স্বীকার করে নিয়ে বলছেন, "এ মানুষটি দেখিতেছি সাধারণ মানুষ নয়, ইহাকে মিষ্ট কথায় বশ করিতে হইবে। তা না হইলে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, আমার নারায়ণত্ব এ সব কাড়িয়া লইবে।" সত্যি মিত্তির জা ভূত হলে কি হবে, সে সুযোগ পেলে যেভাবে পুণ্য কর্ম করে, লক্ষ লক্ষ পাপী-তাপীকে যেভাবে উদ্ধার করে, তা'তে আমাদের তার 'পরে আর কোন দ্বেষ থাকে না। বরং মানুষ, যম, দেবতাদের সে যেভাবে ভীত-চকিত-নাজেহাল করে তা' তার শক্তিরই পরিচয় দেয়। যে নয়নচাঁদ আমাদের ঠকিয়ে সুকৌশলে দু'হাতে পয়সা লুটছিলো তাকে সে যে ভাবে প্রহার করে' শীতলা কেড়ে নেয়, তা'তে

তার মনের বলিষ্ঠতাই প্রমাণ করে। নয়নচাঁদ নিজেই বলেছে—"ভূতগুলি দেখিলাম, ভাল-মানুষ ভূত।" মিত্তির জা'র সমগ্র কাহিনীটি রূপকাত্মক। আমাদের তৎকালীন সরকার, সরকারী কর্মচারী ও জনগণের একটি চিত্র অতি সুকৌশলে রূপকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ করা। আমাদের দেশের জনগণ, যাদের লেখক পাপী-তাপী করে এঁকে, অশেষ নরক যন্ত্রণা-ভোগ করিয়েছেন তারা যে দুঃখ বরণ করেছে তা' তাদের ভুলের জন্তে, তাদের দুর্বলতার জন্তে। তারা সকলে যদি মিত্তির জার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হ'ত তবে তাদের এত দুর্দশা হ'ত না। যে যত দুর্বল, তাদের পরে অত্যাচারও ততবেশী। মিত্তির জার মত বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষ ভয় করতে বাধ্য হয়, তাই তাদের দাবীও স্বীকার করে নেয়। নয়নচাঁদ মিত্তির জার মত না হলেও ধূর্ত। তাই তাকেও সুকৌশলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ হাতে রাখতে চায়। তাই তো নারায়ণ বলেন, "ঈশ! করিয়াছ কি? সে যে ভারি জাগ্রত শীতলা! এমন কাজও করে! আর সব পাপ আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু সে শীতলা-কাডা পাপটি আমি ক্ষমা করিতে পারি না। যাও, শীঘ্র ভূত হইয়া মর্ত্যে ফিরিয়া যাও। নয়নচাঁদের শীতলাটি ফিরাইয়া দাও।" নারায়ণ যখন মিত্তির জার সমস্ত পাপটুকুকে অক্লেশে স্বীকার করে নিতে পারলেন তখন ঐ শীতলা-কাড়া পাপটিকে কেন স্বীকার করতে পারলেন না, তাও ভাববার বিষয়। আসলে নয়নচাঁদও যে ঐ মিত্তির জা শ্রেণীর লোক। সাধারণ পনেরো আনা শ্রেণীর লোকের বাইরে নয়নচাঁদ। তাই তার ব্যবসাটি তুলে দিলে আবার নতুন কি ফন্দি আঁটবে বলা যায় না, হয়তো এতে শাসন পরিচালনে অন্য কি বিপত্তির উদ্ভব হবে। এইসব ভেবেই নারায়ণ মিত্তির জাকে শীতলা ফিরিয়ে দিতে বললেন।

এই গল্পটিতে ব্যঙ্গের ভিন্নতর আর একটি দিক আছে। গল্পের ষষ্ঠ পর্বে নেই-আঁকুড়ে দাদার কাহিনীতে সেই ব্যঙ্গটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তৎকালীন সমাজে বিধবাদের উপর, যে নিষ্ঠুরতম অত্যাচার করা হত লেখক তার প্রত্যক্ষদর্শী। তাই তাঁর গল্পের অনেক স্থানেই সামাজিক এই হিংস্র মনোবৃত্তিকে ব্যঙ্গ করেছেন। একটি পুণ্যবতী নারী, যাকে মৃত্যুর পর বিষ্ণুদূত নিয়ে যাওয়ার জন্তে যমদূতের সঙ্গে মারামারি করে, তার লাঞ্ছনা, যাতনা আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়। জীবনে তার সমস্ত কর্মই পুণ্যময়। কেবল একটিমাত্র পাপ নাকি সে করেছে, একাদশীর দিন তার ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত মনে একটিমাত্র

ইচ্ছে জেগেছে। কলাগাছের সুন্দর নধর কচি পাতাটিতে পরের দিনে সে দুটি ভাত খাবে এই তার বাসনা। তার মনের এই বাসনাই তার জীবনের একটিমাত্র পাপ কার্য। নেই-আঁকুড়ে দাদার কাছে কিন্তু যমেরা জব্দ হয়ে গেছে। তার মানস-লালিত বিবিধ সৎ কর্মের সুফল যখন সে দাবী করে ও সেই পুণ্যের জোরে ভগ্নিকে উদ্ধার করতে চায় তখন যমরাজ পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যায়। আর আমরা অত্যন্ত কৌতুক-আনন্দ লাভ করি। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার শাসন, শাস্ত্রের হাস্যকর বিধান, পাপ-পুণ্যের মিথ্যা সংস্কারকে যেন নেই-আঁকুড়েদাদা তার বুদ্ধির ক্রীড়াচ্ছলে স্পষ্টতই ব্যঙ্গ করেছে।

'নয়নচাঁদের ব্যবসা' সমগ্র গল্পটি ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ রচনার মধ্যে অন্যতম সার্থক সৃষ্টি। নয়নচাঁদ তার সেই নধরকান্তিময় মৃদু মধুর হাস্যভরা মুখখানি নিয়ে চিরদিন যেন বেঁচে থাকবে, আর তার পাশাপাশি মিত্তির জা ও নেই-আঁকুড়ে দাদাকেও মনে থাকবে তবে যুগের পরিবর্তনে তাদের ছবি কিছুটা ম্লান যদিও হয়, নয়নচাঁদ চির-অমর।

কঙ্কাবতী

বাস্তবে-অবাস্তবে, কল্পনায় আর ভাবনায় মেশামেশি হয়ে, ত্রৈলোক্যনাথের "কঙ্কাবতী" উপন্যাসখানির জন্ম। তবু এ-শুধু স্বপ্ন নয়, শুধুই সম্ভব-অসম্ভবের খেয়া পার হয়ে, মনের সুখে ভেসে চলা নয়, এর অন্তরে অন্তরে আছে ব্যথা, আছে কান্না। এক মানব-দরদী শিল্পীর অস্ফুট প্রতিবাদ কখনো বা ব্যথাঘন হয়ে চরিত্রচিত্রণের ফাঁকে ফাঁকে জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর, কখনো বা হাস্যরসের সরসচিত্র হয়ে পরিণত-অপরিণত সকল মনের কাছে সমানভাবে আবেদনশীল হয়ে দেখা দিয়েছে। "কঙ্কাবতী" তাই, শুধুই কাহিনীবহুল নয়, ব্যঙ্গবহুলও।

প্রাণহীন, সংস্কার-কুটিল একটি সমাজে, যেখানে সর্বপ্রকার বাধা, শাস্তি, লাঞ্ছনা, সেখানে কিভাবে একটি ভালবাসা সফলতার পথ পেলো তাকেই অবলম্বন করে 'কঙ্কাবতী'র কাহিনী-অংশ গড়ে উঠেছে। তাই, এখানে যেমন একদিকে আছে, বেহুলার ন্যায় কঙ্কাবতীর দুঃখের ভেলায় চড়ে প্রিয়তমের সহিত মিলিত হওয়ার কঠোর সাধনা, অপরদিকে আছে, অমানবিকতা, অধর্ম, পাপ, আমাদের নানাপ্রকার দুর্বলতা, মূর্খতা, ভ্রান্তি ও ধৃষ্টতা থেকে মুক্ত করার প্রবল বাসনা। এই দ্বিতীয় বাসনা থেকেই উপন্যাসের স্থানে স্থানে নানা ধরনের ব্যঙ্গ-সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও কোথাও সে ব্যঙ্গ স্পষ্ট, কখনও বা রূপকায়িত।

কঙ্কাবতীর প্রাচীন কাহিনী সম্বন্ধে যে বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল লেখক তার মধ্যে যে ফাঁকটুকুকে দেখতে পেয়েছিলেন তাকে পূরণ করে দিতে চেয়েছিলেন। আমাদের সমাজে কখনও ভাই বোনকে বিবাহ করিতে চায় না, ভাই-বোনের সম্পর্ক এক নির্মল স্নেহের সম্পর্ক। তাই কঙ্কাবতীকে যে আম খাওয়ার তুচ্ছ অপরাধে তার ভাই বিবাহ করতে চেয়েছিল, লোকেদের এই চিরপ্রচলিত ধারণাকে আহত করে লেখক গ্রন্থারম্ভের ক্ষণে দেখাতে চাইলেন যে কঙ্কাবতী ও তার প্রেমাস্পদ ভাই-বোন নয়, তবে তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার প্রথম অংশটিতে ছিল ভাই-বোনের স্নেহময় রূপ পরে এই নিবিড়তাই অনুকূলতা প্রাপ্ত হয়ে প্রণয় ও পরিণয়ে যেন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু জনরব এই সত্যতার ধার ধারে না।

জনরবের মূল্য কতখানি তা বুঝতে পারি এ থেকেই। জনরবে সত্য-মিথ্যার ফাঁকটুকু কল্পনা দিয়ে পুরিয়ে নেওয়া হয়। তাই তাতে আসল আর নকল চিনে নেওয়া বড় বিপদ।

কাহিনী আরম্ভের পূর্বে লেখক যে কুসুমঘাটি গ্রামখানির নিপুণ বর্ণনা দিয়ে সেই গ্রাম পরিবেশটিকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন সে বর্ণনাও যথেষ্ট ব্যঙ্গাত্মক। প্রথমেই ঠেঙ্গাড়েদের প্রকৃতি ও কার্য বর্ণনা প্রসঙ্গে চৌকীদারদের কর্তব্যবোধের যে রূপ তুলে ধরেছেন তা যেমন হাস্যকর তেমনি ব্যঙ্গাত্মক। চৌকীদাররা সব সময়ে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে তৎপর, অসহায় একটি পথিকের নিরাপত্তার জন্যেই সে নিযুক্ত, কিন্তু সে যে ভাবে দুষ্ট ব্যক্তিদের দুষ্কর্মের সহায়তা করে তা' দেখলে বিস্মিত হতে হয়, একটি মৃতদেহ এক গ্রাম থেকে দশ বার ক্রোশ দূরে রাতারাতি সরে গেল অথচ দোষীকে কেউই ধরতে চেষ্টা করলো না,—এ রকম দিনের পর দিন ঘটে; তবু কোন সন্ধান হয় না, চৌকীদারদের এইরূপ কর্ম তৎপরতাকে লেখক কৌতুকচ্ছলে ব্যঙ্গ করেছেন।

তা' ছাড়া এত অপঘাত মৃত্যু যে দেশে সে দেশে অশ্বত্থ, বট, বেল প্রভৃতি গাছে যে নানাজাতের ভূত-ভূতিনীর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ঘটবে বলে লোকেদের মনে বিশ্বাস এতে আর আশ্চর্য কোথায়! এ থেকে সেই গ্রাম্য জীবনে নানারূপ কুসংস্কার, অন্ধ ধারণা। জঙ্গলে, জলে, স্থলে, পর্বতে—সর্বত্র যেন নানারূপ ভয় ওত পেতে বসে রয়েছে, একটু এমন অমন হলেই অকালে জীবনটি হারাতে হবে। মানুষের এই অন্ধ, অজ্ঞ, ভয়ার্ত মনোভাব সত্যই ব্যঙ্গের যোগ্য। তাই গল্পের প্রথমে লেখক সেই গ্রাম্য পরিবেশ ও গ্রাম্য-মানসিকতার একটা সাধারণ ছবি স্কেচ করে তাদের মৃদু ব্যঙ্গ করেছেন। এদেরই মধ্যে দু'একজন আবার নগরজীবনে এসে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সামান্য একটু ছোঁয়া পেয়ে, ইংরেজী পড়ে, প্রায় নাস্তিক হয়ে উঠেছে। তারাও ব্যঙ্গের যোগ্য।

কঙ্কাবতী উপন্যাসে স্পষ্ট দুইটি বিভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগে তনু রায় ও শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দুইটি পৃথক পরিবারের পাশাপাশি পাড়ার ও সমাজের আরও কয়েকজন ব্যক্তি, আর দ্বিতীয় ভাগটিতে আছে কঙ্কাবতীর অবচেতন মনের স্বপ্নবিলাস এবং পরিশেষ খণ্ড। প্রথম ভাগের ব্যঙ্গাত্মক চরিত্ররূপে যিনি সর্বপ্রথম আমাদের সামনে দেখা দেন তিনি তনু রায়।

লেখকের ভাষাতেই তাঁর কিছু পরিচয় প্রদান করা দরকার। তা' না হ'লে তনু রায়ের মত ব্রাহ্মণকে সহজে চেনা যাবে না। "ইনি ব্রাহ্মণ, বয়স হইয়াছে, ব্রাহ্মণের যাহা কিছু কর্তব্য, তাহা ইনি যথাবিধি করিয়া থাকেন। ত্রিসন্ধ্যা করেন, দেব-গুরুকে ভক্তি করেন, দলাদলি লইয়া আন্দোলন করেন। এখনকার লোকে ভাল করিয়া ধর্ম-কর্ম করে না বলিয়া রায় মহাশয়ের মনে বড রাগ। তিনি বলেন,—'আজকালের সব নাস্তিক, ইহাদের হাতে জল খাইতে নাই।'..... শাস্ত্র অনুসারে সকল কাজ করেন দেখিয়া তনু রায়ের প্রতি লোকের বড ভক্তি।... তিনি নিজে বংশজ ব্রাহ্মণ। তাই তিনি বলেন,—বিধাতা যখন আমাকে বংশজ করিয়াছেন, তখন বংশজের ধর্মটি আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। যদি না করি, তাহা হইলে বিধাতার অপমান করা হইবে।" .....কুলীন ও বংশজের যে রীতিগুলি আছে তার উপরে তনু রায়ের প্রগাঢ় ভক্তি। এই জন্য প্রথমেই আমাদের বংশজ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা প্রয়োজন। বংশজের ধর্ম হচ্ছে কন্যা দান করে পাত্রের নিকট হতে কিঞ্চিৎ ধন গ্রহণ করা। তনু রায় ধর্ম রক্ষার্থে এই বিধানটি অতি সযত্নে পালন করেন। এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই তাঁর কলহ হয়। অবশ্য এ কলহে পত্নীকে তিনি সর্বদাই আয়ত্বে রাখতে সমর্থ হন কেননা, তাঁর নিজের বিবাহের সময়েও এই টাকা সংগ্রহ ব্যাপার নিয়ে বিশেষ গোলযোগ উৎপন্ন হয়। কন্যার পিতা সেসময়ে প্রথমে পাঁচ শত টাকায় বিবাহ কার্য সমাধা করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে পাত্রের অধিক বয়স হয়েছে জেনে আরও একশত টাকা নগদ চাইলেন, শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ টাকায় কমিয়ে তনু রায়ের বিবাহ-পর্ব সমাধা হয়। এখানে আর একটি মজার কথা না উল্লেখ করলে তনু রায়ের সৌখিন মেজাজকে চিনতে পারিনা। বাসর-ঘরে গাইবেন বলে তিনি অনেকগুলি গান শিখেছিলেন, কিন্তু এত সাধের গানগুলি বিবাহ-বাসরে আর গাওয়া হয়ে ওঠেনি, কেননা, টাকা পয়সা হিসাব কসতে কসতে রাত্রি প্রভাত হয়ে গিয়েছিল, বাসর হয়নি। তনু রায়ের এ-হেন ব্যর্থতায় আমরা কৌতুক উপভোগ না করে পারিনা। সে যাই হোক, স্ত্রীর সঙ্গে কলহে তনু রায় সর্বদাই তাঁদের বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে স্ত্রীকে জব্দ করে দিতেন। তাঁর একমাত্র পুত্রও স্বভাব-ধর্মে পিতার ন্যায় ছিল। অত্যন্ত নীচ, আর হৃদয়হীন। তনু রায়ের তিনটি কন্যা। এই তিন কন্যার উপরে তাঁর ব্যবহার, থেকেই

তাঁর আসল পরিচয় আমরা পাই। "কুল-ধর্ম রক্ষা করিয়া দুইটি কন্যাকে তিনি সুপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। জামাতারা তনু রায়ের সম্মান রাখিয়াছিলেন। কেহ পাঁচশত, কেহ হাজার নগদ গণিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই সুপাত্র বলিতে হইবে।" জামাতাদের বয়সের কথা বললে, তনু রায় সকলকে বুঝিয়ে বলতেন, "ওগো, তোমরা জাননা, জামাইয়ের বয়স একটু পাকা হইলে, মেয়ের আদর হয়।" তনু রায়ের এই কথা ও ব্যবহারই তাঁর স্বভাবকে আলোকিত করে। নিজের অর্থলোভ, আর হৃদয়হীনতাকে তিনি শাস্ত্রের নামে চাপা দিয়ে রাখতে লজ্জাবোধ করেন না। তাঁর জামাতাদের বয়সের হিসাব লইলে আমরা বেশ বুঝতে পারি যে তনু রায় কতদূর নিষ্ঠুর ছিলেন। তাদের একজনের বয়স হয়েছিল সত্তর বছর, আর একজনের বয়স পঁচাত্তর বছর, এবং দুজনেই বিবাহের বছর না ঘুরতে ঘুরতে এ সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে যায়। আর তাদের বালিকাবধূগণ সারা জীবন ধরে সেই অমর্তবাসী পতিদেবতার পদচিহ্ন স্মরণ করে বৈধব্যের নিদারুণ জ্বালাকে সতীত্বের নামে বরণ করে নেয়। অবশ্য তনু রায় বলেন, "বিধাতার ভবিতব্য, কে খণ্ডাতে পারে।" আবার কখনও বা সহমরণ প্রথা নেই বলে খেদ করেন। তনু রায়ের এই অর্থ-লোলুপতা, নির্দয়তাকে লেখক কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। অথচ তাদেরই প্রতাপ ঘরে ঘরে। একদিক অসহায় বালিকাদের করুণ বিষাদময় মুখ, অপরদিকে পিতৃহৃদয়ের অমানবিক নিষ্ঠুরতা, এই দুইএর তলায় পড়ে ত্রৈলোক্যনাথের অন্তর যেন ব্যথায় টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে যেতে চাইত। প্রতিবাদ করবার সাধ্য প্রায় নেই বললেই হয়। তাই তো তিনি তার রচনার মধ্যে তনু রায়ের মত চরিত্রগুলোকে এঁকে তুললেন। "ফোকলা দিগম্বরের" রসময় চরিত্রে এরই কিছু আভাস মেলে। কিন্তু তনু রায় যেন আরও কঠিন, আরও পাষাণ।

লেখক তনু রায়ের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন যে তনু রায় শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ। কিন্তু পাড়ার জনার্দন চৌধুরীর বাটীতে একবার তিনি শাস্ত্র বিচার করাতে গিয়ে কি বিভ্রাটে পড়েছিলেন সে ছবিটি আমরা স্মরণ করতে পারি। জমিদার গৃহে তখন পাড়ার দুইজন পণ্ডিতই উপস্থিত। "তনু রায় বলিলেন,—কন্যাদান করিয়া বংশজ কিঞ্চিৎ সম্মান গ্রহণ করিবে। শাস্ত্রে ইহার বিধি আছে।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ শাস্ত্রে আছে?"

গোবর্ধন চুপি চুপি বলিলেন,—"বল না? মহাভারতে আছে!"

তনু রায় তাহা শুনিতে পাইলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"দাতা-কর্ণে আছে।" তনু রায়ের এ-ধরনের উক্তিতে আর বুঝতে বাকী থাকে না যে তিনি কত বড় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। কিন্তু তিনি কিছুতেই নিজের ভুল ও অপরাধকে স্বীকার করতে চান না, না অন্তরে, না বাইরে। তাই তো তিনি সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে রেগে যান। প্রকৃত যে ধার্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁর উপরে তনু রায়ের অন্তরের একান্ত আক্রোশ। তিনি নিরঞ্জনকে কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। "আর তাঁর প্রতি নানা কটু কথা প্রয়োগ করিয়া অবশেষে বলিলেন, আমি—শাস্ত্র পড়ি নাই? ভাল! কিসের জন্য আমি পরের শাস্ত্র পড়িব? যদি মনে করি, তো আমি নিজে কত শাস্ত্র করিতে পারি। যে নিজে শাস্ত্র করিতে পারে, সে পরের শাস্ত্র কেন পড়িবে?" শাস্ত্রজ্ঞান শূন্য হলে কি হবে, সমাজে চিরদিনই তনু রায়ের মত লোকদেরই জয় হয়। আর নিরঞ্জনদের পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়। এ জগতে সত্যের মূল্য সামান্যই। যদি তা' না হবে তবে নিরঞ্জন এর এত দুঃখ কেন, আর গোবর্ধন-এর বা এত প্রতিষ্ঠা কেন! নিরঞ্জন প্রসঙ্গে লেখক ব্যঙ্গচ্ছলে বলেছেন, "লোকের কাছে আপনার বিদ্যার পরিচয় দিতে ইনি ভালবাসেন না। তাই জগৎ জুড়িয়া ইহার নাম হয় নাই।" এই নিরঞ্জন সত্যকারের পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তি। মনে অবিচল শক্তি আর সাহস তাঁর। কিন্তু সাধারণে তাঁকে চেনে না, বা বুঝে না। তাঁর সেই অসীম শক্তি কখনও কোন অন্যায়, অধর্মের সামনে এসে বিচলিত হয় না, হারিয়ে যায় না। জমিদার জনার্দন চৌধুরীর এ কথা জানা ছিল না। তাই বেলা দুই প্রহরে তাঁর পেয়াদা নিরঞ্জনের দ্বারে, গেলেও জমিদারের জোর জুলুমকে নিরঞ্জন কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারে না। নিম্নের ছবিটিতে নিরঞ্জনের নির্ভিক মনের পরিচয় অতি স্পষ্ট,—

"গ্রামের জমিদার, জনার্দন চৌধুরীর সহিত ভূমি লইয়া কিছু গোলমাল হয়। একদিন দুই প্রহরের সময় জমিদার একজন পেয়াদা পাঠাইয়া দেন।

পেয়াদা আসিয়া নিরঞ্জনকে বলে,—"ঠাকুর! চৌধুরী মহাশয় তোমাকে ডাকিতেছেন, চল!"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"আমার আহার প্রস্তুত, আমি আহার করিতে যাইতেছি। আহার হইলে জমিদার মহাশয়ের নিকট যাইব।..."

পেয়াদা বলিল,—"তাহা হইবে না, তোমাকে এইক্ষণেই যাইতে হইবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, ঠাঁই হইয়াছে, ভাত প্রস্তুত, ভাত দুইটি মুখে দিয়া, চল, যাইতেছি। কারণ, আমি আহার না করিলে গৃহিণী আহার করিবে না, ছাত্রগণেরও আহার হইবে না। সকলেই উপবাসী থাকিবে।"

পেয়াদা বলিল,—"তাহা হইবে না, তোমাকে এইক্ষণেই যাইতে হইবে।" পেয়াদার এই পীড়াপীড়িতে নিরঞ্জন সেই সময়েই জমিদারের কাছে গেলেন বটে, কিন্তু কিছু বিলম্ব ঘটেছিল। এর পরে জমিদার যখন নিরঞ্জনের পাঁচ বিঘা ব্রহ্মোত্তরভূমি অন্যায়ভাবে দখলে নিতে চাইলেন এবং তাতে নিরঞ্জন সমগ্র দলিলখানি ইচ্ছে করে পুড়িয়ে ফেললেন তখন জমিদার কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লেন। কেননা স্বেচ্ছায় এভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করবার মত শক্তি যে মানুষের থাকতে পারে এ সত্য এতদিন তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। নিরঞ্জন যে ধনে ধনী হয়ে, ধনী, নির্ধন, রাজা, পেয়াদা—সকলকে এক করে নেওয়ার শক্তি অর্জন করেছিলেন জনার্দন শ্রেণীর লোকের কাছে তা' যেন এক পরিপূর্ণ বিস্ময়। নিরঞ্জন তার সর্বস্ব ত্যাগ করে যে মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তার জন্যে তাঁকে সেদিন হতে অশেষ দুঃখ বরণ করে নিতে হয়েছে। তবু তাঁর নির্ভিকতা, তাঁর ত্যাগ, তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য,—এক কথায় সমগ্র চরিত্রখানি যেন ঐ জনার্দন চৌধুরী, তনু রায়, গোবর্ধন শিরোমণি প্রভৃতি চরিত্রকে এক তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করতে থাকে। নিরঞ্জন নিঃস্ব, রিক্ত হলেও অন্তরে ঐশ্বর্যশালী, আর তারই আশে পাশে যারা রয়েছে তারা নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তির উচ্চ বেদীতে বসেও নিরঞ্জনের কাছে ব্যঙ্গের, অবজ্ঞার পাত্র।

তনু রায় ও তাঁর চার পাশের মানুষগুলোকে দেখবার পরে আমাদের ঐ কুসুমঘাটি গ্রামের আর একটি পরিবারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। কেননা এই পরিবারটি উপন্যাসের কাহিনীর সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই পরিবারের কথা পরে উল্লেখ করলাম। কেননা এই পরিবারটির প্রত্যেকে অতি সৎ, ধার্মিক, তাই ব্যঙ্গের পাত্র এঁরা নন্। এই পরিবারের কর্তাকে আমরা দেখতে পাই না, শুধু তাঁর গুণপনার কথা শুনি। কর্তার নাম শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তিনি শিক্ষিত ও কলকাতার চাকুরীজীবী ছিলেন। কিন্তু সঞ্চয় কিছুই করেন নি। একমাত্র পুত্র ক্ষেত্র ওরফে খেতুর জন্মও তাঁকে হিসাবী, সঞ্চয়ী করতে পারেনি। লেখক করুণ ব্যঙ্গভরে তাই বললেন,

"মানস হইল বটে, কিন্তু কার্যে পরিণত হইল না। পৃথিবী অতি দুঃখময়, এ দুঃখ যিনি নিজ দুঃখ বলিয়া ভাবেন, চিরকাল তাহাকে দরিদ্র থাকিতে হয়।" শিবচন্দ্রের মৃত্যুর পর হতে তাই খেতু ও তার মাকে কঠিন দারিদ্র্যের পথ দিয়ে চলতে হয়। কিন্তু দরিদ্র হলেও, স্বভাব ধর্মে এঁরা অতি মহৎ ছিলেন। তাঁদের ধর্মবোধ, ন্যায়বোধ, ও মানবিকতার কাছে সেই সমাজের অন্য পাঁচজনের অধর্ম চিন্তা, অন্যায় পন্থার অতি প্রাবল্যকে দেখিয়ে লেখক তাদের অতি ছোট করে চেয়েছেন। খেতুর মায়ের দু'একটি কথা বিশেষ লক্ষণীয়। রামহরি তাঁকে বললেন যে খেতুকে তিনি কলকাতায় লইয়া গিয়া লেখাপড়া শিখাবেন। মথুর চক্রবর্তীর ছেলে ষাঁড়েশ্বরকে তিনি স্কুলে পড়িয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, সে এখন উকীল হয়েছে, বড়লোক হয়েছে। এই কথার উত্তরে খেতুর মা বললেন,—

"চুপ কর। কলিকাতায় লেখা-পড়া শিখিয়া যদি ষাঁড়েশ্বরের মত হয়, তাহা হইলে আমার খেতুর লেখাপড়া শিখান কাজ নাই।" খেতুর মায়ের কাছে চরিত্র গঠন, মনের উন্নতি সাধনই বিদ্যা অর্জনের, বা শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। যে লেখাপড়া চরিত্রকে সংযম শেখায় না, মনকে উদার, উন্নত করে না তা' মূল্যহীন। এখানে এই সামান্য একটি উক্তি স্পষ্টতই মূল্যবান ও ব্যঙ্গাত্মক। লেখাপড়া জানা, মদ্যপায়ী, অসৎ চরিত্র ব্যক্তিকেই এখানে আঘাত করা হয়েছে।

খেতু ও খেতুর মাকে গল্পের মধ্যে এনে একদিকে যেমন সৎ, স্বাভাবিক, সুন্দর একটি গৃহকোণের ছবি পরিস্ফুট করেছেন, মাতা ও পুত্রের পরম নিবিড় স্নেহচ্ছায়াতে দরিদ্রের দীন কুটীরও এক অপূর্ব সৌন্দর্য লালিত্য লাভ করেছে, আর অপরদিকে খেতু ও কঙ্কাবতীর মধ্যে এক অজানিত গভীর ভালবাসার জন্ম হয়েছে, যে ভালবাসার পূর্ণতার পথে প্রতিবন্ধকরূপে গোবর্ধন শিরোমণি, জনার্দন চক্রবর্তী, তনু রায়, ষাড়েশ্বর ইত্যাদির মত সমাজ পরিচালকবৃন্দ চক্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু লেখক দেখাতে চেয়েছেন যা সত্য তা' চির-অম্লান। তাই কাহিনীর মিলনান্তক সমাপ্তি ঘটেছে। সত্য ও ধর্মের অবিচলিত পথে যাদের গতিবিধি তাদের জয় সুনিশ্চিত। খেতু, খেতুর মা, কঙ্কাবতী, তাঁর মা ইত্যাদি চরিত্র প্রকৃত সৎ চরিত্র। তাই গল্পের বিস্তৃত পরিবেশে এঁদের স্থান থাকলেও, এঁরা ব্যঙ্গের পাত্র নন। এই আলোচনায় তাঁদের কথা বলায় অবসর অতি সামান্যই। তবে লেখকের

এইটুকু দেখানো হয়তো উদ্দেশ্য হতে পারে যে, প্রকৃত সৎ যিনি, তাঁর মূল্য অতি সামান্য, অপমান আর অবহেলায় তাঁদের জীবন লাঞ্ছিত, দুঃখ আর দারিদ্রে তাঁদের পৃথিবী মসীলিপ্ত। তবু লেখক এঁদেরই শ্রদ্ধা করেন, আর সকলকে এঁদের মত প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে প্রণোদিত করেন।

কঙ্কাবতীর বিবাহ-সমস্যা লইয়া তনু রায় উপন্যাসের মধ্যে বারবার এসেছেন। আর তাঁকে আমরা যত দেখি, ততই যেন তিনি আমাদের কাছে হাস্যকর অপদার্থ জীব বলে পরিচিত হন, যিনি জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা, প্রেম-ভালবাসা, চাওয়া-পাওয়া—সব কিছুকে অর্থের কষ্টিপাথরে যাচাই করেন। খেতু কঙ্কাবতীকে লেখাপড়া শেখাতে চাইল। কঙ্কাবতীর মা এই সংবাদ তনু রায়ের কাছে জানালেন, এবং সম্মতি প্রার্থনা করলেন। এতে তনু রায় বলিলেন, "স্ত্রীলোকের আবার লেখাপড়া কেন? লেখাপড়া শিখিয়া আর কাজ নাই।" না বুঝিয়া তনু রায় এই কথাটি বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যখন তিনি স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে, লেখাপড়ার অনেক গুণ আছে।

আজকালের বরেরা শিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করিতে ভালবাসে। এরূপ কন্যার আদর হয়, মূল্যও অধিক হয়। লেখাপড়ার গুণ অনেক তা' আমাদের জানা থাকলেও, তনু রায়ের মত বিশেষভাবে জানিনা, বিবাহের বাজারে কন্যার মূল্য অনেক হবে, এই কথা চিন্তা করেই তনু রায় কঙ্কাবতীর লেখাপড়ার অনুমোদন করলেন। নিজের অর্থাগমের পথটিকে উর্বরতর করবার বাসনাতেই তনু রায় এমন একটা নিষিদ্ধ কাজকে মেনে নিলেন।

এবার তনু রায় যেভাবে শাস্ত্রবিচার করেন তা' যথেষ্ট হাস্যবহুল। আগেই বলেছি তনু রায় তাঁর সমগ্র কার্যকে শাস্ত্র দ্বারা বিচার করেই সম্পন্ন করেন। তাঁর কাজে কোথাও ফাঁকি নেই। তাঁর শাস্ত্র-বিশ্লেষণ পদ্ধতিটিকে আর একবার দেখতে পাই এবং তার অসঙ্গতি, ও মিথ্যাকে দেখাবার জন্যে সে-অংশ উদ্ধৃত হ'ল ;—

"তবে কথা এই—কাজটি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না? শাস্ত্র-সম্মত না হইলে তনু রায় কখনই মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে দিবেন না। মনে মনে তনু রায় শাস্ত্রবিচার করিতে লাগিলেন।

বিচার করিয়া দেখিলেন যে, স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বটে, তবে এ নিষেধটি সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের নিমিত্ত, কলিকালের জন্য নয়।

পূর্বকালে যাহা করিতেছিল, এখন তাহা করিতে নাই। তাহার দৃষ্টান্ত নরমেধ যজ্ঞ।……আর এক দৃষ্টান্ত,—সমুদ্রযাত্রা এখন করিলে জাত যায়।

তাই তনু রায়ের মা যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি একবার সাগর যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তনু রায় কিছুতেই পাঠান নাই। মাকে তিনি বুঝাইয়া বলিলেন,—মা! সাগর যাইতে নাই। সমুদ্র-যাত্রা একেবারে নিষিদ্ধ। শাস্ত্রের সঙ্গে আর সমুদ্রের সঙ্গে ঘোরতর আড়ি। সমুদ্র দেখিলে পাপ, সমুদ্র ছুঁইলে পাপ। কেন মা পয়সা খরচ করিয়া পাপের ভার কিনিয়া আনিবে? কেন মা জাতি-কুল বিসর্জন দিয়া আসিবে?

এক্ষণে তনু রায় বিচার করিয়া দেখিলেন যে, পূর্বকালে যাহা করিতে ছিল, এখন তাহা করিতে নাই। সুতরাং পূর্বকালে যাহা করিতে মানা ছিল, এখন তাহা লোকে স্বচ্ছন্দে করিতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের লেখা-পড়া শিক্ষা করা পূর্বে মানা ছিল, তাই এখন তাহাতে কোনও রূপ দোষ হইতে পারে না।" এমনি করে শাস্ত্রটিকে ভেঙ্গেচুরে গড়ে নিতে তনু রায়ের একটুও বাধতো না। তনু রায়ের স্বভাব ও ভ্রান্তশাস্ত্র চেতনাকে এখানে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন।

সাধারণ লোকের বুদ্ধিহীনতা, যুক্তিহীনতা, অসহায়ত্বের সুযোগে তনু রায় শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নিজের ব্যবসাটি বেশ চালু করে রাখতে চেয়েছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা-বিবাহের বিধি শাস্ত্রে আছে বলেছিলেন তনু রায় তখন সেই মতটিকে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন, কেননা তাঁর ঘরে যে দু'টি স্বল্পবয়স্ক বিধবা কন্যা ছিল। এ সময়ে তিনি যে কথা বলেন তা'ও হাস্যকর। তিনি বললেন, "শাস্ত্র অমান্য করা ঘোর পাপের কথা। দুইবার কেন? বিধবাদিগের দশবার বিবাহ দিলেও কোন দোষ নাই, বরং পুণ্য আছে। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশ ঘোর কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, এ দেশের আর মঙ্গল নাই।" সে যাই হোক, তনু রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কঙ্কাবতীর বিবাহটিতে যাতে কোন দিক থেকে ক্ষতি না হয় তনু রায় প্রথম থেকেই তার হিসাব করতে লাগলেন। প্রথমে তাঁর স্ত্রীর কথামত তনু রায় খেতুর সঙ্গেই কঙ্কাবতীর বিবাহ দেবেন বলে মত দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, খেতু এখন দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু সে যথেষ্ট ধন উপার্জন করতে পারে। তাঁকে বিবাহের সময় খেতু হয়তো বিশেষ কিছুই দিতে পারবে না। কিন্তু পরে খেতুর অবস্থা ভাল হ'লে মাসে মাসে খেতুর কাছ থেকে কিছু কিছু নিতে পারবেন। কিন্তু এই মত পরে তনু রায় বদলিয়ে ফেলেন। জমিদার জনার্দন চৌধুরী যখন তার নব-বিবাহিত স্ত্রীকে

দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ, একখানি তালুক, গা-ভরা গহনা, আর কন্যার পিতাকে দু' হাজার নগদ টাকা দিতে সংকল্প করলেন, তখন তনু রায় ও তাঁর পুত্র স্থির থাকতে পারলেন না। কঙ্কাবতীর সঙ্গে জনার্দনের বিবাহ পাকা করে ফেললেন। জনার্দন জমিদার, এবং অত্যাচারী এটুকুই তাঁর সবটুকু পরিচয় নয়। তার রূপটাও আমাদের একবার দেখা দরকার। "বৃদ্ধ হইলে কি হয়? জনার্দন চৌধুরীব শ্রী-ছাঁদ আছে, প্রাণে সখও আছে। দুর্লভ পঞ্চ-মুখী রুদ্রাক্ষের মাল্য দ্বারা গলদেশ তাঁহার সুশোভিত থাকে। কফের ধাত বলিয়া শৈত্য নিবারণের জন্য চুড়াদার টুপি মস্তকে তাঁহার দিন-রাত্রি বিরাজ করে। এইরূপ বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া নিভৃতে বসিয়া যখন তিনি গোবর্ধন শিরোমণির সহিত বিবাহ-বিষয়ে পরামর্শ করেন, তখন তাঁহার রূপ দেখিয়া ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণকেও লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়।" এখানে রূপবর্ণনার মধ্যে দিয়ে একই সঙ্গে হাস্যরস ও ব্যঙ্গ সুন্দররূপে চিত্রিত হয়েছে। আরও একটু অগ্রসর হইলে এই বৃদ্ধের যেরূপ দুর্গতি ও ক্রোধ দেখি তা'ও যথেষ্ট হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক। খেতু জনার্দন চৌধুরীর সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিবাহ শুনে ক্রোধে, দুঃখে অধীর হয়ে জনার্দনের নিকটে গিয়ে প্রথমে বিনয় সহকারে সেই বিবাহ, করতে নিষেধ করল। কিন্তু জনার্দন হেসেই সে কথা উড়িয়ে দিতে চাইল। খেতু তখন রাগে তাঁকে দু'একবার বৃদ্ধ বলেছিল। জনার্দন এই সম্বোধনে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। রাগে থর থর করে কাঁপতে কাপতে থপ থপ করে ঘন ঘন কাশতে কাশতে যখন তিনি বললেন,—"ছোঁড়ার কি আস্পর্ধা! আমাকে কি না বুড়ো বলে!"

গোবর্ধন শিরোমণি বললেন—"না না। আপনি বৃদ্ধ কেন হইবেন? আপনাকে যে বুড়ো বলে, সে নিজে বুড়ো।"—এখানে জনার্দনের এই দুর্গতিতে আমরা কিছুতেই হাস্য সংবরণ করতে পারি না, আর স্পষ্টই বুঝি লেখক এখানে বৃদ্ধের বিবাহ-লিপ্সা, গোবর্ধনের মোসাহেবীয়ানা, ষাঁড়েশ্বরের ভণ্ডামিকে তীব্র ব্যঙ্গ করতে চান। এই ব্যঙ্গজনিত তীক্ষ্ণ ক্রোধে যেন লেখকের সমগ্র অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই তিনি সমাজের ঐ সব হীনমনা, মিথ্যাবাদী, অসৎ চরিত্রের মুখোসটি আরও খুলতে চাইলেন। খেতু জনার্দনের গৃহ থেকে চলে গেলে ষাঁড়েশ্বর বললেন, "হয় তো ছোকরা মদ খাইয়া আসিয়াছিল। চক্ষু দুইটি যেন জবা-ফুলের মত, দেখিতে পান নাই?" নিরঞ্জন এই উক্তির প্রতিবাদ করলে ষাঁড়েশ্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বলে যে, সে

তার নামে মানহানির মামলা করবে। কিন্তু এ কথা তার বলা সাজে না। কেননা খেতু কলিকাতায় থাকবার সময়ে একবার ষাঁড়েশ্বরের সান্ধ্য হরি-সংকীর্তনের আসরে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছিল যে সেখানে হিন্দুধর্মের নামে ঐ ধর্মের কিরূপ অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, বা উপহাস করা হয়, আর মদ্য ও মাংসে সকলে কিরূপ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এই সত্যটি নিরঞ্জনও শুনেছিলেন এজন্যেই বোধহয় ষাঁড়েশ্বর রেগে উঠেছিল। কেননা নিরঞ্জন বলেছিলেন, "কে মদ মুরগী খায়, তা' সকলেই জানে পরের নামে মিথ্যা অপবাদ দিও না।" আসল রূপকে প্রকাশ করে দিলে সকলের রাগ হয়। জনার্দন রেগেছিলেন, এখন ষাঁড়েশ্বরও রেগে গেল। মানুষের স্বভাবের এ এক হাস্যকর দুর্বলতা। আমরা সবাই যেন যে যা তাকে গোপনে রেখে, যা নই তাকেই প্রকাশ করে বেড়াতে চাই। আর সেই মিথ্যা যখন ধরা পড়ে যায়, তখনই রেগে উঠি, হাস্যকর হয়ে পড়ি। গোবর্ধন শিরোমণির জীবনেরও অনেক নিষ্ঠুরতম কর্ম আছে, যেগুলি জনার্দন ও অন্যান্য সকলে জানতো না। লেখক গদাধর চরিত্রকে এনে তাকে ফাঁস করে দিয়েছেন। আর তাতে শিরোমণি বেশ অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন। গদাধর সাদাসিদে গ্রাম্য মানুষটি, নিজের দোষ, নিজের ত্রুটীগুলিকে তাই সে প্রকাশ করে কৃতকর্মের জন্যে লজ্জা পায়, দুঃখ পায়। কিন্তু শিরোমণি শ্রেণীর লোকে লজ্জা তো পায়ই না, বরং ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। একবার এক ঠেঙ্গাড়ের প্রহারে জর্জরিত হয়ে প্রাণভয়ে আকুল হয়ে ব্রাহ্মণ শিরোমণির গৃহে আশ্রয়ের জন্য ঢুকে পড়েছিলেন। এতে শিরোমণি বললেন, "জীবন ক্ষণভঙ্গুর। পদ্ম-পত্রের উপর জলের ন্যায়। সে জীবনের জন্য এত কাতর কেন বাপু?"—এই বলে ব্রাহ্মণকে পাঁজা করে বাড়ীর বাইরে দিয়ে, ঝনাৎ করে বাড়ীর দ্বারটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অবশ্য এ কাজের জন্যে শিরোমণি ঐ ঠেঙ্গাড়েদের নিকট হতে একজোড়া ভাল গরদের কাপড় লাভ করেছিলেন। এমন সে নিষ্ঠুর, ধর্মশূন্য শিরোমণি, তাঁর মুখে যখন ধর্ম-অধর্মের বিচার প্রসঙ্গ শুনি তখন তা' চরম হাস্যকরতায় ভরে যায়। দু'একটি নিয়ে তুলে দেওয়া হল, যেখানে লেখকের ব্যঙ্গাত্মক মনটি অতি প্রখর হয়ে উঠ্‌তে দেখি,—

"গোবর্ধন শিরোমণি বলিলেন,—'ক্ষেত্রচন্দ্র মদ খান, কি না খান, তাহা আমি জানি না। তবে তিনি যে যবনের জল খান, তাহা জানি। সেই যাহাকে বলে 'বরখ', সাহেবেরা কলে যাহা প্রস্তুত করেন, ক্ষেত্রচন্দ্র সেই বরখ খান।

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—সর্বনাশ! বরফ খায়? গোরক্ত দিয়া সাহেবরা যাহা

প্রস্তুত করেন? এবার দেখিতেছি, সকলের ধর্মটি একেবারে লোপ হইল। হায়, হায়! পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম একেবারে লোপ হইল।"

হিন্দুধর্ম যদি লোপ পায়ই তা' খেতুর মত লোকেদের জন্যে যাবে না, যাবে ঐ শিরোমণি ও ষাঁড়েশ্বর শ্রেণীর চরিত্রহীন, ধর্মশূন্য লোকগুলোর জন্যেই—এ মনোভাবই যেন এখানে সুব্যক্ত। তা' ছাড়া, ধর্ম কি এমনই নরম কিছু, যা' অনায়াসে লোপ পেতে পারে—এদিকটাও ভাবা দরকার। আসলে এখানে সবটুকুই ব্যঙ্গ, তৎকালীন সমাজের প্রতি ক্রোধ ছাড়া আর কিছু নয়।

"কঙ্কাবতী"র দ্বিতীয়ভাগ স্বপ্নময় জগতের সৃষ্টিছাড়া উপকথা হলেও, সংস্কারকে, বাস্তবকে অবলম্বন করে, কঙ্কাবতীর অবচেতন মনোজগৎ যেন কোন সত্যেরই ছবি দেখে চলেছে। কঙ্কাবতীর অবচেতন মন চেতন মনেরই ছায়া অবলম্বনে গঠিত। তাই সমস্ত জগৎ সম্বন্ধে তার যে ধারণা গড়ে উঠেছিল তারই পরে ভিত্তি করেই কঙ্কাবতীর স্বপ্নজগতের বিচিত্র লীলাবিলাস। তাই এখানেও বেঁচে আছে তার বাবা, মা, ভাইবোনের পৃথক পৃথক স্বভাব নিষ্ঠুর, কুসংস্কারভরা গ্রাম্য সমাজ। সুতরাং স্বপ্ন হলেও, এখানেও ব্যঙ্গ আছে। রূপকের আশ্রয়ে ব্যঙ্গের প্রকাশ এখানে যেভাবে ঘটেছে, রূপকহীন হলে হয়ত তারা ততখানি সুপরিস্ফুট হ'ত না। লেখক তাই বোধহয় আমাদের মনুষ্য-জগৎকে ছাড়িয়ে, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গের জগতের সঙ্গে পরিচিত করে তুললেন, এমন কি প্রচলিত সংস্কারকে অবলম্বন করে আমরা চাঁদের দেশে গিয়ে চাঁদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ করে এলাম। তবে মনে রাখা দরকার ব্যঙ্গ-শিল্পীর প্রায় সমস্ত কাজই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এখানেও সেকথার সত্যকে দেখতে পাই। কঙ্কাবতীর দুঃখ বর্ণনার অন্তরে অন্তরে ব্যঙ্গধারাটি তাই অবিচলিত।

কঙ্কাবতীর জলে ডুবে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে, পুনরায় খেতুর সঙ্গে দেখা হওয়া ও স্বগৃহে ফিরে আসা—এই দীর্ঘ সময় পরে আমরা আবার তনু রায়কে দেখতে পাই, এখন তনু রায়ের পূর্ব স্বভাব যথারীতি থাকলেও, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনের তেজ যেন স্বভাবতই কিছু কমে এসেছে। পূর্বে তাঁর স্ত্রীকে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হত, এখন তনু রায়ই যেন স্ত্রীকে কিছুটা ভয় করেন। কঙ্কাবতী খেতুর কথা মত গৃহে ফিরে এলেন, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারছেন না, ভয়ে, দুঃখে, বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন, এমন সময়ে তনু রায় ও তার পুত্র সেখানে এলেন ও তাকে লাঞ্ছিত করে দূরে সরিয়ে দিতে

চাইলেন। কিন্তু কঙ্কাবতীর মা ও ভগ্নীরা এসে পড়াতে তনু রায়ের সুর নেমে যায়, মত বদলিয়ে যায়। লেখক বলেছেন, "স্ত্রীর এইরূপ উগ্র মূর্তি দেখিয়া তনু রায় ভাবিলেন,—'ঘোর বিপদ্।' নানারূপ মিষ্ট বচন বলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।……তনু রায় বৃদ্ধ হইয়াছেন। স্ত্রীকে এখন তিনি ভয় করেন, এখন স্ত্রীকে যা-ইচ্ছা তাই বলিতে বড় সাহস করেন না।"—এই যে তনু রায়ের শঙ্কিতভাব এর মধ্যে দিয়ে যেন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ফুটে ওঠে। একটা প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তি, যখন অসহায়ভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একজনের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয় তখন প্রবল অসঙ্গতিতে আমরা চমকিত হই, কিন্তু দাম্পত্যের রীতিই এমনিই। তবু স্বভাবের এই অসঙ্গতি হাসায়, তনু রায়ের ভয়ার্ত ভাব তাই হাস্যরস সৃষ্টি করে।

বাঘের সামনে এসে তনু রায়ের এই ভয়ার্তভাব আরও বর্ধিত হয়। তাঁর এই হতবাক্ অবস্থায় আমরা বেশ কৌতুক উপভোগ করি। কিন্তু তনু রায় অতি কঠোর প্রকৃতির লোক। মানুষ যত বিপদেই পড়ুক না কেন তার স্বভাব-প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারে না। তনু রায়ও পারেন নি। বাঘের মুখে কন্যার বিবাহ-প্রার্থনা শুনেও তিনি তাঁর ব্যবসাটি ভুলতে পারেন না। এ সময় তনু রায়ের কথাগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, হাস্যকর ও ব্যঙ্গাত্মক। তাই ব্যাঘ্র ও তনু রায়ের কথোপকথনটি উদ্ধৃত করা হল।

তনু রায় বলিলেন,—"যখন কথা দিয়াছি, তখন অবশ্যই আপনার সহিত আমি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিব। আমার কথার নড়-চড় নাই। মুখ হইতে একব্যর কথা বাহির করিলে, সে কথা আর আমি কখনও অন্যথা করি না। তবে আমার নিয়ম তো জানেন? আমার কুল-ধর্ম রক্ষা করিয়া যদি আপনি বিবাহ করিতে পারেন তো করুন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত হইলে আপনার কুল-ধর্ম রক্ষা হয়?"

তনু রায় বলিলেন,—"আমি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ। সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া জল খাই না। এরূপ ব্রাহ্মণের জামাতা হইতে যদি মহাশয়ের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আপনাকে আমার সম্মান রক্ষা করিতে হইবে। মহাশয়কে কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিতে হইবে।"

ব্যাঘ্র উত্তর করিলেন,—"তাহা বিলক্ষণ জানি। এখন কত টাকা পাইলে মেয়ে বেচিবেন বলুন।"

তনু রায় বলিলেন, "এ গ্রামের জমিদার মান্যবর শ্রীযুক্ত জনার্দন চৌধুরী

মহাশয়ের সহিত আমার কন্যার সম্বন্ধ হইয়াছিল; দৈব ঘটনাবশতঃ কার্য সমাধা হয় নাই। চৌধুরী মহাশয় নগদ দুই সহস্র টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, স্বজাতি। আপনি তাহার কিছুই নন, সুতরাং আপনাকে কিছু অধিক দিতে হইবে।"

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"বাটীর ভিতর চলুন। আপনাকে আমি এত টাকা দিব যে, আপনি কখনও চক্ষে দেখেন নাই, জীবনে স্বপনে কখনও ভাবেন নাই।"

এই কথা বলে বাঘ যখন ডাক ছাড়তে ছাড়তে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল তখন তনু রায় ব্যবসার চাল বজায় রাখতে গিয়ে যেটুকু সাহস সঞ্চয় করে-ছিলেন তার সবটুকু হারাতে বসলেন। ভাবলেন, বাঘ হয়তো তাঁর পরিবারের সকলকেই এই মুহূর্তে খেয়ে ফেলবেন। বনের পশুর সামনে দাঁড়িয়ে তনু রায়ের যে ভয় বিহ্বলতা, তা'তে তনু রায়ের সমূহ বিপদের কথা স্মরণে এনেও আমরা কৌতুক হাস্য হাসি। ভাবি, অর্থ লিপ্সা মানুষকে কোথায় এনে ফেলে, এ বিপদ তার স্বকল্পিত, স্বেচ্ছাকৃত। তাই দুষ্ট লোকের ভয়ার্তভাবে আমরা যেন মজাই পাই। বাঘের রূপক ব্যবহার এ অংশে সর্বাংশে সার্থক, ও তাৎপর্য-মণ্ডিত। একটা মানুষেতর জীব এসে একটা মানুষকে যেভাবে ব্যঙ্গ করে তার সার্থকতা আর বিচারের অপেক্ষা রাখে না।

বাঘ গৃহের ভিতরে গিয়ে একটি টাকার তোড়া তনু রায়ের সামনে ফেলে দিলেন তখন তনু রায়ের মনে আর আনন্দ ধরে না। এই আনন্দ আবেশে তিনি বললেন,—"এতদিন পরে এইবার আমি মনের মত জামাই পাইলাম।"

এক বাঘের হাতে তুলে দিয়ে পিতা যদি বলে মনের মত জামাই পেলাম, তবে সেই পিতার হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে আর কি কোন সন্দেহ থাকে? তনু রায়ের পিতৃহৃদয়ের যে পরিচয় এর আগে পেয়েছি এখন তা climax-এ পৌঁছায়। তনু রায় এখন যেরূপ জামাই পেলেন তার কাছে পৃথিবীর আর কেহই দাঁড়াতে পারে না। জনার্দন চৌধুরী তো সামান্য প্রাণী। লেখক তাই তনু রায়দের মতন ধনীদের উদ্দেশ্যেই বুঝি বললেন "যাহার টাকা আছে, তাঁহার কিসের ভাবনা?"

তনু রায় এখন থেকে বাঘকে আর শুধু বাঘ বলে অবজ্ঞা করতে পারেন না, বলেন ব্যাঘ্র মহাশয়। আর স্ত্রীকে শাসিয়ে বলেন,—

"তুমি আমার কথার উপর কথা কহিও না, তাহা হইলে অনর্থ ঘটিবে।…

...যদি কান্নাকাটি কর, তাহা হইলে এই ব্যাঘ্র মহাশয়কে বলিয়া দিব, ইনি এখনি তোমাদিগকে খাইয়া ফেলিবেন।"

তনু রায় জামাতার সঙ্গে হাস্যপরিহাসছলে বলেন—"বাবাজি বাসরঘরে গান গাহিতে হইবে, কেবল হালুম হালুম করিলে চলিবে না।" আমরা জানি তিনি নিজে বাসরঘরে গাইবার জন্যে কয়েকখানি গান শিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে গানগুলি বিফলে গিয়েছিল। তাই বোধহয় টাকার আহ্লাদে পূর্ব-স্মৃতিকে ফিরে পেয়েছেন।

"বর না চোর"—সামান্য এই কথাটুকুর মধ্যে লেখক নব-বিবাহিত পুরুষের অসহায়ত্বের প্রতি যে কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছেন তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, উপভোগের হয়েছে।

কন্যার বিবাহের পরে তাকে জামাতা গৃহে পাঠানোর সময়ে কন্যার সঙ্গে তনু রায় মূল্যবান কোন দ্রব্যই দিতে চান না। স্ত্রীকে এ জন্যে তিরস্কার করেন, বলেন, বাঘের আবার অভাব কিসের, কেননা বাঘ যেখানে যাবে, যা চাইবে, মানুষ ভয়ে ভয়ে তাই দেবে। ঘরের জিনিষ কি এভাবে নষ্ট করতে হয়! স্ত্রীর এই লক্ষ্মীছাড়া স্বভাব দেখে তনু রায় গর্বভরে তাঁর লক্ষ্মীমন্ত স্বভাবের উল্লেখ করলেন, তাঁর মাতার কণ্ঠ-শ্বাস উপস্থিতকালে তিনি নাকি মাতার পরিধেয় পুরাতন বস্ত্রটি খুলে নিয়ে, অতি পুরাতন জীর্ণ গলিত একখানি নেকড়া পরিয়ে দিয়েছিলেন। "এইরূপ টানাহেঁচড়া করিতে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত, মৃত্যু-সময়ে তিনি মাতার মুখে এক বিন্দু জল দিতে অবসর পান নাই। কাপড় ছাড়াইয়া, ভক্তিভাবে, যখন পুনরায় মাকে শয়ন করাইলেন, তখন দেখিলেন, যে মা অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে।"—তনু রায়ের লক্ষ্মীমন্ত স্বভাবের এই চিত্রণ তাঁর হৃদয়হীনতার এক জ্বলন্ত সাক্ষর।

তনু রায়ের জামাইবরণের ঘটা দেখে আর একবার নতুন করে তনু রায়ের নীচতা, নিষ্ঠুরতাকে দেখতে পাই। জামাইকে আপ্যায়ন করতে তিনি যেভাবে তিনটি খাদ্যসামগ্রীকে দেখালেন তা' যথেষ্ট হাস্যবহুল। জামাতা আদর করতে গিয়ে তাঁর গোয়ালের বৃদ্ধা গাভীটিকে দেখিয়ে দিলেন। এতে একাধারে জামাই আপ্যায়ন ও মিছামিছি খড় যোগানোর হাত থেকে রেহাই —দুই-ই হবে। এই গাভীটি যদি পছন্দ না হয়, তবে নিরঞ্জন কবিরত্নকে অথবা সেই গ্রামের গোয়ালিনীকে ধরে খাবার জন্যে জামাতাকে পরামর্শ দিলেন। তনু রায় জামাতার পায়ে তেল দেওয়ার জন্যে যেভাবে কৃত্রিম

অনুযোগ করেন তা যথেষ্ট হাস্যরসসিক্ত। "এবার আসিয়া একেবারেই তিনটিকে খাইতে হইবে। যদি না খাও, তাহা হইলে বনে যাইতে দিব না, তোমার চাদর ও ছাতি লুকাইয়া রাখিব। না না। ও কথা নয়; তোমার যে আবার ছাতি কি চাদর নাই। যদি না খাও, তাহা হইলে আমি তোমার উপর রাগ করিব।" তনু রায়ের এই ছলনাকে আমাদের চিনতে বাকী নেই। ধনবান জামাতাকে তোষামোদ করবার এ রীতিকে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন।

এবার থেকে ক্রমশ আমরা খেতুর ব্যাঘ্ররূপ ধারণ ও তার কারণ, পরে নাকেশ্বরীর হাতে খেতুর মৃত্যুবরণ, এবং কঙ্কাবতীর খেতুকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্যে নানা চেষ্টাকে গল্পেতে পাই। এই অংশে লেখক রূপকের ব্যবহার করেছেন। প্রথমেই স্কল ও স্কেলিটন কোম্পানীর অবতারণা ঘটিয়ে আমাদের ইংরাজ মোহের প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন। আমরা আমাদের ভারতীয়ত্ব, বিশেষ করে বাঙালীয়ানাকে ভুলে গিয়ে পুরাপুরি ইংরাজ হতে চাই, ইংরাজ যা করে, যা বলে তাই সত্য; এই বিশ্বাস করি, আমাদের এই আকুলতা ও দুর্বলতাকে লেখক ব্যঙ্গ করতে গিয়ে বলেছেন, "আমরা কোম্পানি খুলিয়াছি। কোম্পানীর নাম রাখিয়াছি, 'স্কল, স্কেলিটন এণ্ড কোং।' ইংরাজী নাম রাখিয়াছি কেন তা জান, তাহা হইলে পসার হইবে, মান বাড়িবে, লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিবে। যদি নাম রাখিতাম 'খুলি কঙ্কাল এণ্ড কোম্পানী' তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে বিশ্বাস করিত না। সকলে মনে করিত ইহারা জুয়াচোর।"……"আবার দেখ, বেদের কথা বল, শাস্ত্রের কথা বল, বিলাতী সাহেবেরা যদি ভাল বলেন, তবেই বেদ পুরাণ ভাল হয়। আমাদের দেশী পণ্ডিতের কথা কেউ-ই গ্রাহ্য করে না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের কোম্পানীর নাম দিয়াছি 'স্কল, স্কেলিটন এণ্ড কোং'।"

অন্যত্র ব্যাঙ হাতীর রূপকের মধ্যে দিয়েও লেখক এই একই ধরনের ব্যঙ্গের চিত্রণ করেছেন। কঙ্কাবতী খেতুর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্যে গ্রামে ফিরে যেতে গিয়ে বনের পথে পথ হারিয়ে ফেললেন। দেখা হল এক ব্যাঙের সঙ্গে। এই ব্যাঙটি সাহেব ব্যাঙ। কঙ্কাবতী অল্পমতী বালিকা। সাহেব ব্যাঙটিকে চিনতে পারেননি। ভুল করে তার সঙ্গে বাংলাতে কথা বললেন। এবং ব্যাঙ-মশাই বলে সম্বোধন করলেন। ব্যাঙ অতিশয় রুষ্ট হয়ে উঠলেন। প্রথমে তো কথায়ই উত্তর দেন না। কেননা বাংলায় কথা বললে যে মান-মর্যাদা কিছুই

থাকবে না। চারদিকে কেহ নাই, সেই সুযোগে ব্যাঙ কঙ্কাবতীকে তিরস্কারের সুরে বললেন, "কোথাকার ছুঁড়ী-রে তুই। আ-গেল-যা! দেখিতেছিস, আমি সাহেব! তবু বলে, ব্যাঙ মশাই, ব্যাঙ মশাই! কেন? সাহেব বলিতে তোর কি হয়?"······কেবল বলিবে ব্যাঙ, ব্যাঙ, ব্যাঙ! কেন? আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে কি মুখে ব্যথা হয় না কি? আমার নাম, মিষ্টার গামিশ।" এই ব্যাঙ এই সাহেবী কায়দাটি শুধু শুধু গ্রহণ করেনি। সে উচ্চ সমাজ কর্তৃক অবহেলা, অবজ্ঞা পেয়েই সাহেব হতে চেয়েছে। একবার সাহেব হতে পারলে যে অনেক সুবিধা। সকলে ভয় করে, সেলাম করে, রেলগাড়ির তৃতীয় কামরায় চড়িলেও লোকে ভয়ে সে কামরায় উঠবে না। মাথার টুপি দেখেই সকলে ধরে ফেলবে—এ সাহেব। সুতরাং ব্যাঙ মশাইয়ের সাহেব রূপ গ্রহণে প্রতিবাদ করবার কিছু নেই।

লেখক আমাদের তৎকালীন জীবনের অকারণ সাহেব-প্রীতিকে যে ভাবে কৌতুকচ্ছলে ব্যঙ্গ করেছেন তার যেন তুলনা হয় না। রূপকের আশ্রয় এখানে সর্বাংশে সার্থক।

সেই ইংরাজী-পড়া বাবুদের সর্ববিষয়ে নাস্তিকতাকেও লেখক সহ্য করতে পারেন না। ঠিক নাস্তিকতা তো নয়, এ যেন নাস্তিকতার অজুহাতে ক্রমে নিম্নমুখী সোপান বেয়ে নীচের দিকে নেমে যাওয়া। কেননা নাস্তিক হতে হলে অমিত মনোবল প্রয়োজন। কোন কিছু মানাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। বরং না মানাতেই ক্ষতি, ধ্বংস। এ ধ্বংসকে লেখক স্বীকার করতে পারেন না। ভগবানকে মানলে ভগবানের কোন লাভ-ক্ষতি বৃদ্ধি হোক না হোক, আমাদের নিশ্চয়ই হয়। ধর্মের পথ থেকে সহসা স্খলিত হতে গেলে আমাদের দু'দণ্ড ভাবতে হবে। আর না মানলে, কোন বাঁধা নেই। নিজের নিজস্ব ভুলে, ধর্মকে অস্বীকার করে, যত খুশী অধর্মের দিকে, পাপের দিকে যেতে পারবো। আমাদের বিশেষ করে সেই ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সেই ভুলকে লেখক ভেঙ্গে দিতে চেয়েছেন। স্কল ও স্কেলিটনের সঙ্গে খেতুর কথা-বার্তায় তা'র কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে যেখানে তিনি বলেছেন, বেদের কথা, শাস্ত্রের কথা প্রসঙ্গে বিলিতি সাহেব ও দেশী পণ্ডিতদের মতামতের কথা। তিনি যখন বলেন, "ইংরাজি-পড়া বাবুদের আমরা কি করিয়াছি যে, তোমরা আমাদিগকে পৃথিবী হইতে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছ, এখন এই উপদেবতা কয়টাকে শেষ করিতে পারিলেই হয়।" তাই বলে তিনি আমাদের ধর্মের

নামে গোঁড়ামিকে, কুসংস্কারকে জয়ী হতে দিতে কখনই চান না। আমাদের ধর্মের নামে টিকি রাখা, উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত বিভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা দেওয়া ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি। "দেবতাদিগকে না মানিলে, না পূজা দিলে, দেবতাদিগের রাগ হয়, দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাকেন, এ কথা পূর্বে জানিতাম কিন্তু লোকে ভূত না মানিলে, ভূতের রাগ হয়, ভূতের অপমান হয়, এ কথা কখনও শুনি নাই। আমার তাই হাসি পাইল।"... ... অন্যত্র তিনি বললেন, "ইংরাজী-পড়া বাবুদের সহজে ছাড়িব না। যাহাতে পুনরায় ভূতের উপর তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মে, আমরা সে সমুদয় আয়োজন করিয়াছি।"

আমাদের অর্থপ্রীতিকে লেখক ভূতেদের কথা বলতে গিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, "লোককে ভক্ত কবিতে হইলে অর্থদান একটি তাহার প্রধান উপায়। অর্থ পাইলে লোকে অতি ধর্মবান, অতি ভক্তিমান্ মহাপুরুষ হয়।" অর্থ যে মানুষকে কি করাতে পারে, লেখক সেই বিচিত্র মনোপ্রবৃত্তির প্রতিই কটাক্ষ করতে চান। আমরা যা নই, তাই হয়ে যেতে পারি এই অর্থলোভে। কখনও বা নিষ্ঠুর হই, কখনও বা মনুষ্যত্বকে হারাই। এ দুই-এর কোনটিই ভাল নয়। লেখক বলতে চান অর্থের অতি-প্রয়োজনও যেন আমাদের কখনও অতি-নীচ, মনুষ্যত্বহীন না করে তোলে।

ভূতদের প্রসঙ্গে মানুষের অদ্ভুত মনোবৃত্তির কথা ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা যেন কারও ভালটুকু দেখতে পাই না। অন্যের কন্যার ভাল বিবাহ হবে, বিবাহিত পক্ষের কাউকে দেখলাম, আতি ব্যস্ত হয়ে হয়ত তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কন্যাটি কেমন, তখন আমরা সরাসরি বিবাহে ভাঙ্চি না দিলেও, বলি—"দিবে দাও। কিন্তু—' ঐ যে কিন্তু কথাটি উহাতে এক জাহাজ মানে থাকে।" ঘ্যাঘোঁ ও নাকেশ্বরীর বিবাহে অন্য সব ভূতেরা যে ভাঙ্চি দিয়েছিল, তা অতি চমৎকার ও হাস্যরসাত্মক।

এরপর, স্কল ও স্কেলিটন তাদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছে, "বালক মরিয়া ভূত হয়,......আর ভূত মরিয়া মারবেল হয়......মরা ভূত লইয়া খেলা করিতে দোষ কি? হ্যাঁ! জীয়ন্ত ভূত হইত! তাহা হইলে তাহার সহিত খেলা করা বিপদের কথা বটে!" একথাগুলি হাস্যাত্মক ও রূপকাত্মক। হাস্যাত্মক, কেননা এরূপ কথা আমরা কখনও শুনিনি, আর রূপকাত্মক, কেননা বালক অর্থাৎ অপরিণত বুদ্ধির ইঙ্গ-সমাজকেই এখানে লক্ষ্য করে

বলা হয়েছে, আর মারবেল অর্থে এমন একটা কিছুকে হয়তো ইঙ্গিত করা হয়েছে যার গতি সব সময়েই অনির্দিষ্ট, তাকে যেদিকে যেভাবে ঘোরাবে সেও সেই ভাবে চলবে, নিজস্ব সত্তা বলে কিছুই নেই। সুতরাং মৃত ভূত যদি এরূপ কোন বস্তু হয় তবে তাকে কোনই ভয় থাকে না। 'ভূত' এই রূপটিই রূপক অর্থে করা হয়েছে, যার পরিচয় 'লুল্লু' প্রসঙ্গে ভূমিকায় দিতে চেষ্টা করেছি। ভূতরা আসলে মানুষই একথা আমরা জানি।

এরপর লেখক আমাদের আবার রূপকের মধ্যে নিয়ে এলেন। কঙ্কাবতীর প্রথম ভাগে মানুষ রূপে আমরা যে জমিদার শ্রেণীকে দেখতে পেয়েছিলাম যাদের অত্যাচারে নিরঞ্জনের মত, খেতুর মত দরিদ্ররা নির্যাতিত হত, আর যে জমিদার শ্রেণী গোবর্ধন-শিরোমণির মত পণ্ডিত-মূর্খ, ষাঁড়েশ্বরের মত মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হত—তাদেরই প্রবল পরাক্রান্ত রূপে আবার "মশা"র জগতে যেন দেখতে পেলাম। এরা যা ইচ্ছে তাই-ই করে ফেলতে পারতো, তা, সে কাজ যত অসম্ভব, আর উদ্ভটই হোক। কঙ্কাবতীর মশাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাই ব্যঙ্গাত্মক ভাবে চিত্রিত হয়েছে।

জমিদারগণ যতই প্রবল প্রতাপশালী হোক না কেন, তাদের গৃহিণীগণের নিজস্ব কোন ক্ষমতা ছিল না। তারা কেবল নিজেদের মধ্যে কলহ, আর বিনা শ্রমে পরম ব্যর্থতায় দিন কাটাতেন। তাদেরই কথা শুনি, "একে আমরা স্ত্রীলোক, যে-সে মশার স্ত্রী নই, গণ্য-মান্য সম্ভ্রান্ত মশার স্ত্রী, তাতে আমরা পর্দানশীল, কুলবধূ। আমাদিগের কি ঘরের বাইরে যাইতে আছে, বাছা? না,—আমরা পথঘাট জানি?" এখানে লেখক স্বপত্নী কলহের যে চিত্র অঙ্কন ক'রেছেন তাতে প্রচুর হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে মশকের তিন পত্নীর মধ্যে ছোট-মশানীরই মশার কাছে একটু বেশী আদর, তাই সে সেই কর্তামশকের কোন প্রকার নিন্দাকে সহ্য করতে পারে না। নূতন বিবাহিত, তাই বাপ ভাইদের গরব এখনও তার মন থেকে যায়নি। বড়-মশানী, মেজ-মশানীর মত ছোট মশানী নয়। বড়, ও মেজ, তাদের কর্তাকে ভালরূপে চিনেছেন, তাই তাঁর সম্বন্ধে তাঁরা পরিহাস করতে পারেন, কিন্তু ছোট্ট, কর্তার বোধ হয় একটু আদরের, তাই সেই কৌতুকে যোগ দিতে পারেন না। এই জন্তেই বড়-মশানী যখন বল্লেন, "কটাস্ কামড়, চটাস্ চাপড়, ম'রে গিয়েছেন পারা।" ছোট রাণী তখন ফোঁস করে উঠলেন, বললেন, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।—এই ভাবে, তৎকালীন সমাজের

সতীনদের পরস্পরের প্রতি যে ঈর্ষা, ক্রোধ, কলহ ইত্যাদি অতি কৌতুকপ্রদ-ভাবে মশানীদের কথায় ফুটে উঠেছে। সতীনরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি এত জঘন্য ব্যবহার করতো যে পাড়া প্রতিবেশী, এমন কি বনের কীট পতঙ্গ পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠতো। কিন্তু নিজেদের মধ্যে তাদের যতই কলহ থাকুক কর্তামশায়কে দেখলে সকলে চুপ হয়ে যেত, কর্তা তাঁর প্রখর মেজাজ দিয়ে সকলকে ঠাণ্ডা করে দিতেন।

এবার থেকে আমরা মশারূপী জমিদারকে দেখতে পেলাম। কঙ্কাবতী যখন তার পতিকে উদ্ধার করবার জন্যে মশামশাইকে বিনীত প্রার্থনা জানালেন, মশক তখন জমিদারী কায়দায় বা রীতিতে কঙ্কাবতী কোন্ মশকের অধিনস্ত প্রজা তাই-ই জানতে চাইলেন। একটু পরেই তিনি তাঁর যথার্থ পরিচয় প্রদান করেছেন। কন্যাকে প্রশ্নচ্ছলে তিনি স্পষ্টই বলে দিলেন যে ভারতের মানুষকে আহার অর্থাৎ শোষণ করার জন্যেই তাঁদের জন্ম। এই জমিদাররা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে সব সময়ে টিকিয়ে রাখতে চাইতেন। এজন্যে তারা প্রয়োজন বোধ করলে তাদের চাটুকার শ্রেণীর পণ্ডিত মূর্খদের আহ্বান করতেন ও নানারূপ বিধি নিষেধ, শাস্ত্র ইত্যাদি প্রচলন করতেন। এঁরা আমাদের সর্ব-প্রকার শিক্ষা-দীক্ষার বিরোধী ছিলেন। অবশ্য সেই সমাজের সমগ্র জমিদার শ্রেণীকে তিনি কটাক্ষ করেননি। ভাল তাঁদের মধ্যে হয়তো কেউ কেউ ছিলেন, সেদিকটা দেখা ব্যঙ্গ শিল্পীর কাজ নয়। সেদিকটা অসঙ্গতির, অকল্যাণের সেই দিকেই তাই লেখকের দৃষ্টি পড়েছিল। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে দুষ্ট জমিদারদের কুটিল মনো প্রবৃত্তিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

"দেশ-ভ্রমণের কি ফল! দেশভ্রমণ করিলে নানা নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে পারে, মনুষ্যদিগের জ্ঞানের উদয় হয়। দেশভ্রমণ করিয়া ভারতবাসী-দিগের যদি চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাহা হইলে, মনুষ্যগণ আর আমাদের বশ্যতাপন্ন হইয়া থাকিবে না। আবার বাণিজ্যাদি ক্রিয়াদ্বারা ক্রমে তাহারা ধনবান্ হইয়া উঠিবে। তখন মশারি প্রভৃতি নানা উপায় করিয়া, রক্তপান হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবে। অতএব, যাহাতে ভারতবাসীরা বিদেশে গমনাগমন না করিতে পারে, যাহাতে এক গ্রামের লোক অপর গ্রামে যাইতে না পায়, এরূপ উপায় সত্বর আমাদিগকে করিতে হইবে।" এইরূপ বিবেচনা করবার পরেই মশকেরা পণ্ডিতদের ডাকলেন, ও পণ্ডিতগণ যেভাবে বিধান

দিয়ে জমিদারদের পরম পরিতোষ দান করে বিদায় লন তা' একাধারে হাস্য ও ব্যঙ্গপূর্ণ।

"শাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ অবিলম্বে বিধি বাহির করিলেন যে, এ কলিকালে ভারতবাসীদিগের পক্ষে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করা একেবারে নিষিদ্ধ। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিলে অতি মহাপাতক হয়। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কলিকালে ভারতবাসীগণ চক্ষে ঠুলি দিয়া, হাত যোড় করিয়া, অন্ধকূপের ভিতর বসিয়া থাকিবে, আর পৃথিবীর যাবতীয় মশা আসিয়া তাহাদিগের রক্ত শোষণ করিবে।"

এই জমিদারদের সঙ্গে নানাশ্রেণীর লোকের আলাপ-পরিচয় আছে। কঙ্কাবতীর স্বামীকে উদ্ধারের জন্যে তাই মশা এমন একজনের নাম করলেন যার কাছে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব—যেখানে যত ভয়ানক ব্যক্তির সাক্ষাৎ সকলে এই লোকটির কাছে জব্দ। এই ব্যক্তির নাম খর্বুর মহারাজ। এই খর্বুর মহারাজের যে চরিত্রটিকে এখানে আঁকা হয়েছে তা' অতিশয় কৌতুকের। এমন যে শক্তিশালী যার ভয়ে সকলে ভীত তিনি কিন্তু এক জায়গায় এসে একেবারে নিরুপায়, বিষণ্ন হয়ে যায়। আর তার এই বিষণ্নতায় চাঁদের মত আমরাও বেশ মজা পাই, তাই হাসি। খর্বুর মহারাজ লম্বায় অতি ছোট, আর তার স্ত্রী লম্বায় সাত হাত। তাই এমন যাঁর স্ত্রী তাঁকে তো সব সময়ে কলহ, বিষণ্নতা নিয়ে থাকতেই হবে। খর্বুর তিন হাত লম্বা, ও তাঁর পত্নী সাত হাত লম্বা—এভাবে চিত্রণ করার মধ্যেই তাদের দাম্পত্য-জীবনের বিরাট অসঙ্গতি রূপকের মধ্যে দেখানোর চেষ্টা আছে। খর্বুরের হাতীর পিঠে চড়ে কলহ করা, মানেই কূটবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের সাহচর্য গ্রহণ করা, সেই মত চলে পত্নী অপেক্ষা নিজে আরও শক্তি ও বুদ্ধির সঙ্গে কলহ ও মারামারি করা, ও এইভাবে দাম্পত্য কলহে বিজয়ী হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। রূপক হলেও আমাদের জীবনের দাম্পত্যকলহের অসঙ্গতির দিকটিই এখানে প্রস্ফুট করা হয়েছে।

খোক্কস ও ঘোক্কসদের চিত্র-অঙ্কনের মধ্যে প্রচুর হাস্যরস আছে, যা সকলের পক্ষেই উপাদেয়। আসলে এই খোক্কস ও ঘোক্কস—বিশেষ বিশেষ ধরনের অসাধু ব্যক্তির প্রতিরূপ ছাড়া আর কিছু নয়। এরা দু'জনেই ধূর্ত, কিন্তু খোক্কস থেকে ঘোক্কস যে আর একমাত্রা উপরে তা' বুঝতে বাকি থাকে না। সে যাই হোক কঙ্কাবতীর মৃতপতির প্রাণ ফিরে পেতে গিয়ে অশেষ ত্যাগ ও

নানা দুর্গতি স্বীকার করতে হয়েছিল। আমাদের জীবনেও এমনি হয়। কোন মহৎ কার্য সম্পাদনের পথে অনেক খোক্কস, ঘোক্কসকে অতিক্রম করতে হয়।

পৃথিবীতে সুন্দরকে বেঁচে থাকতে হয় অতি যত্নে, অতি সাবধানে, অতি সতর্কতায়। চাঁদ সুন্দর, তাই বুঝি রাহুর তার প্রতি এত আকর্ষণ। চাঁদ ঠিকই বলেছেন, "কেন যে মরিতে সুন্দর হইয়াছিলাম? তাই তো আমার প্রতি সকলের আক্রোশ!"

কঙ্কাবতী আকাশে গিয়ে চাঁদের পরিবারের সঙ্গে বেশ পরিচিত হয়েছিল। আর সেই সূত্রে আমরাও কিছু জেনেছি। কিন্তু মনে হয় নতুন করে জানবার যেন আর কিছুই নেই। কেননা, আমাদের পৃথিবীর প্রতিচ্ছবিই সেখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। প্রথমে চাঁদের ঘরের ছবিটিই যদি দেখি, তবে সেখানে দেখতে পাব চাঁদ তার সন্তানদের নিয়ে চাঁদনীর সাথে অতি সুখেই দিন কাটাচ্ছিল, এই সুখের সংসারে কঙ্কাবতী একান্তই অবাঞ্ছিত। তবুও কঙ্কাবতীর নিজের প্রয়োজনেই সেখানে উপস্থিত হয়েছে। কঙ্কাবতী, সরলা, সৎ। তবু চাঁদ, চাঁদনী তাকে বিশ্বাস করতে পারে না। চাঁদ বলেছিল, তার দাঁতে বড্ড ব্যথা। কঙ্কাবতী পরোপকারের মনোবৃত্তি নিয়েই বলেছিল যে চাঁদকে সে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভাল দন্ত চিকিৎসক দেখিয়ে পোকা ধরা দাঁতগুলিকে তুলে দিয়ে, নূতন কৃত্রিম দন্ত পরিয়ে দেবে। এতে চাঁদ কঙ্কাবতীকে বিশ্বাস করতে পারেনি, ভেবেছে একবার যে রমণী তার মত নিগ্রহকে ব্যথা দিয়েছে, সে না জানি আরও কত কি করতে পারে। সে নিজে তো যেতে চায়নি। কিন্তু এই দন্ত চিকিৎসার কথা যখন চাঁদনী শুনলো তখন, সে যেন সুন্দরী ছদ্মবেশী চণ্ডীর সামনে ফুল্লরার মত নিজেকে একান্ত অসহায় মনে করলো। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে-ও তাই কাঁদতে কাঁদতে বললো, "তোমার যদি বাছা, কাজ সারা হইয়া থাকে, তবে তুমি এখন বাড়ী যাও। তোমার ভয়ে, আকাশ একেবারে লণ্ড ভণ্ড হইয়া গিয়াছে।...সবাই সশঙ্কিত।" আমরা বেশ বুঝতে পারি সবাই সশঙ্কিত হোক আর না হোক চাঁদনীর অবস্থা অত্যন্ত হতাশাজনক। দেহে মনে তবু একটু শক্তি টেনে এনে সে বললো, "আমাকে যদি বিধবা হইতে হয়, তাহা হইলে তারও আমার মত হাত হইবে।"—এ যেন চণ্ডীদাসের রাধিকা বিরহ-কাতর হয়ে বলছেন, "আমার পরাণ যেমন করিছে, তেমনি হউক সে।" সুতরাং কৌতুকচ্ছলে লেখক চাঁদ-চাঁদনীর যে চিত্র অঙ্কন করলেন, তা এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হয়ে ওঠার দাবী রাখে।

এবার কঙ্কাবতীর সঙ্গে আমরা আমাদের চির-শ্রুত তালপাতার সিপাহী-এর একবার চাক্ষুস পরিচয় পেলাম। এই বীরপুরুষ সিপাহীটির রূপ ও গুণ সবই হাস্যোদ্রেকক। আমাদের একটা দোষ আছে যে আমরা সব সময়ে আমাদের দোষটাকে অন্তরালে রাখতে চাই। সিপাহীটি কর্ণে কিছু হীনবল —একটু কালা। কিন্তু সে তার সেই হীনত্বটুকুকে কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। চাঁদ যখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চাঁদে মানুষর আসার সংবাদ সিপাহীকে দিল, সিপাহী তখন ভাবলো যে তাকে কালা মনে করে বুঝি এত হাঁ করে কথা বলছে। এতে সিপাহীর রাগ হল। এ রাগটুকু উপভোগ করার মত। একটু পরে চাঁদ আস্তে আস্তে যখন সংবাদ দিতে গেল, তখন সিপাহী বললো, —"অত আর চুপি চুপি কথা কহিতে হইবে না। কোথাও ডাকাতি করিবে না কি যে, অত চুপি চুপি কথা! যদি কোথাও ডাকাতি কর, তো আমায় কিন্তু ভাগ দিতে হইবে।" এই চৌকিদার শ্রেণীর লোকেরা স্বার্থ ও লাভের হিসাবটা ঠিক মত বুঝলেও, কাজ কিছুই করতে চায় না। কিন্তু এরা তাদের দরটি ধরে রাখতে জানে। তাই তাদের প্রদীপ্ত উত্তর—"রেখে দাও তোমার মাহিনা। না হয় কর্ম ছাড়িয়া দিব? পৃথিবীতে গিয়া কনেষ্টবিলি করিয়া খাইব।......সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় বটে, তা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় আমি তফাৎ তফাৎ থাকিব। দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব হইয়া যাইলে দাঙ্গাবাজেরা আপনার আপনার ঘরে চলিয়া গেলে, তখন আমি রাস্তার দু চারিজন ভাল মানুষ ধরিয়া, কাছারিতে নিয়া হাজির করিব।"—এখানে স্পষ্টতই চৌকিদার-শ্রেণীর অকর্মণ্যতা, অসাধুতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এই চৌকিদাররাই আবার উপযুক্ত লোকের হাতে পড়লে কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। কঙ্কাবতীর হাতে সিপাহীর লাঞ্ছনায় যথেষ্ট হাস্যরস আছে। এক নারীর ভয়ে ভীত হয়ে একটি চৌকিদার পুরুষ ছুটছে, ছুটতে ছুটতে হোচট্ খেয়ে পড়ে যাওয়াতে নারীটি তাকে চেপে ধরল, তার আর নড়বার শক্তি রইল না। তারপরে, ঐ রমণীর আজ্ঞা পালন করে তবেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলো—এই ছবিটি আমরা কল্পনায় যখন দেখতে পাই তখন না হেসে পারি না। চৌকিদারের কিন্তু লজ্জা নেই, তাই কাপুরুষ হয়ে বলে, "ভাগ্যক্রমে আকাশের লোক সব আজ দ্বারে খিল দিয়া বসিয়া আছে। যদি কেহ আমার এ দুর্দশা দেখিত, তাহা হইলে আজ আমি মরমে মরিয়া যাইতাম।" এ ধরনের কাপুরুষতা ব্যঙ্গেরই যোগ্য।

কঙ্কাবতীর এত চেষ্টা কিন্তু সফল হল না। খেতু সামান্য কালের জন্যে প্রাণ ফিরে পেলেও এবার যে চির-মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিল। এবার কঙ্কাবতীর সতীত্বের শেষ পরীক্ষা। সে খেতুর সহিত সহমরণে যেতে চায়। কিন্তু নাকেশ্বরী শ্রেণীর দুষ্ট ভূত বলল, "এ ধর্মভূমি ভারতভূমির নিয়ম তোমরা জান না। লোকের এখানে ধর্মগত প্রাণ। শোকেই হউক, আর তাপেই হউক, সহসা যদি কেহ মুখে একবার বলিয়া ফেলে যে "আমি পতির সঙ্গে যাইব," তাহা হইলে তাহাকে যাইতেই হইবে। না হইলে পতিকুল, পিতৃকুল, মাতৃকুল সকল কুল কলঙ্কিত হইবে।" সেই সমাজে এই সহমরণ প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এখানে তাই আমরা দেখি খর্বুর, মশা, ব্যাঙ কঙ্কাবতীর সহমরণকে মেনে নিতে পারছে না, কিন্তু ভয়ানক নিষ্ঠুর, ও দয়াহীন হৃদয় নাকেশ্বরী স্ব-ইচ্ছা পূরণার্থে কঙ্কাবতীকে সহমরণে যাওয়ার জন্য নানারূপ কথা শোনাতে লাগলো। কিন্তু খেতু-প্রাণ কঙ্কাবতী স্ব-ইচ্ছাতেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিতে এতটুকু বিচলিত হয়নি। তবু সেই সমাজে এই নিষ্ঠুরতম প্রথাকে কেন্দ্র করে যে অমানবিক অনুষ্ঠান রীতি, নীতির প্রচলন ছিল, তা' করুণ ও অসঙ্গতিপূর্ণ। মৃত্যুর দারুণতম দৃশ্যের কারুণ্যকে যেন সকলে বিবাহের রঙে রাঙা করে নিতে চায়। তাই নানাজনের কৌতূহলী আগমন, হৈ-হুল্লোড়, নানা অনুষ্ঠান। একজনের মৃত্যুবরণ, আর সকলের আনন্দ-উল্লাস। নিম্নের বর্ণনাটির অসঙ্গতি সহজেই অনুমেয় :—

"সকলে তখন খেতুকে চিতার উপর রাখিলেন। প্রেত পিণ্ডাদি যথাবিধি প্রদত্ত হইল। নাপিত আসিয়া কঙ্কাবতীর নখ কাটিয়া দিল। তাহার পর কঙ্কাবতী শরীর হইতে সমুদয় অলঙ্কারগুলি খুলিয়া ফেলিলেন। হাতের চুড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেই ভাঙ্গা চুড়ি লোকে হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি করিয়া কুড়াইতে লাগিল। কেননা, কাহাকেও ভূত-প্রেতিনীতে পাইলে, এই চুড়ি রোগীর গলায় পরাইয়া দিলে, ভূত-প্রেতিনী ছাড়িয়া যায়।" ভূত-প্রেতিনীকে তাড়ানোর জন্যে সতীর হাতে ভাঙা চুড়িকুড়ানোর যে ছবি তা' হাস্যকর। শুধু এইটুকুই নয়, বালক-বালিকার হুড়াহুড়ি করে খই, কড়ি কুড়ানোর যে ধুম তাও হাস্যকর। কোন মহৎ উদ্দেশে এই সংগ্রহ নয়, বিছানার ছারপোকা তাড়ানোর জন্যে এই ব্যাকুলতা। বালিকা বধূর মনে পতিভক্তির উদয় ঘটানোর জন্যে সতীর কপালের সিঁদুর চেয়ে নেওয়াও হাস্যকর। পতিভক্তিকে জোর করে সৃষ্টি করা যায় না। স্বভাব ও সময় নিয়মিতভাবে যদি মনকে না জাগাতে

পারে তবে সহস্র সতী-সিন্দুরে তা পারবে না। কিন্তু সেই সমাজে পতিভক্তি না হলে চলেই না। যে-সমাজে সর্বকাল মেয়েরা সতীত্ব আর ভক্তির নামে নিজের সকল সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, এক কথায় নিজত্বকে, বলি দিতে বাধ্য হত, সে সমাজকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে "সতী" অধ্যায়ে। যে নারী স্বেচ্ছায় সহমরণকে গ্রহণ করছে তাকে তো আর চিতার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। এই বন্ধন-রীতি থেকে এইটুকুই বুঝা যায় যে কোন নারীই স্ব-জ্ঞানে এইভাবে পুড়তে পারে না। তাই তাকে বেঁধে দিয়ে, আর চারদিকে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তার উচ্চ রোদনকেও চেপে রাখা হয়। যে-সময় এই গ্রন্থ লেখা হয় সে সময় আইনের দ্বারা সহমরণকে তুলে দেওয়া হয়, কিন্তু তার করুণতম পৈশাচিকতাকে লেখক ভুলতে পারেননি, তাই ব্যঙ্গ করেছেন।

এতক্ষণ যে-সব চিত্র ও চরিত্রগুলোকে দেখতে পেলাম এ সবই কঙ্কাবতীর অসুস্থতাকালীন স্বপ্ন দর্শন। লেখক এই স্বপ্নকে অবহেলা করতে পারেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ স্বপ্নকে কিছুটা অস্বীকার করেছেন। "কঙ্কাবতী"র ভূমিকা হইতে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের দু'একটি লাইন উদ্ধৃত করলে বিশেষ ত্রুটি বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেছেন যে এ কাহিনীর দ্বিতীয়ার্ধ স্বপ্ন নয়, রূপকথা। "স্বপ্নের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া বটে, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন নহে। বরাবর একটি গল্পের সূত্র চলিয়া গিয়াছে। স্বপ্নে এমন কোন অংশ থাকিতে পারে না যাহা স্বপ্নদর্শী লোকের অগোচর, কিন্তু এই স্বপ্নের মধ্যে মধ্যে লেখক এমন সকল ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন, যাহা নেপথ্যবর্তী, যাহা বালিকার স্বপ্নদৃষ্টির সম্মুখে ঘটিতেছে না। তাহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে এমন সকল ভাব ও দৃশ্যের সংঘটন করা হইয়াছে, যাহা ঠিক বালিকার স্বপ্নের আয়ত্তগম্য নহে।"…… কিন্তু লেখক বলেছেন, "সমুদয় বাহ্যজগৎ যেরূপ আমাদের জাগরিত ইন্দ্রিয়-কল্পিত; কঙ্কাবতীর স্বপ্নজগৎও সেইরূপ কঙ্কাবতীর সুষুপ্ত ইন্দ্রিয়-কল্পিত। দুই জগতে বিশেষ কিছু ইতর বিশেষ নাই।……স্বপ্ন,—কি নয়? তাহাই বুঝিতে পারি না। এই আমাদের জীবন, আমাদের আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ, সকলই স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হয়।" আমাদের জীবনে প্রতিটি ঘটনার আবির্ভাব কার্যকারণক্রমে হয় না, অনেক কিছু অপ্রত্যাশিত অভাবিত ঘটে। কঙ্কাবতীর স্বপ্নেও তাই-ই ঘটেছে। তবু বাস্তব-জীবনের ধারাকে ঐ অসংলগ্ন ঘটনা যেমন ছিন্ন করতে পারে না, কঙ্কাবতীর স্বপ্নদর্শনেও সৃষ্টিছাড়া ঘটনা, নেপথ্যচারী

ঘটনা তার জীবনকে সমগ্রভাবে ওলট-পালট করে দিতে পারেনি। তার চেতন-অবচেতন মনের সবটুকু জুড়ে তার তৃষ্ণা, কামনা, ভালবাসা এক দৃঢ়-মূল বিস্তার করে বসেছিল। তার ভালবাসার পরীক্ষা যেমন স্বপ্নজগতের মধ্যে দিয়ে হয়ে গেছে, তেমনি লেখকের ব্যঙ্গ-সৃষ্টির প্রয়াসও অতি সার্থকতম প্রকাশ-পথ পেয়েছে। তিনি একদিকে দেখাতে চেয়েছেন যে আন্তরিক নিষ্ঠা যেমন আমাদের জীবনের সব দুঃখকে সরিয়ে সত্যের সামনে এনে দিতে পারে, এমনি-ভাবে জীবনের সত্যকে যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি আর একদিকে যেন বলতে চেয়েছেন যে এ জীবন যেন 'স্বপ্নবৎ' তাই আমাদের অহঙ্কার, নিষ্ঠুরতা, লোভ, নীচতা এর মূল্য অতি সামান্য। তবু আমরা বুঝতে চাই না, আমরা ধর্মকে ভুলে, হৃদয়কে ভুলে নিজের সুখকে জয়ী করার জন্যে অহরহ চেষ্টা করছি। অর্থলোভ আমাদের অমানুষ করে তুলছে। জীবনের নানা অসঙ্গতিতে জীবন ভরে ওঠে ; হাস্যকর হয়ে পড়ে। কখন কখন বাইরে থেকে নানারূপ আঘাত এসে আমাদের অন্তরের মূঢ়তাকে ভেঙ্গে দেয়। তাই জনার্দন চৌধুরী, তনু রায়ের মত চরিত্রেরও রূপান্তর ঘটে। তাঁরা অস্বাভাবিকতা থেকে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসেন। খেতু ও কঙ্কাবতীর সুখ-মিলন সম্পূর্ণ হয়, আর কোন বাধা থাকে না।

সমগ্র উপন্যাসখানি বাস্তব আর কল্পনার মিশ্রণে যে অপূর্ব ব্যঙ্গরসে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তার সত্যতা আর এখন অজ্ঞাত থাকে না। মানুষের অসঙ্গতিকে দূর করবার জন্যে যতক্ষণ সম্ভব তিনি বাস্তবের জগতে ছিলেন, তারপর উধাও হয়েছেন কল্পনার জগতে। কল্পনার জগৎ হলেও বাস্তব সত্যকে দেখানো ও নানা অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করাই লেখকের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অতি সার্থক ও সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাই উপকথা শ্রেণীর উপন্যাস হয়েও, ব্যঙ্গ রচনা রূপে সর্বাংশে সার্থক। রবীন্দ্রনাথও এই সার্থকতাকে স্বীকার করেই বলেছেন, "এই উপন্যাসটি মোটের উপর যে বিশেষ ভাল লাগিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। লেখাটি পাকা এবং পরিষ্কার। লেখক অতি সহজে সরল ভাষায় আমাদের কৌতুক ও করুণা উদ্রেক করিয়াছেন, এবং বিনা আড়ম্বরে আপনার কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।"

মজার গল্প

আমাদের অনেকের মধ্যেই হয়তো অনেক রকম শক্তি আছে। কিন্তু যদি আমরা মিথ্যার আশ্রয় নিই তবে আমাদের সে শক্তির সম্যক স্ফুরণ আর কিছুতেই সম্ভব হয় না। তা' ছাড়া মিথ্যার আবর্তে পড়ে আমরা যে কতদূর দুঃখ আর লাঞ্ছনা পাই তার শেষ নেই। অথচ এই শেষ অবস্থার কথা আমরা চিন্তা করি না। "সোনা করা জাদুগরের" (মজার গল্প) গল্পে বটগার মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। সোনা সে করতে জানতো না ঠিকই। কিন্তু সাদা চীনেমাটির বাসন তৈরী করার মত বিদ্যা-বুদ্ধি তার ছিল। মানুষ হিসাবে সে খারাপ ছিল না। তার দোষ যে সে জীবনের প্রারম্ভে ভুল করেছিল। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সে মিথ্যার ফলভোগ তাকে সারাজীবন ধরে করতে হয়, এবং মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে জীবন হারাতে হয়। যদি সে সোনাকরার মিথ্যা কথা প্রচার না করত তবে তাকে এ যাতনা সহ্য করতে হত না। তার বুদ্ধি যদি সৎ-পথে, সৎ-ভাবে নিয়োজিত হত, তবে সে হয়তো শুধু চীনেমাটির অনুরূপ বাসন না তৈরী করে, তার বেশী কিছু করতে পারতো। তার সব সুপ্ত-সম্ভাবনা মিথ্যার স্পর্শে এসে অভিশাপময় হয়ে উঠলো। আমরা যখন আমাদের অজ্ঞানতাবশতঃ মিথ্যা কথা বলে পাঁচজনকে ঠকাই তখন বুঝি না আমাদের ভুলগুলিকে, ত্রুটিগুলিকে। ঐ বটগারের মত ভাবি আমরা বুঝি জিতে গেলাম। কিন্তু সে জিতের যে কোন স্থায়ীত্ব নেই এ কথা তখন ভাবি না। আমাদের সেই অজ্ঞানতা আমাদের স্বভাবের মধ্যে এক অসঙ্গতি ঘটায়, যা হাস্যের ও ব্যঙ্গের।

"ভানুমতী ও রুস্তম" (মজার গল্প) গল্পটিতে লেখকের ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীটি গল্পের কাহিনীর আড়ালে পড়ে থাকে না। শুধু যে ব্যঙ্গ আছে, তা নয়, উপদেশও কিছু আছে। সৎপথে সত্য পথে যদি মানুষ চলে তবে সে তার যথার্থ পুরস্কার লাভ করবেই, আর অসাধু ব্যক্তিকে তার পাপের, লোভের ফল পেতেই হবে। কিন্তু যারা ঐ অসাধুতার আশ্রয় লয় তারা তার পরিণামকে জানে না, ভাবে তাদের অশুভ বুদ্ধির জয় হবে। কিন্তু জীবনের এমন কোন এক স্থানে এসে তারা দেখে যে তাদের মত নির্বোধ, অসহায় আর কেউ নেই। তাদের সেই চরম অবস্থাটি একান্ত ভাবেই ব্যঙ্গের। কেননা সেই মুহূর্তে

এসে সেই মানুষগুলোর সব মিথ্যা, অসৎ-প্রবৃত্তি, লালসার আসল স্বরূপ তার সকল ব্যর্থতা নিয়ে আমাদের সামনে প্রকটতর হয়ে ওঠে। এই গল্পের কুঁজো রাজার চরিত্রটি ব্যঙ্গাত্মক। তার প্রভূত পরিমাণে শক্তি ছিল। যে শক্তির গর্বে সে জগতের পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম কোন কিছুই মানত না। সে যে-ভাবে সাদি ও তারাকে কাক ও নরমুণ্ড করে রাখে, ভানুমতীর খড়ের দেহ করে দেয় ও জোর করে বিবাহ করতে চায়, তাতে তার অসৎ-বাসনাই চরিতার্থ হয়। কিন্তু সে জানে না যে এই অশুভ, অসৎ চিরদিন স্থায়ী হতে পারে না। তাই সে অকাতরে মানুষকে নির্যাতনই করে এসেছে। কিন্তু রুস্তমের সাহস, নিষ্ঠা, সততার কাছে তাকে পরাজয় বরণ করতেই হল। রুস্তমের চরিত্রের মহত্ত্ব সেই কুঁজো রাজার শ্রেণীর লোকগুলোকে যেন ব্যঙ্গ করে।

"জাপানের উপকথা" (মজার গল্প) উপকথা শ্রেণীর গল্প হলেও এ গল্পেও একটা সুনির্দিষ্ট বাণী আছে। বাঙ্গালীর অতীত গৌরব ও বাঙ্গালীর বর্তমান গ্লানি—দুটোকেই লেখক দেখেছেন। দেখে তিনি আমাদের এই গ্লানির কারণ নির্দেশ করেছেন। আমাদের অবনতির মূলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তারের অভাব অনেকে মনে করেন। কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমরা আমাদের নৈতিক মানসিক দৃঢ়তা ও সাহসকে জলাঞ্জলি দিতে বসেছি। অথচ এই চারিত্রিক বলই ছিল আমাদের সর্বপ্রকার সার্থকতার উৎস। লেখক যেন সুকৌশলে জাপান দেশীয় উপকথার আশ্রয়ে আমাদের গুপ্ত বল, চেতনাকে পুনঃজাগরিত করতে চান। উপকথা হলেও এর মধ্যে প্রাচীন জাপানের শৌর্য-বীর্যের বীজ লুক্কায়িত। রাইকো একটা স্বল্প-বয়স্ক তরুণ হয়ে দেশের দুর্দিনে যেভাবে বিপদের সামনে এগিয়ে যায় তা আমাদের মুগ্ধ করে। তার সাহস, বিশ্বাস, ঈশ্বর-অনুরাগ, ও আত্মত্যাগ আমাদের ভাবায় ও আবিষ্ট করে তোলে। জাপানের গৌরবের কাছে আমাদের অগৌরবের কাহিনীকে মনে করিয়ে দিয়ে লেখক আমাদের ভীরুতা, দুর্বলতা, অবিশ্বাসী মনকে ব্যঙ্গ করেছেন। উদ্দেশ্য দেশকে আবার স্ব-মহিমায় অধিষ্ঠিত করা। এই কাহিনীর সমস্ত অবাস্তবতা, তার অসম্ভব্যতা ভেদ করেও যেন গভীরতর একটা দিক এ গল্পে খুঁজে পাই। সেই দিকটি ব্যঙ্গের দিক ; দেশপ্রীতির দিক।

"পিঠে পার্বণে চীনে ভূত" (মজার গল্প) গল্পটি এক চীনে ভূতের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। গল্পের নামকরণটিই হাস্যাত্মক। গল্পটি মধ্যে দিয়ে ভূত-ধারণাকে ব্যঙ্গ করা আছে। চীনাভূতের হাত থেকে মাতুল-মাতুলানীকে

মুক্ত করতে গিয়ে রাধামাধব ভূত প্রেত সম্বন্ধে সমুদয় পুস্তক পাঠ করেছিলেন। এই পাঠে তিনি জেনেছিলেন—"ভূতদিগের দৃষ্টিশক্তি প্রখর নহে, তাহাদের বুদ্ধিও তীক্ষ্ন নহে। তাহাদিগকে অনায়াসে প্রতারণা করিতে পারা যায়।"

রাধামাধব স্থির করিলেন, "এই ভূতটাকে আমি ঠকাইতে চেষ্টা করিব।"

ভূতের দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধি অধিক নহে এই বিশ্বাসে তাকে ঠকানোর চেষ্টা করা—অত্যন্ত হাস্যকর। এরপর চীনেভূতের প্রতি রাত্রিতে ক্রমান্বয়ে আসা ও তার হাতটিকে পরীক্ষা করে দেখা এবং শেষে কোন এক চীনার কর্তিত দক্ষিণ হস্ত লাভ করে উল্লাসে নৃত্যকরা, পিঠে ও পরমান্ন পরম সন্তোষে আহার করা—সবই একাধারে হাস্যরসের ও ব্যঙ্গের। ভাগনে ও মাতুলের দিক থেকে লেখক তাদের দুজনের জীবনের দুইটি দুর্ভাবনার সমাধান করতে চেয়েছেন। দৈব মাতুলের জীবনে যে অভিশাপ বয়ে আনলো, রাধামাধবের আন্তরিক চেষ্টার মধ্যে দিয়ে দৈবই তাকে দূর করলো। মানুষের কার্য ও ভাবনা এবং তার পরিণামের মধ্যে কোথাও যেন কোন সাম্য নেই। নিতান্ত তামাসাচ্ছলে একদিন মাতুল চীনার হাতখানি চেয়ে নিয়েছিল, তার ভয়াবহ, প্রাণ-সংশয়-মূলক পরিণামের কথা তখন সে কোন মতেই ভাবেনি। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে হাতটি নষ্ট হয়ে গেল আর তাকে ভূত-ভয়ে দিনরাত জর্জরিত হয়ে থাকতে হল। রাধামাধব মামার উপকার করার জন্যে আসে নি। কন্যার বিবাহে মামার কাছ থেকে মোটা-রকমের কিছু আদায় করাই তার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সুযোগের অভাবে ও লজ্জায় মনের কথাটি প্রকাশ করতে পারলো না। মামাকে ভূত-মুক্ত করাতে সেই ইচ্ছা অতি সহজে ষোলকলায় পূর্ণ হল। মানুষের কাজ ও তার ফলে কোন সাম্য নেই। কোথা থেকে কার অদৃশ্য হস্ত ভাগ্যের চাকাটিকে ঘোরাচ্ছে। মানুষ শুধু ভাবে, শুধুই তার কাজের অহংকার করে। মানুষের এই ভাবনা, এই অহংকার লেখকের দৃষ্টিতে যেন হাস্যকর ও ব্যঙ্গের বলে মনে হয়।

"বিদ্যাধরীর অরুচি" (মজার গল্প) একটি সুন্দর হাসির গল্প। ধনীগৃহের ভৃত্য, ঝি, পাচকের রূপটি অতি সহজভাবে আঁকা হয়েছে। ধনীগৃহের কর্তা ও বিশেষ করে গৃহিণীরা যে সংসারে কি পরিমাণে অপদার্থ ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরূপে বেঁচে থাকেন, ও মাহিনা করা ব্যক্তিরাই সর্বস্ব হয়ে পড়ে সে চিত্র এখানে পাই। এই সুযোগে তারা সকলেই প্রায় সংসারের যা' কিছু পায় মনিবকে ফাঁকি দিয়ে তাই চুরি করে। বিশেষ করে খাওয়ার জিনিষের প্রতি

তাদের লোভ সর্বাগ্রে। এই গল্পে বিদ্যাধরীর অরুচি ও তার চেয়ে, লুকিয়ে খাওয়াকে কেন্দ্র করে, এবং তার মৃত্যুকামনা ও পাচক, গয়লা, মুদী ইত্যাদিকে তার সম্পত্তির অংশ দেবে বলে লোভ দেখিয়ে ভাল ভাল ও বেশী বেশী খাবার দ্রব্যাদি আদায় করাতে যথেষ্ট হাস্যরস সঞ্চিত হয়েছে। তবে এ সব লোক নিজেকে যত বুদ্ধিমানই মনে করুক না কেন এদের চালাকি বেশীদিন গোপন থাকে না। যখন তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন লাঞ্ছনার শেষ থাকে না। বিদ্যাধরী যতই লোক ঠকানোর ও মিথ্যা কথা বলার বিদ্যা আয়ত্ব করুক না কেন, আসলে তার বিদ্যার দৌড় অতি সামান্যই। মিথ্যা যত ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে হোক আর বৃহত্তর ক্ষেত্রে হোক চাপা থাকে না। আমরা কিন্তু এই সত্যটি কখনও মনে রাখতে চাই না। তাই অনেক সময়েই হাস্যের ও ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে পড়ি। ধনীগৃহিণীকেও লেখক ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন। তারা সব সময়ে যেভাবে অসুস্থতার নাম নিয়ে আলস্যে আর অবসরে, ওষুধে আর সেবায়, দিন কাটান তা' সম্পূর্ণরূপেই অসঙ্গতির। এই অসঙ্গতি ব্যঙ্গের যোগ্য।

"ভগবান্ অতি নির্দয়, মায়াতে ভুলাইয়া অগণিত জীবকে নানারূপ ক্লেশ প্রদান করিতেছেন,"—এই যে আমাদের ধারণা, বা দর্শনশাস্ত্রের এই যে একটি বিশেষ মতবাদ এরই প্রতি একটা মৃদু কটাক্ষ বা মৃদু ব্যঙ্গ যেন "মেঘের কোলে ঝিকিমিকি সতী হাসে ফিকিফিকি" এই গল্পটির মধ্যে দিয়ে লেখক দেখাতে চেয়েছেন। যদিও এ গল্প ভৌতিক পরিবেশ ও এক অবিশ্বাস্য কাহিনীর উপর স্থাপিত, তবু তার কিছু উদ্দেশ্য আছে। ভূতের গল্প শুধু ভূতের গল্পই নয়। এক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভোগ-বাসনার পরিতৃপ্তি এক জীবনেই নয়। হিন্দু জন্মান্তরবাদও এই মতকে সমর্থন করে। তাই হৃষিকেশের ও অন্নপূর্ণার মানসপটে পরস্পরের যে ছবি অঙ্কিত হযে যায়, ভৌতিক আবহাওয়ায় পড়ে তা' যতই অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব হযে পড়ুক না কেন, যতই অসঙ্গতিকর বলে মনে হোক না কেন, এর যে গূঢ়তর অর্থ আছে তাকেই লেখক দেখিয়েছেন। মানুষের মনে ভগবান যে দয়া মায়া ভালবাসার বীজ বপন করেছেন তাতে তাঁর নির্দয়তার প্রমাণই ঘটে না। তিনি অসীম দয়াময় বলেই মানুষের মনে মায়া ভালবাসা দিয়েছেন। যশোদা গোয়ালিনীর মনে এই দয়া ছিল বলেই তার মৃত্যুও তাকে মুক্তি দিতে পারেনি। জীবিত অবস্থায় সে পাপ কাজ করেছিল, ডাকাতদের সে দ্বার খুলে দিয়েছিল। আর সেই সুযোগে ডাকাতগণ গৃহে প্রবেশ করে, ও বিবাহ-রাত্রেই হৃষিকেশকে হত্যা করে ফেলে। এই পাপ-

কার্যই যশোদাকে মুক্তি দেয় নি। ভূত হয়েও তাই তার মনে সব সময় একটা চিন্তাই জেগেছে। পুনরায় হৃষিকেশ ও অন্নপূর্ণাকে মিলিত করবার বাসনায় সে দিনের পর দিন নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছে। অবশেষে তাদের মিলনের পরেই তার ভূত-জীবনের অবসান হয়েছে, সে মুক্তি পেয়েছে। যশোদার মনে দয়া-মায়ার কিছু অংশ ছিল বলেই মর্ত লোকের ছুটি মানব-মানবীর জীবন বিবাহ-মিলনে আবদ্ধ হতে পারলো। সুতরাং এ সংসারে যতই কদর্যতা, পাপ থাক না কেন, তারই পাশাপাশি স্নেহ প্রেমও আছে। তাই জগৎ-সংসারে মানুষ মায়ায় বদ্ধ, ঈশ্বরের এ এক নিদারুণ অভিশাপ নয়, এ তাঁর নির্দয়তা নয়, এ তাঁর দয়ারই প্রকাশ। আমরা আমাদের জন্মের মধ্যে দিয়ে আত্মীয়-স্বজনের, পরের উপকারই সাধন করি। আমাদের সত্য আশ্রয় ও শুভ কার্যই আমাদের আবার সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে যায়। লেখক তাঁর জীবনে উপলব্ধ গভীরতর সত্যকেই এ গল্পে স্থান দিয়েছেন। জগৎ মায়াময়, এই মায়াই আমাদের দুঃখের দিকে টানছে এ মতবাদের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ করাই তাঁর লক্ষ্য। গল্পটি তাই ব্যঙ্গাত্মক।

"এক ঠেঙো ছকু" (মজার গল্প) এই গল্পের নামকরণই বলে দেয় গল্পটি ব্যঙ্গাত্মক। ছকু কিভাবে তার একটি পা হারিয়েছিল তারই হাস্যকর কাহিনী এখানে আছে। শুধু ছকু কেন, সেই গাঁজার আড্ডায় প্রত্যেকটি লোক, ছকুর শ্বশুর, শাশুড়ী, সকলকেই লেখক ব্যঙ্গ-দৃষ্টিতে দেখেছেন, তাই প্রত্যেককে এমনভাবে গল্পের মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন যে প্রত্যেকের কথা, আচরণ হাস্যকর হয়ে উঠেছে। গল্পটি যারা উপভোগ করছে ও যে বলছে প্রত্যেকেই পুরোপুরি নেশাখোর। "তিন ছিলিম গাঁজায় ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাহার উপর আসল জিনিষটি" ঢেলে এই গল্পের আসর জমে উঠেছে। তাই এই মাতালদের কথাবার্তায়, ভাবনা-কল্পনায় কিছু কিছু অসঙ্গতি যে ঘটবেই, তাতে আর সন্দেহ কোথায়। ছকু চরিত্রকে বিশেষভাবেই যেন হাস্যকর করে দেখানো হয়েছে। ছকুর পত্নীবিয়োগ হয়েছে, তবু সে শ্বশুর-বাড়ীতে থাকতে লজ্জাবোধ করে না। শ্বশুর, শাশুড়ীর প্রতি যে তার শ্রদ্ধা আছে তাও নয়, বরং তাঁদের হেয় চক্ষে দেখাই তার কাজ। তবু সেখানে থাকে। আসলে তার কোন লজ্জাবোধ নেই। শশুরের মত ছকুরও বড় মানুষ হবার সাধ ছিল। শ্বশুর অতিশয় কৃপণতা ও ছল-চাতুরীর সাহায্যে সমধিক অর্থ করতেন। ছকু সেরূপ করেনি। তবু একবার সে ভূতের কৃপায় একবাক্স

টাকার গোপন স্থানটি দেখেছিল। সেই টাকার সম্পূর্ণ মালিক হওয়ার জন্যে তার যে অধীরতা, ভাবনা, গোপনে গোপনে চেষ্টা সবই অতিশয় হাস্যকর। অতি লোভকে, বিশেষ করে আমাদের অর্থলোলুপতাকে লেখক ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন। এই অর্থলোলুপতা অনেক সময় আমাদের পাপের পথে টেনে নিয়ে যায়। অসৎ উপায়ে যে ধন-অর্জন তার পরিসমাপ্তি হয় অপব্যয়ে, শাস্তি ভোগের মাধ্যমে। সেই একবাক্স টাকার মালিককে যেতে হয় দ্বীপান্তরে, শ্বশুরকে কারাগারে, আর ছকুকে পা হারিয়ে অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয়। তাই এই লোভ, মিথ্যা, ব্যঙ্গের বিষয় হবেই। এ ছাড়া ক্ষুদ্র দু' একটি ছবিতেও ব্যঙ্গ আছে। যেমন পূজার দিন সেই সখের যাত্রার আসরের চিত্র। "যাত্রাদলের বালকেরা কেহ ছোঁড়া, কেহ ছুঁড়ী সাজিয়া কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া চিল-চেঁচাইতে লাগিল।" অভিনয় না বলে চিল-চেঁচানো বলার মধ্যে কটাক্ষ আছে। তা' ছাড়া, সর্বাঙ্গসুন্দরীর জন্যে শাশুড়ীর ক্রন্দন ব্যঙ্গাত্মক, "ওগো মা গো! তুই আমার যে বড় সাধের মেয়ে ছিলি। তোর যেমন রূপ তেমনি গুণ ছিল। সেই জন্য আমরা যে তোর সর্বাঙ্গসুন্দরী নাম রাখিয়াছিলাম।" কিন্তু আমরা জানি যে, কন্যার রং চক্‌চকে কাল, বার্ণিস জুতার মত, সম্মুখ দিয়ে চলে গেলে মনে হত যে কাল বিজলী খেলে গেল। সুতরাং সর্বাঙ্গসুন্দরী নামকরণ ও তারজন্যে উচ্চৈস্বরে সুদীর্ঘ দিন পরে ক্রন্দন যেমন হাস্যকর তেমনি ব্যঙ্গাত্মক। সবশেষে, আমাদের তৎকালীন গ্রাম্যজীবনের নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণকে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন। কতগুলি নীচ মানুষ শুধু গ্রামে কেন সহর অঞ্চলেও আছে। সর্বত্রই আছে। যাদের নীচতা ব্যঙ্গের যোগ্য। এই গল্পে মাধবকে ষড়যন্ত্র করে যেভাবে অপমান করা হয় ও তাতে আমোদ উপভোগ করা হয়, তা শ্বশুর ও ছকুর হীন মনের পরিচয়কে প্রকট করে তুলেছে। ছকু বলল, "শ্বশুরের সহিত পরামর্শ করিয়া পূজার সময় মাধবকে আমি নিমন্ত্রণ করিলাম। মাধব দুই টাকা প্রণামী দিলেন। পাড়ার অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সহিত তাঁহাকে ভোজনে বসাইলাম। এমন সময় সেই স্থানে শ্বশুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটু দূরে থপ করিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর মাধবের দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—"ও কে? ও যে বড় ব্রাহ্মণের সহিত বসিয়াছে! ওর জাত গিয়াছে! তুমি এখনি উঠিয়া যাও।"

মাধব বলিলেন,—"তবে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কেন?"

কান খুঁটিতে খুঁটিতে শ্বশুর বলিলেন,—কি বলিলে ?"

মাধব পুনরায় বলিলেন—"তবে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কেন ?"

শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাকে কে নিমন্ত্রণ করিয়াছে ?"

মাধব উত্তর করিলেন—"আপনার জামাতা।"

শ্বশুর বলিলেন,—"মাথা নাই তার আবার মাথা-ব্যথা। আমার কন্যা কোথায় যে আমার জামাতা! এখনি উঠিয়া যাও, নতুবা গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইব!"

আর কোন কথা না বলিয়া মাধব উঠিয়া গেলেন।

মাধবকে অপমান করিয়া শ্বশুর মহাশয়ের ঘোরতর আনন্দ হইল। বাড়ীর ভিতর গিয়া বিছানায় বসিয়া তিনি ডুকুরে ডুকুরে হাসিতে লাগিলেন।"

শ্বশুরই শুধু যে হাসতে লাগলেন তা নয়, ছকুও ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানায় শুয়ে হাসতে লাগলো। এ হাসি নীচতার হাসি। একটি প্রাণকে অপমানিত, লাঞ্ছিত করে যারা সুখ অনুভব করে, জয়লাভের বিজয় উল্লাসে গর্বিত হয়ে উঠে, তাদের সে সুখানুভূতি, গর্বিত উল্লাস, সর্বাংশে হাস্যকর। লেখক তাই এই ধরনের ব্যক্তিকেও এখানে ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে দেখেছেন।

মুক্তা-মালা

"মুক্তা-মালা" কতগুলি গল্পের মালা। তবু এগুলি যেন শুধু গল্পই নয়। লেখকের উদ্দেশ্য যেন গল্পকে ছাড়িয়ে চলে গেছে। সারাজীবনের সঞ্চিত শিক্ষা-দীক্ষা, অনুভূতি অভিজ্ঞতা, মুক্তা-মালার গল্পগুলিতে মুক্তার মত ছড়িয়ে আছে। তিনি যেমন দেখছেন মানুষের সীমাহীন লোভ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, নীচতাকে, তেমনি তার কিছু দয়া, মায়া, উপচিকীর্ষা, ও ক্ষমায় ভরা হৃদয়কে। মানুষ যদি ধর্মকে হারিয়ে, হৃদয়কে ভুলে জীবনের পথে এগিয়ে যায় তবে তার ভয়াবহ পরিণতি কোথায়, তাকেও তিনি অনুভব করেছেন। বাইরের থেকে যদি কোন শাস্তি না-ও আসে, তবু যেন অন্তরের পীড়নের শেষ হয় না। জীবনের সত্যকে তিনি জীবন দিয়ে যেন অনুভব করেছেন। তাঁর সেই অনুভবকে গল্পাকারে রূপ দিয়েছেন। উদ্দেশ্য মানুষকে সৎ আর সুন্দর করে তোলা। আশাবাদী লেখক অধর্ম আর অসত্য দেখে ভয় পান না। বিশ্বাস রাখেন, এরই মধ্যে থেকে জন্ম নেবে সত্য আর ধর্ম। তাঁর এই বিশ্বাসই তাঁকে নির্মম করেনি। এইসব কাহিনীতে যে ব্যঙ্গ আছে তা অতি প্রচ্ছন্ন। তাকে ঠিক যেন ব্যঙ্গ বলে মনে হয় না। তবু তা যে ব্যঙ্গ তাতে সন্দেহ নেই, তবে এর আবেদন বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে।

ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের যে হৃদয়হীন আচরণ তাকেই রূপ দিয়েছেন সুবল গড়গড়ি মহাশয়ের গল্পে। সুবল গড়গড়ি অতি সাধারণ মানুষ, তাঁর মধ্যে আছে সৎ-বুদ্ধি, সৎ-প্রেরণা, ও আন্তরিক ভালবাসা। ছোট ভাই অক্রুর যত নীচ হোক না কেন তাকে তিনি ক্ষমা না করে পারেন না। কিন্তু মানুষ যখন ভ্রমে পতিত হয়, তখন সে যে কি হয়ে যায় তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। তাই বুঝি লেখক অক্রুরকে এঁকেছেন। তার স্বভাবে কোথাও এতটুকু ভাল নেই। সে শুধুই মন্দ। এই নিরবচ্ছিন্ন মন্দকে সংস্কার করাই যেন লেখকের সাধনা। তাই অক্রুর-চরিত্রের সর্ববিধ অন্যায়কে, অমানবিকতাকে তিনি নিষ্ঠাসহকারে অঙ্কন করেছেন। অক্রুর হৃদয়হীন, মদ্যপায়ী, অসৎ-সঙ্কারী, মিথ্যাভাষী, মূর্খ। এইজন্যেই সে দেবতার ন্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান, অত্যাচার, যাতনা, ও অপবাদ দিয়ে অজ্ঞান করেছে। তার এই কার্যে যারা সহায়তা করেছে তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত এক একজন বিশেষ ব্যক্তি। যেমন

সেই গ্রামের সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গুরুদেব, ডাক্তার প্রভৃতি। একটা ভাল মানুষের লাঞ্ছনার দৃশ্যে তারা সবাই হর্ষোৎফুল্ল। অক্রুরের সঙ্গে লেখক এদের সবাইকে এনে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। এদের সকলের হৃদয়-হীনতায়, বুদ্ধিহীনতায় তিনি স্তম্ভিত, বিস্মিত। তাই মানুষের সেই বিকৃত মনোভাবকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। খণ্ড খণ্ড দৃশ্যে সে ব্যঙ্গ ছড়িয়ে আছে।

এমনি একটি দৃশ্য রচিত হয়েছে গুরুদেবকে নিয়ে। সুবল গড়গড়ির কুলগুরু যিনি তিনি যে কি ধরনের লোক তা তাঁর বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপে দেখা যায়। অর্থের জন্যে তিনি যে কোন কাজই করতে পারতেন। তাঁর কাছে অন্যায় বলে কোন কাজই ছিল না। নীতিহীন, ধর্মহীন, হৃদয়হীন এই গুরুটির যে কি জঘন্য স্বভাব তার কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হল। সুবল গড়গড়ি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। ঠাকুর মহাশয়ের দক্ষিণ পদ কিছু স্থূল ছিল, অর্থাৎ সে পায়ে গোদ ছিল। সেই স্থূল পাদপদ্মটি তিনি তাঁর মস্তকে তুলে দিলেন। গোদের গ্যাঁজ হ'তে রস প্রবাহিত হয়ে তাঁর মস্তক সিক্ত হল, দু-চার ফোঁটা তাঁর চোখের উপর দিয়ে বয়ে পড়লো। এর পরেও তিনি নানা রূপ আশিস্ বচনে সুবল গড়গড়িকে সম্ভাষণ করতে ভোলেন না। হয়তো সুবলের মত ভাল মানুষকে বশ করাই তার কারণ। অক্রুরকে হাত করে তো তাঁর অর্থাগমের পথ কিছু উন্মুক্ত হয়েছিল, এখন জ্যেষ্ঠকে যদি হাত করা যায় এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। তাই বোধহয় তাঁকে কুটিরের অভ্যন্তরে নিয়ে যান। কুটির-অভ্যন্তরে গিয়ে আমরা গুরুদেবের এক অতি নিষ্ঠুর হৃদয়ের পরিচয় পাই। সেখানে একটি ছাগলের খোয়াড় ছিল, খোয়াড়ের মধ্যে ঠেসাঠেসি করে একসঙ্গে অনেক ছাগল ছিল। এদের দুঃখ-কষ্টকে গুরুদেব স্বীকার করতে চান না, বলেন ব্যবসার জন্যে অমন একটু নিষ্ঠুর হতেই হয়। কিছু উদ্ধৃতি দিলে হয়তো গুরুদেব-প্রকৃতির লোকগুলিকে চেনা সহজতর হবে।

আমি বলিলাম,—"ঠাকুর মহাশয়। আপনার ছাগলগুলির বোধ হয় বড় জল পিপাসা পাইয়াছে।"

গুরুদেব উত্তর করিলেন,—"দুই একদিনে সমুদয় শেষ হইয়া যাইবে। জল দিবার আর আবশ্যক নাই।"

আমি বলিলাম,—"উহাদের ক্ষুধাও বোধ হয় পাইয়াছে।"

গুরুদেব বলিলেন,—"ক্ষুধা নিশ্চয় পাইয়াছে। আজ তিন দিন উহাদিগকে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"উহাদিগকে কি খাইতে দেন?"

গুরুদেব উত্তর করিলেন,—"খাইতে! খাইতে আবার কি দিব! খাইতে দিলে আর ব্যবসা চলে না।...... সাত আট দিনের অধিক ইহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হয় না। সাত আট দিনের মধ্যেই এক এক খেপ শেষ হইয়া যায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"একটু একটু জল পান করিতে দেন না কেন?"

গুরুদেব উত্তর করিলেন,—"উহারা গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। পিপাসায় উহাদের জ্ঞান নাই। জল দিলে বড়ই গোলমাল করে।......পূর্বে দুই এক দিন অন্তর এক আধ কলসী জল দিতাম। কিন্তু জল দেখিলে তাহা পান করিবার নিমিত্ত বড়ই হুড়াহুড়ি করে। সেজন্য আর দিই না।"

এবার পাঁঠা বিক্রয়ের দৃশ্যটিতে আমরা আসতে পারি।

"যে স্থানে আমি বসিয়াছিলাম, তাহার নিকটে দুইটি খোঁটা ভূমিতে প্রোথিত ছিল। পাঁঠাকে ফেলিয়া ঠাকুর মহাশয় তাহাকে সেই খোঁটায় বাঁধিলেন। তাহার পর তাহার মুখদেশ নিজের পা দিয়া মাড়াইয়া জীয়ন্ত অবস্থাতেই মুণ্ডদিক হইতে ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঁঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সুতরাং সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি তাহার কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে এরূপ বেদনাসূচক কাতরধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহাতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার চক্ষু দুইটি! আহা! আহা! সে চক্ষু দুইটির দুঃখ আক্ষেপ ও ভর্ৎসনাসূচক ভাব দেখিয়া আমি যেন জ্ঞান-গোচরশূন্য হইয়া পড়িলাম। সে চক্ষু দুইটির ভাব এখনও মনে হইলে আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে।...... "

ঠাকুর মহাশয় উত্তর করিলেন,—"চুপ! চুপ! বাহিরের লোক শুনিতে পাইবে। জীয়ন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে ভিতরে অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্মে এক প্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়।"......লেখক এই দুই আনা অধিক লাভের আশাকে আমাদের

মন থেকে মুছে ফেলতে চান। তিনি আমাদের ঐ অতিরিক্ত লোভ থেকে মুক্ত করতে চান। শুধু মানুষের ব্যথাতেই তাঁর অন্তর কাঁদে না। তাঁর কান্না পশুপাখী প্রভৃতি ইতর প্রাণীর জন্যেও। তাঁর গল্পের নানাস্থানেই এই জীবজন্তুর প্রতি মমতার কথা প্রকাশ পেয়েছে। গুরুদেবের নির্দয়তাকে তিনি যে কিভাবে অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিলেন তা নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে বুঝি।

"আর একবার আমি পাঁঠার চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সেই চক্ষু দুইটি যেন আমাকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলিল,—"আমি দুর্বল, আমি নিঃসহায়, এ ঘোর যাতনা তোমরা আমাকে দিলে, মাথার উপরে ভগবান কি নাই!" লেখকের এই অনুভব স্পষ্টই যেন জগতের ঐ কসাই শ্রেণীর নিষ্ঠুর লোকগুলোকে ব্যঙ্গ করে। যারা অসহায় যারা দুর্বল, তাদের পরে নির্যাতন করে লাভের কড়ি ঘরে এনেও আমরা লাভবান হই না। কেননা সবার উপরে যেন কার অদৃশ্য হস্ত ক্রিয়াশীল রয়েছে। অন্যায় বা পাপের শাস্তি যে ভাবেই হোক মাথা পেতে আমাদের নিতেই হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে, ধর্মকে মনে রেখে, মানুষ যেন মানুষ থাকে; সে যেন নির্দয়, নিষ্ঠুর, পাষণ্ড হয়ে না যায়, লেখকের অন্তরের এই একমাত্র কামনা।

আর একটি ঘটনা। এর মধ্যেও মানুষের ইতর মনের প্রকাশ দেখে লেখক দুঃখ পান। তাই সেই ছোট-মনা মানুষগুলোকে তিনি ব্যঙ্গ করতে চান। একদিন গড়গড়ি মশাই একটি কলেরা রোগাক্রান্ত রোগীকে একান্ত অসহায় ভাবে মাঠের মাঝখানে পড়ে থাকতে দেখলেন। লোকটির কাতর যন্ত্রণায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তিনি তাকে বুকে করে বাড়ী নিয়ে এলেন ও সেবা-শুশ্রূষা করলেন। রোগীটি বাঁচল না। তিনি একাই এই মৃতের সৎকার করেছিলেন। এজন্যে তাঁকে এক ঘরে হতে হয়। আর এই কার্যে যিনি প্রধান ছিলেন তিনি ঐ ঠাকুর মশাই। ঠাকুর মশাইয়ের উদ্যোগেই সকলে তাঁকে এক ঘরে করেছিলেন। কিন্তু গড়গড়ি মশাই তাঁর দোষ স্বীকার করতে গিয়ে বলেছেন,—

"গ্রামের লোক যে নিতান্ত অন্যায় কথা বলিল, তাহা নহে। বরং আমি নিজেই যে অন্যায় কাজ করিয়াছি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কি করিব! সেই অনাথ লোকটিকে সে অবস্থায় মাঠের মাঝখানে ফেলিয়া আসিতে আমি পারি নাই।" এই একটিমাত্র কথাতেই লেখকের সমগ্র অন্তরখানির পরিচয় পাই। তাঁর যেন উদ্দেশ্য আমরাও যেন খানিকটা

দয়াবান হই, যাতে মানুষের বিপদে এগিয়ে যেতে পারি, তাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে না আসি। তৎকালীন সমাজের নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার প্রতিই এ অংশে ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে।

মানুষ যখন একবার নীচে নামতে থাকে তখন সে কোন অন্যায়কেই অন্যায় মনে করে না, কোন পাপকেই আর পাপ বলে ভাবে না। শুধুই নিজের স্বার্থকে মিটিয়ে যায়, নিজের লোভকে চরিতার্থ করে। এই লোভী, স্বার্থপর মানুষগুলো তখন যেন কোন অন্ধ মাতাল নেশায় ছুটে চলে। এরা তখন সম্পূর্ণভাবেই ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। অক্রুর ও তার বন্ধুবর্গ এবং গ্রামের সেই হাতুড়ে ডাক্তারটিও এই একই কারণে ব্যঙ্গের পাত্র। নিরপরাধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যেভাবে তারা পাগল প্রতিপন্ন করে' সমস্ত সম্পত্তির মালিক হতে চেয়েছিল তাতে তারা বিরাট ভুল বা পাপ করেছিল। ভুল করাকে আমরা ব্যঙ্গ করতে পারি না। কেননা মানুষ মাত্রেই ভুল করে। কিন্তু কোন ভুল বা পাপকার্য যখন উদ্দেশ্যজনক ভাবেই অনুষ্ঠিত হয় তখন তা ঘৃণ্য হয়ে পড়ে, ব্যঙ্গের হয়। অবশ্য অক্রুর, তার গুরুদেব ও ডাক্তার সকলেই তাদের পাপের শাস্তি পেয়েছিল। অক্রুরের জীবনের শেষ-ছবির দিকে তাকালে দেখতে পাই যে তার জীবনে কোন সুখ নেই। উচ্চ ছাদের উপরে বসে মদ খেতে খেতে সে একটা চিলকে উড়ে যেতে দেখে। দেখে তারও চিলের মত উড়বার সাধ হয়। তারই ফলে ছাদ থেকে পড়ে যায় ও পা ভাঙে। দু'টি পা হারিয়ে কাঠের পা নিয়ে সে চলাফেরা করতো। সব চাইতে হাসির যে তার স্ত্রী অতি শক্ত স্ত্রীলোক। স্বামীকে বশে রাখতে হয় কিভাবে সে জানে। এই স্ত্রীর সঙ্গে অক্রুরের সর্বদাই কলহ চলত। কলহ হলে তার স্ত্রী সেই কাষ্ঠ-নির্মিত পা দু'খানি লুকিয়ে রাখতো। এই সময় অক্রুর দুই হাতের সাহায্যে স্ত্রীর নিকট যেত এবং বহু সাধ্য-সাধনা করার পরে সেই কাঠের পা দু'টি স্ত্রীর নিকট হতে লাভ করে যেন ধন্য হয়ে যেত। অক্রুরের জীবনের এই দুঃখের মধ্যে যেন হাস্য ও ব্যঙ্গ দুই-ই দেখা যায়। তার জীবনে কোন প্রকার সুখ ছিল না, অনেকগুলি পুত্রকন্যার শোকও লাভ করেছে। তবু তার স্বভাব পরিবর্তিত হয়নি। "সে এখন গ্রামের দলের দলপতি হইয়াছে। কে কি খায়, কে কি করে, সর্বদা সে সেই সন্ধানে থাকে। লোককে একঘরে করিতে পারিলে, অথবা কাহারও কোনরূপ মন্দ করিতে পারিলে, সে পরম সন্তোষ লাভ করে। কিন্তু তাহার সংসারে সুখ নাই।" অক্রুর যখন প্রথম জীবনে

পাপ কার্য করতো তখনও সে নিজের কথা ভাবতো না, আজ এত দুঃখে পড়েও নিজের আত্মার কথা ভাবে না। অক্রূরের পাশাপাশি গুরুদেব ও সেই ডাক্তার, যে বুকে হাঁটু দিয়ে গড়গড়ি মশাইকে ওষুধ খাইয়েছিল, সকলেই সমান শাস্তিই পেয়েছে। এদের চরিত্রের কলুষকে ব্যক্ত করে লেখক মানুষের মধ্যে কিছুটা ধর্মবোধকে জাগাতে চেয়েছেন।

মানুষ তার স্বভাবের দোষগুলিকে যেমন কোন মতেই অতিক্রম করতে পারে না তেমনি গুণগুলিকেও। এমন কি মৃত্যুর পরে এসেও নয়। এরই একটা সুন্দর চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে নস্কর মশায়ের চরিত্রে। মানুষটি জীবিত অবস্থায় অতি সৎ ছিলেন। তাই মৃত্যুর পরেও তিনি তাঁর সেই সৎ স্বভাবকে ভুলতে পারেন না। সুবল গড়গড়ির দুঃখে ব্যথিত হন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গড়গড়ি মশাইকে মুক্ত হওয়ার পথটি বলে দেন।

হিন্দু-দর্শন-মতানুসারে আমরা জানি যে হিন্দু জীবাত্মার ক্রমশ উর্ধ্বগতি হয়। লেখক যেন এই মতবাদকে প্রচ্ছন্নভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। নস্কর মহাশয়ের কলসীরূপ ধারণ ও জগবন্ধুর মায়ের একখানি খুরি রূপ গ্রহণ তাই সুবল গড়গড়ি মহাশয়ের নিকট অতি আশ্চর্যের বলে বোধ হয়।

আমি বলিলাম,—“জীবিত অবস্থায় আপনি একজন সাধু পুরুষ ছিলেন, তবে কেন আপনাকে সামান্য একটি মেটে কলস হইতে হইয়াছে ?”

নস্কর মহাশয় অর্থাৎ কলসী উত্তর করিলেন,—“আমি তো তবু অনেক ভাল দ্রব্য হইয়াছি। জগবন্ধুকে জান ? জগবন্ধুর মা মরিয়া সামান্য একখানি খুরি হইয়াছে।”

আমি বলিলাম,—“আমি শুনিয়াছি যে, জীবাত্মার ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়। কুম্ভকারের দ্রব্যে পরিণত হইলে জীবাত্মার উন্নতি কিরূপে হয় ?”—এই প্রশ্নটিকে তুলে ধরে লেখক যেন জীবাত্মার ক্রমউন্নতির যে ধারণা তাকেই ব্যঙ্গ করেছেন। এ জন্মে যেমন, পরজন্মেও তেমনি সৎ বা সাধু লোককেই বেশী দুঃখবরণ করতে হয়। মানুষ বলে, সৎ-জীবন ধারণ করলে সুখে জীবন কাটানো যায় ও পরলোকের বিচারেও জীবের উন্নতি বিধান হয়। যদি তা হত তবে নস্কর মহাশয়কে একটি শূন্য কলস হয়ে পড়ে থাকতে হত না, আর ইহজীবনে সৎ হয়ে গড়গড়িকে তাঁর ভাইয়ের হাতে এত নির্যাতন, দুঃখ সহ্য করতে হত না। তাঁরা দু'জনেই সজ্জন বলেই তাঁদের দুঃখকে সহ্য করতে হচ্ছে।

বিপদে আমরা যে কি না করতে পারি তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যাই। যে লক্ষ্মীর মোহরটিকে পূজা না করে কখনও জলগ্রহণ করি না বিপদের সময় কেমন অবলীলাক্রমে আমরা তাকে আমাদের দিন চলার পাথেয় করে নিই। গড়গড়ি মশাইও তাই করেছিলেন। তাঁর যেন মনে হল যে নক্কর মহাশয় তাঁকে বলছেন,—"সুবল! লক্ষ্মীর ভিতর যে মোহরটি আছে, তাহা বাহির করিয়া লও। এ বিপদের সময় তাহা লইতে দোষ নাই। ইহাতে তোমার পথ-খরচা হইবে।" এ আদেশ অমান্য করবার শক্তি গড়গড়ি মশাই-এর ছিল না। অন্যত্র দেখি, গড়গড়ি মশাই গির্জার চূড়ায় ঘুরতে ঘুরতে অনোন্যোপায় হয়ে কাকের মাংস ভক্ষণে ক্ষুধা ও রক্তপানে তৃষ্ণা নিবারণ করেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "বলিতে আমার লজ্জা হয়, জীবন ধারণের নিমিত্ত এই সময় আমি একটি উপায় আবিষ্কার করিলাম। এরূপ অবস্থায় পড়িলে মানুষের ভাল-মন্দ বিচার থাকে না।" মানব স্বভাবের এই অসঙ্গতির চিত্রের মধ্যে হাস্যরস আছে। একে লেখক কিছুটা কটাক্ষও করেছেন।

মানুষের মনে একটা অকারণ ভয় যেন সদা সর্বদা উঁকি-ঝুঁকি মারছে। যেন কি হবে, এই আতঙ্কে সে যেন কখনও কখনও ম্রিয়মান হয়ে থাকে। যদিও এরূপ হওয়ার মধ্যে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সুবল গড়গড়ির মনেও এক অজানা ভয়ের বাসা ছিল। তাঁর অজ্ঞানতার অবসরে সেই ভয়ই যেন নারকেলমুখী, লাউমুখী ইত্যাদি হয়ে তাঁর সামনে দেখা দিয়েছে। কখনও তিনি দেখেছেন তিনি অসহায়ভাবে গির্জার মাথায় ঘুরছেন, সকলকে ডাকছেন কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিচ্ছে না, তারপর ঘুড়ীর সঙ্গে ওড়া, সমুদ্রের মধ্যে ঝিনুকের সাহায্যে ভেসে চলা, বিজন অরণ্যে বাঘের সম্মুখীন হওয়া, আত্মরক্ষার্থে গাছের উপরে আশ্রয় লওয়া, আবার কখনো দেখেছেন নারকেলমুখী তাঁকে বিবাহ করবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে আর সেই ভয়ানক স্বভাব ও আকৃতির ডাকিনীর ভয়ে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। ডাকিনীকে বিবাহ করবার ভয়টি অতি হাস্যের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। নারিকেলমুখীরূপী ভয়ানক রমণীকে বিবাহ করার ভীত বিহ্বল ভাবটি নিয়ে অতি স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। এই ভয় বিহ্বলতাকে যেন লেখক কতকটা ব্যঙ্গ করেছেন।

"অতি মিনতি সহকারে আমি ভূমিকম্প মহোদয়কে বলিলাম,—"মহাশয়! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, তাহা আমার শিরোধার্য। কিন্তু মহাশয়!

আমি হইলাম মানুষ, ইনি হইলেন ডাকিনী। ইহার সহিত কিরূপে আমার পরিণয় হইতে পারে? তাহা ব্যতীত ঘরে আমার আর একটি পত্নী আছেন। সপত্নীর নিকট গিয়া আপনার নাতিনীর সুখ হইবে না।”

ভূমিকম্প ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—“সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমাকে আমরা ছাড়িয়া দিব না। নারিকেলমুখী তোমাকে ভেড়া করিয়া চিরকাল এইস্থানে রাখিয়া দিবে।”

আমি বলিলাম,—“সে সুখের কথা বটে। কিন্তু মহাশয় এরূপ সুপাত্রীর উপযুক্ত পাত্র আমি নই।”

এই কথা শুনিয়া নারিকেলমুখী ঈষৎ হাসিয়া আমার প্রতি কটাক্ষবান নিক্ষেপ করিল। পুনরায় ঈষৎ হাসিয়া ভেক সংযুক্ত নোলকটি একবার নাড়িল। তাহার অপূর্ব রূপ ও হাব-ভাব দেখিয়া আমার মন একেবারে মোহিত হইয়া গেল। আমি ভাবিলাম যে, মৃত্যু হউক, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, তথাপি এ কদাকার ডাকিনীকে আমি বিবাহ করিতে পারিব না।”

ভয় ও বিপদের মুখোমুখী হয়ে মানুষ তার যতগুলি বুদ্ধি, বিদ্যা জানা আছে সবগুলির প্রয়োগ করে। সুবল গড়গড়ি সেগুলির সবই করেন। কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হ'ল না, তখন তিনি মুণ্ডদের আদেশই পালন করতে লাগলেন। একের পর এক করে ক্রমান্বয়ে দশটি গল্প বলে গেলেন। এই গল্পগুলি বর্ণনা কুশলতায়, উৎকণ্ঠা-সৃষ্টি ক্ষমতায়, কল্পনায় ও ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। তবুও বলতে পারি যে এ গল্পগুলি শুধু গল্পই নয়। অর্থাৎ শুধু গল্প বলাই লেখকের লক্ষ্য নয়। গল্পের মধ্যে মধ্যে ব্যঙ্গের মৃদু ঝলকানি গল্পগুলিতে এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। তবে এ ব্যঙ্গের রীতি কিছু স্বতন্ত্র। জ্বলন অপেক্ষা শীতলতাই অধিক। আক্রমণ অপেক্ষা সংশোধনের চেষ্টাই প্রবল। মানব-স্বভাবের সত্যস্বরূপের আবিষ্কার করে লেখক যেন তার ভুলগুলিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তবে সব গল্পেই যে ব্যঙ্গ আছে তা নয়।

সুবল গড়গড়ি মায়ের গলায় মুণ্ডমালাকে লক্ষ্য করে যে গল্প বলেছিলেন তার প্রথমটি হল “আদুরী ও আরসী”। এই গল্পের মধ্যে ব্যঙ্গের দুটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রথমতঃ আদুরীর মাতামহীকে অবলম্বন করে আর দ্বিতীয়টি আদুরী তার মা ও তাদের ভাগ্যকে অবলম্বন করে। আদুরীর দিদিমা অতি সাহসী মহিলা। তিনি নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করেও এক অপরিচিত বিদেশী সাহেবের প্রাণকে রক্ষা করলেন। তাঁর এই সৎ-সাহস-এর উদাহরণ সত্যই

দুর্লভ। আমরা সর্বদা নিজেরটুকু লইয়া এত ব্যস্ত যে, পরের, বিশেষ করে কোন বিদেশীকে উন্মত্ত পশুর হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে যেতে ভয় পাই। আমাদের ভীরুতা আদুরীর দিদিমার সাহসের কাছে ব্যঙ্গের বলে বোধ হয় লেখকের মনে হয়েছে। তাছাড়া আদুরীর দিদিমার সাহসিকতার সঙ্গে তাঁর দুঃখকেও লেখক অবলোকন করেছেন। সাহেব যখন আদুরীর দিদিমাকে বললেন, "তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, তোমার ঋণ আমি কিছুতেই শুধিতে পারিব না। তুমি আমার সঙ্গে চল, ভাল ডাক্তার দেখাইয়া তোমার চিকিৎসা করাইব।"—তখন তিনি উত্তর দিলেন,—"তোমার সহিত সহরে যাইলে, ডাক্তারের ঔষধ খাইলে, আমার জাতি যাইবে। আমি ঘরে লোহা পোড়াইয়া দিব, কলার ভিতর করিয়া সুলতানি বনাত খাইব; তাহা করিলেই ভাল হইয়া যাইব। আমি বৃদ্ধা বিধবা, আমাদের সহজে মৃত্যু হয় না।" আমাদের পল্লী-সমাজের অজ্ঞতা ও বৈধব্যের কারুণ্য দুই-ই এখানে আছে। লেখক সেই সমাজের অজ্ঞতা ও কঠিন বিধানকেই ব্যঙ্গ করেছেন। সাহেব আদুরীর দিদিমাকে উপকারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ যে চামড়ার থলিটি দিয়েছিলেন তাতে কয়েকটি টাকা ও একটি একশ' টাকার নোট ছিল। এই নোটখানি তাদের গরীবের সংসারে যে অবাক বিস্ময়ের সূচনা করেছিল তার মধ্যে অসঙ্গতি ও হাস্যরসের সঙ্গে দারিদ্র্যের উজ্জ্বল সাক্ষর রয়েছে।

"বাটী আসিয়া আদুরীর আয়ী মণিব্যাগ খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার ভিতর পাঁচটি টাকা ও ছোট একখানি ছাপার কাগজ রহিয়াছে। টাকা কয়টি লইয়া তিনি কাগজখানি ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু আদুরীর মা বলিলেন,—"মা! কাগজখানি ফেলিও না, এ হয় তো সামান্য কাগজ নয়; সেই যারে বলে নোট, এ হয় তো তাই। হাটবার দিন হাটে গিয়া গদাধর কাপড়-ওয়ালাকে দেখাইবে। এ নোট কি না, সে তোমায় বলিয়া দিবে।"

গরীবের সংসারে একখানি নোট যে চাঞ্চল্যের সাড়া তোলে তা' আমাদের সাধারণের দৃষ্টিতে কিছু অসঙ্গতিময়, লেখক সেদিকের প্রতি ইঙ্গিত করে হাস্য-রস সৃষ্টি করতে চাইলেও যেন দারিদ্র্যের প্রতিও এক করুণ কটাক্ষ আছে। অতি সাগ্রহে, অতি সযত্নে সেই নোটখানিকে আদুরীর দিদিমা অতি সংগোপনে রেখে দিলেন। কিন্তু যাকে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে সঞ্চয় করা হল তা' কেমন করে যে একেবারে দৃষ্টিবহির্ভূত হয়ে অপ্রয়োজনীয় হয়ে রইল তা' ভাবলে হাসি পায়। অতি বড় দুঃখের দিনে আর যে তাকে পাওয়া যাবে না, এ-কথা যখন

তিনি আরসীর কাঁচের ভিতরে তা' রেখেছিলেন তখন কি তিনি জানতেন যে যাকে এমন করে তুলে রাখলেন, তার কোন খবরই তিনি কাউকে দিয়ে যেতে পারবেন না। মানুষের এই অতি-সাবধানতা দেখে তাই যেন লেখক দূরে দাঁড়িয়ে হাসেন, নোটখানির জন্যে আহ্লরীর মা যখন আতিপাতি করে সব কিছু খুঁজে বেড়ান ও কাঁদেন তখন লেখক যেন ভাগ্যের এই পরিহাসে কোথায় যেন ব্যঙ্গের ছোঁয়া লক্ষ্য করতে থাকেন। মানুষ এক ভাবে, হয় আর এক। মানুষের ভাবনা ও ভাগ্যের মধ্যে এই লুকোচুরি নিয়তই চলছে।

এই গল্পের পরবর্তী অংশতেও ব্যঙ্গের এই একই সুর বর্তমান। সাজগোজ করে মুখ দেখবার সময়ে অসাবধানতাবশতঃ আরসীখানি হাত থেকে পড়ে যায়। শুধু পড়ে যায় তা নয়, ভেঙ্গেও যায়। আরসী ভাঙ্গাতে ভয়ে ও দুঃখে আহ্লরী হাটে চলে যায়। এরপর আহ্লরীর ভাবনা, ভয়, স্বামীকে সন্দেহ করে ঘাটে বসে কান্না, এবং দুঃখভারাক্রান্ত অন্তরে গৃহে ফিরে আসা—ইত্যাদিতে শুধুই হতাশা ছিল। কিন্তু মানুষের হতাশাগুলো সব সময়ে ব্যর্থই হয় না। আমরা অনেক কাজের জন্যেই হয়তো শঙ্কিত, লজ্জিত, ভীত হয়ে পড়ি। কিন্তু পরিণামে এসে দেখি এ ভয়, লজ্জার কোন কারণই নেই। ভাগ্যই যেন অনির্দিষ্ট মুক্তির রাজ্যে মনকে নিয়ে ফেলে। এমনই যখন আমাদের সব কিছু তখন কি কোন একটি বিশেষ বিষয়ে, বিশেষ হারানোতে গভীরতর মূল্য আরোপ করার কোন দাম আছে? আরসীখানি বহুকালের পুরানো। কত স্মৃতির কথা এর অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো। দিদিমা তাঁর কৈশোর, যৌবন কালের মুখখানির পরিপূর্ণতা এই আরসীতে দেখেছিলেন, মা-ও দেখেছিলেন, আজ আহ্লরীও তার মুখের ও মনের রূপখানিকে শেষবারের মত নিখুঁত করে দেখে নিতে চেয়েছিল। এতগুলি মুখের সুখ-দুঃখের সাক্ষী সেই আরসী। তাকে হারিয়ে তাই আহ্লরীর বেদনা। কিন্তু সে কি জানে এই দুঃখই তার সুখের কারণ হবে! আরসী ভেঙ্গেছে সেই হারানো নোটখানির পুনঃপ্রাপ্তির জন্যেই। তাই প্রতিটি কার্যের গুরুত্বকে আমরা যেন খানিকটা হালকা করে নিতে শিখি। যাকে আমরা একান্ত অমঙ্গলের মনে করি তারই পরিণাম হয়তো মঙ্গলের মধ্যে। কিন্তু মানুষ তার সুখ ও দুঃখ, তার পাওয়া না-পাওয়া—দুটোতেই এত বেশী অধীর হয়ে পড়ে যে তা' যেন কতটা ব্যঙ্গের বলে মনে হয়। কেন না বাস্তব ও সত্যে এক বিরাট ব্যবধান হতে পারে।

"ভূতের বাড়ী" গল্পতে আপাত দৃষ্টিতে একটি ভৌতিক বাড়ীর কাহিনী টম

সাহেবের মুখে বিবৃত হয়েছে। এই ভৌতিক বাড়ীর কথা বলতে গিয়ে লেখক টম সাহেবের স্বভাবের মধ্যে দিয়ে বলেছেন যে, মানুষের মনে ভয়ের জন্ম কিভাবে ঘটতে পারে, কোন কিছুর ভয় সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলো মানুষের মনকে কি ভয়ঙ্কররূপে ভীত করে তোলে। তা' ছাড়া অনেক দুর্বল স্বভাবের লোক আছে যারা মুখে অনেক বড় বড় কথা বলে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা যে কি ভয়ানকভাবে দুর্বল সে সত্য ধরা পড়ে, আর তখন তারা আমাদের কাছে নিদারুণ হাস্যকর হয়ে পড়ে। টম সাহেবের চাকরটি এইরূপ একটি হাস্যকর চরিত্র। এই ডানপিটে বীরপুরুষ চাকরটি প্রভুকে উৎসাহিত করে বলে,—"ভূত! ভূত আমার কাছে আসিবে? আমি ভূতের বাবা! দেখি, কেমন আমার সম্মুখে ভূত বাহির হয়। ভূতের চড়চড়ি করিয়া খাইব।" অন্যত্র সে বলে,—"ভয়। আমার শরীরে ভয় নাই, আমি ভূতের বিধাতা পুরুষ। যদি ভূত দেখিতে পাই আনন্দ হইবে, ভয়ের লেশমাত্র মনে উদয় হইবে না।" কিন্তু গল্পের কিছুদূর অগ্রসর হলে দেখি যে তার "চক্ষু রক্তবর্ণ, যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাহার সর্বশরীর রোমাঞ্চ হইয়াছে, মাথার চুলগুলি সব খাড়া হইয়া উঠিয়াছে মুখে নীল মাড়িয়া দিয়াছে।......বাপ রে, মা রে।" এইভাবে চিৎকার করতে করতে বাড়ীর বাইরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। পরে এই ভূতের ভয়ে সে ইংল্যাণ্ড ছেড়ে আমেরিকায় গমন করে, এবং কিছুটা বায়ুগ্রস্থ হয়ে পড়ে। টম সাহেবের মনেও কিছু ভয়ের সঞ্চার হয়। সেই ভয় এবং দূষিত পোড়ো বাড়ীর দুর্গন্ধময় আবহাওয়ায় তিনি যেন কেমন সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়েন। তাঁর সংজ্ঞাহীন আচ্ছন্নতা ও পূর্ব-শ্রুত ভৌতিক কাহিনী তাঁর মনে একপ্রকার ত্রাসের সৃষ্টি করে এবং এরই ফলে তিনি ঘোর বিভীষিকা দর্শন করেন। অনেক সময় আমাদের মনে হয়তো ভয়ের সঞ্চার হয়, কিন্তু লোকে কি বলবে এই লজ্জায় অনেক কাজ করতে পারি না। চাকরের সঙ্গে সঙ্গে টম সাহেবেরও ঐ বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারেননি। "কিন্তু বন্ধু-বান্ধবে সকলে হাসিবে ও বিদ্রূপ করিবে। যা থাকে কপালে, এই মনে করিয়া পুনরায় আমি উপরে উঠিলাম।" আমাদের স্বভাবের অহেতুক সাহস প্রদর্শনের ইচ্ছা ও আমাদের ভয়-বিহ্বলতা ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ করাই যেন গল্পটির উদ্দেশ্য।

'মুক্তামালা'র আর একটি গল্প "পুরাতন কূপ"। এই গল্পের কাহিনী-অংশের থেকে ব্যঙ্গ-অংশ নির্বাচন করে দেখানো যায় না। তবে সামগ্রিক

গল্পে কোথায় যেন একটা ছোট্ট ব্যথাকে কাঁটার মত ফুটে থাকতে দেখি। আমাদের কর্মব্যস্ত, হৃদয়হীন দৃষ্টি দিয়ে তাকে হয়তো দেখতে পারি না. লেখক সেই ব্যথাটুকু লক্ষ্য করেই হয়তো পাঁড়েনীর মুখে বলিয়েছেন, "এই কথা শুনিয়া, আপনার পারিতোষিক লইয়া বিরস বদনে পাঁড়েনী চলিয়া গেল।" "পারিতোষিক" শব্দটি অবশ্যই এখানে ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। একদিন বিপদের দিনে যে শিশুপুত্র দুইটিকে অত্যন্ত ভারী বোঝা বলে মনে হয়েছিল, যাদের লইয়া ঘোর ভাবনা উপস্থিত হয়েছিল সেই সময়ে যাদের পাঁড়েনী তাঁর অন্তরের সমস্ত মায়া-মমতা, আদর-যত্ন, দিয়ে রক্ষা করেছিলেন, আজ বিপদ-অন্তে সেই হৃদয়ের দাবীটুকু অকরুণ-ভাবে অবহেলিত হল। পাঁড়েনীর মাতৃ-অন্তর কিন্তু কাঁদতে থাকে। তাই তিনি অপরিচিত বাবুদের কাছে লব-কুশির সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। কেমন করে, বা কোথা থেকে যে বাবুগণ তাঁর পাতানো স্নেহের সংবাদ এনে দেবেন, এ প্রশ্ন তাঁর মনে আসে না, কেমন যেন অবুঝ আত্মার বিশ্বাস নিয়ে তিনি বলেন, "কিন্তু বাবু! ছেলেদুইটির জন্য এখনও আমার প্রাণ কাঁদে। সেই পর্যন্ত লব-কুশির আমি কোন সংবাদ পাই নাই। তাহারা কোথায় আছে, কেমন আছে, বলিতে পারেন?" অবুঝ প্রাণের এই কান্নাকে গোবিন্দবাবুর মত প্রাণহীন মানুষেরা বুঝতে পারেন না। তাই এই অকৃতজ্ঞ মানুষদের হৃদয়হীনতাকে লেখক এই গল্পের মধ্যে দিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন।

পরোপকার একটি মহৎ ধর্ম। আমরা সকলেই জানি কিন্তু জেনেশুনেও এ ধর্ম পালনে আমাদের একান্ত অবহেলা দেখা যায়। কিন্তু লেখক "শম্ভু ঘোষের কন্যা" গল্পে এ কথাই যেন ব্যঙ্গচ্ছলে আমাদের বলেছেন যে, মানুষ যেন একটু পরোপকারী হয়। এই পরোপকারের সুফল কখন কখন পরের উপর না গিয়ে নিজের কাছে আসতে পারে। শম্ভু ঘোষের জীবনে এইরূপই ঘটেছিল। পরের উপকার সব সময়ে আমরা যে নিঃস্বার্থভাবে করি তা নয়, কখন নিজের অহঙ্কার, প্রতিপত্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে, কখন বা শক্তি ও সাহস প্রকাশ করবার জন্যেও করে থাকি। শম্ভু ঘোষ করেছিলেন নিজের শক্তি ও সাহসের প্রকাশ। কোন এক বর্ষার সন্ধ্যায় দারুণ শীতে যখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, তখন নির্জন মাঠের মধ্যে থেকে 'মা গো!' 'বাবা গো'। বলে যে কাতর ধ্বনি উঠতে থাকে এই কাতরতাকে উপেক্ষা করে যেতে পারেনি শম্ভু ঘোষ। এই সময়ে তার মনোভাবকে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি

যে সে কোন মহৎ প্রেরণাবশে ঐ কাতরধ্বনি অনুসরণ করে ছুটে যায়নি। তার মনে ভয়ই হয়েছিল, প্রথমে সে ভাবলো এ হয়তো ভূত বা পেত্নীর স্বর, পরে ভাবলো এ বোধহয় ঠেঙাড়েদের কৌশল। ভয়ে গাড়ী ছেড়ে দৌড়িয়ে পালাবে মনে করতে লাগলো। এই সময়ে তার অহঙ্কার যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌লো। সে মনে মনে চিন্তা করলো "সত্য সত্যই যদি কোন ছেলে এই মাঠের মধ্যে, এই রাত্রিকালে, এই দুর্যোগে, এই শীতে, একা পড়িয়া থাকে! তাহা হইলে শম্ভু ঘোষ, তুমি কি বলিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছ? তোমার মনে কি দয়ামায়া নাই? তুমি না যাদব ঘোষের বেটা! ছি! শম্ভু ঘোষ। তোমার এরূপ করা উচিত নয়।" এইরূপ মনে করেই শম্ভু ঘোষ মাঠের মাঝখান থেকে এক শিশুকে কুড়িয়ে নিয়ে এলেন। শম্ভু ঘোষ এই সময়ে পরোপকারের আনন্দেই বিভোর হয়ে উঠে। কিন্তু বেশীক্ষণ আনন্দের এই বিভোরতা থাকেনি। বাড়ীতে এসে শম্ভু ঘোষ অবশ্য একটা আনন্দ উপভোগ করেছে তবে সে আনন্দে আর পূর্ব-আত্মগৌরব নেই, অতি নিদারুণ শোক-সাগরে নিমগ্ন হওয়ার ক্ষণে অশুভ-ভাগ্যই এক শুভ-আনন্দের দিকে এগিয়ে এসেছে। আর এই ভাগ্য রূপান্তরের মূলে রয়েছে শম্ভু ঘোষের পরোপকার করবার একটা ক্ষীণ ইচ্ছা। শম্ভু ঘোষ যদি সেদিন সেই মাঠের মধ্যে শিশু-আর্তনাদকে ফেলে চলে আসতো, তবে বাড়ী ফিরে এসে তা'কে তার আদরের কন্যা হরিদাসীকে জন্মের মত হারাতে হত। এই গল্পের উদাহরণটি যাতে মানুষের মনে একটু দয়ামায়ার উদ্রেক করে লেখকের এই একটুখানিকই আশা। আমরা সব সময় নিজেরটুকু নিয়েই যেন মগ্ন হয়ে না থাকি। স্বার্থমগ্ন মানুষের ক্ষুদ্রতাকে ব্যঙ্গ করা আছে এখানে।

মুক্তামালার 'ললিত ও লাবণ্য' একটি করুণ কাহিনী। জীবনের এই কারুণ্যকে লেখক তাঁর ব্যঙ্গ দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করেছেন। 'তাই তিনি অনুভব করেছেন এই পৃথিবীর স্বার্থপরতা, নীচতা, নিষ্ঠুরতা আর সীমাবদ্ধতাকে। বিশাল পৃথিবী, সুন্দর পৃথিবী। তবু এর কোণায় কোণায় জমে রয়েছে কলঙ্ক, কুশ্রীতা। যদি তা' না হবে তবে কোন্ অপরাধে এই পৃথিবী থেকে অসহায়-ভাবে ললিত, লাবণ্য ও তাদের মা-কে বিদায় নিতে হয়—লেখকের ব্যাকুল হৃদয়ে এই প্রশ্নই যেন বার বার জাগে। ফুলের মত সুন্দর প্রাণকে যেন নিষ্ঠুরতার যন্ত্রে ফেলে পিষে মেরে ফেলা হ'ল। ললিতের পিতার কথা প্রথমে মনে হয়। চরিত্রের সংযমহীনতা তাঁকে অমানুষ করে ফেলে। তাই তাঁর মধ্যে নেই কোন স্নেহ, মায়া, মমতা। কিন্তু লেখক যেন দেখাতে চাইলেন

যে মন্দেরও একটা শেষ আছে, সীমা আছে। এই সীমায় এসে হয় মন্দ ধ্বংস হয়ে যাবে, নয় তো তার পরিবর্তন আসবে। কিন্তু এই পরিবর্তন এলেও তখন আর সময় থাকে না। তখন স্ব-কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হয়। ললিতের পিতা মৃত্যুকে বরণ করে যেন প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুর নিকটে এসে তাঁকে স্বীকার করতে হল, "দেখ, আমি এতদিন অন্ধ ও পাগল হইয়া ছিলাম; তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।" ক্ষমা তাকে আমরা হয়তো করতে পারতাম যদি না তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে অত অসহায়ভাবে জীবন থেকে বিদায় নিয়ে জীবনের মুক্তির পথ খুঁজতে হত। তাদের মৃত্যুর জন্যে শুধু ললিতের পিতাই দায়ী নয়। পিতার জ্ঞাতি সেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণটির কথা যদি ভাবি আশ্চর্য হই। তিনি বললেন, "তোমাদের এখন অশৌচ অবস্থা। আমার ঘর-দ্বার অধিক নাই। আমাকে ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয়, তাহার উপর আমার স্ত্রীর শুচি-বাই। তোমার ছেলে-পিলে আমার পূজার দ্রব্যাদি সব ছুঁইয়া ফেলিবে। আমার এখানে বাছা, স্থান হইবে না।" স্পষ্টতই এখানে ঐ জ্ঞাতিটির নিষ্ঠাকে, ধর্ম-আচরণ পালনকে লেখক কটাক্ষ করতে চান। যে ধর্মের কাছে মানুষের ব্যথা, কাতরতা, ভিক্ষার এতটুকু স্থান হয় না, যা' মানুষকে নির্মম, নিষ্ঠুর করে তোলে, তাকে কি আমরা ধর্ম বলব? এই পৃথিবীর নিষ্ঠুরতায় মানুষকে পাগল হয়ে যেতে হয়। আশ্রয় আর অন্নের অভাবে ললিত লাবণ্যদের মত কত প্রাণকে নিঃশব্দে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে স্বেচ্ছায় পুষ্করিণীর শীতলতায়, বা অন্য কোনভাবে জীবনের রুদ্রতাপ থেকে মুক্তি নিতে হচ্ছে তার হিসাব চঞ্চল, সুন্দর, পৃথিবী রাখে না। যে যার প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে ডুবে থাকে। মানুষের এই নির্দয় ব্যবহারে লেখক দুঃখ পান। ব্যঙ্গ না করে পারেন না। তা' ছাড়া, এ গল্পের আরও একটি দিক আছে। উপকার অতি মহৎ ধর্ম। এই পরোপকার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে যাতে জাগে এ-জন্যে তিনি অনেক স্থানেই বলেছেন। এর জন্যে চাই একটা বিশেষ ধরনের মন, যে-মন পরের দুঃখে কাঁদে, ভাবে। লেখক এই গল্পের শেষে এসে দেখালেন যে মন থাকলেও, ইচ্ছা থাকলেও, এক এক জায়গায় এসে সব কিছু যেন ব্যর্থ হয়ে যায়। যেমন ব্যর্থ হয়ে গেল ললিতের কাকাবাবুর সব চেষ্টা। হয়তো তিনি অনেক টাকা এনেছিলেন, ললিত-লাবণ্যদের আর কোন অভাবই আর থাকতো না, কিন্তু সব শেষ হয়ে গেছে। তাঁর সেই কাতর কান্নায় যেন বাস্তব জগতের সীমাটুকু স্পষ্ট করে চোখে পড়ে। "ললিত! লাবণ্য! একবার

উঠ। একটা কথা কও। আমি তোমাদের কাকা আসিয়াছি। আর তোমাদের জন্য টাকা আনিয়াছি। উঠ বাবা! উঠ মা! একটা কথা কও।"

"ললিত, লাবণ্য ও তাহাদের মাতা আর উঠিলেন না, আর কথা কহিলেন না।" এখানে কারুণ্যের মধ্যে ব্যঙ্গ নিহিত। অর্থ আমাদের কাম্য, তাই আমরা এই অর্থের পিছনে ছুটি। কিন্তু এই অর্থের সব মূল্যও এক এক সময় এক এক স্থানে এসে হারিয়ে যেতে পারে। জগত তা জানে না। সে এই অর্থের মানদণ্ডে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে চায়। কিন্তু হৃদয়ের কাছে, জীবনের কাছে সব অর্থ যখন অর্থহীন হয়ে পড়ে তখন মানুষের এক চরম রিক্ত অবস্থা। এর পূরণ আর হয় না। তবু আমরা ব্যর্থ অহংকার, আর অহমিকা নিয়ে মগ্ন থাকি। আমাদের জীবনের এ অহংকার বা ভ্রান্তি তাই ব্যঙ্গের।

"মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প" একটি হাস্যরসাত্মক গল্প। সাপকে কেন্দ্র করে সব অদ্ভুত, উদ্ভট গল্প-কথা রচিত হয়েছে। কেমন করে একটা সাপ তিনুবাবুর তিন বছরের মেয়েকে জলে-ডোবা থেকে বাঁচিয়েছিল, কেমন করে সাপকে মেয়ে আদর করে, সাপ মুড়ি খায়, আবার একটি শিশুকে মায়ের মত স্নেহে ভুলিয়ে দেয়, সাপ কখনো গরুর দড়ি হয়, কখনো বা চুল বাঁধার ফিতে, কখনো বা পাকা মুহুরীর মত অঙ্ক কষে দিয়ে যায়—ইত্যাদি সব অদ্ভুত ও অসম্ভব গল্পই এখানে আছে। আপাত-দৃষ্টিতে এখানে কোন ব্যঙ্গ নেই যেন মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যঙ্গ-শিল্পী কি শুধু শুধুই একটা বাজে অর্থহীন কাহিনী আমাদের কাছে নিবেদন করলেন—এ কথাও মনে আসে। গল্পের নামকরণটিই যথেষ্ট ব্যঙ্গাত্মক। "মূল্যবান" ও "জ্ঞানবান" দুইটি শব্দই ব্যঙ্গপূর্ণ। আসলে এখানে কোন দামীবস্তুর বা জ্ঞানী প্রাণীর কথা বলা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। লেখকের উদ্দেশ্য এই আজগুবী গল্প যারা বলে তাদের ও যারা শোনে তাদের, এই উভয়কেই ব্যঙ্গ করা। আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা ঐ তিনুবাবুর মত অনর্গল সত্য মিথ্যা মিশিয়ে গল্প বলে যায়। আমাদের সঙ্গে তাদের প্রতিটি আচরণে যে কতটুকু মিথ্যা আর কতটুকু সত্যি মেশানো আছে তা বুঝে বের করা শক্ত। এই তিনুবাবুর মতো চালাক লোকগুলো নিজের জ্ঞান, বুদ্ধির মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সাধারণের কাছ থেকে প্রশংসা আদায় করে, আবার কখনো অর্থ আদায় করে, কখনো বা অন্য কিছু। এদের বুদ্ধি আছে কিন্তু তা মিথ্যার দিকে, বা অপব্যয়ের দিকে ব্যয়িত হয়। লোকের ভাল তো করেই না, বরং মন্দ করে, ঠকায়। তবু এক শ্রেণীর অবুঝ বা মূর্খ লোক

রয়েছে যারা এদের চেনে, তবু বিশ্বাস করে। আড্ডাধারীমশায়ও অতি চতুর ব্যক্তি। তিনি সবই প্রায় বুঝতে পারেন। তাই তিনুবাবুকে ধরে এনেছেন। আড্ডাধারী তিনুবাবুর উপর দিয়ে চলেন। তিনি বলেন, "আমি একখানি নভেল লিখিব মনে করিয়াছি। ভূতের গল্প সংগ্রহ করিয়াছি; বাঘের গল্প সংগ্রহ করিয়াছি। এখন সাপের গল্প পাইলেই আমার পুস্তকখানি পূর্ণ হয়।" এখানে লেখক আমাদের বাংলা নভেল-লেখক ও নভেল পাঠক উভয়কেই কটাক্ষ করতে চেয়েছেন। যা হোক একটা কিছু লিখলেই হল। চুরি করে হোক, আর মিথ্যা করে হোক। পাঠক তাই গ্রহণ করবে। আড্ডাধারীর মত লেখক ও তিনুবাবুর মত কথককে যারা বিশ্বাস করে তাদের সেই বিশ্বাস কতকটা যেন মোহাচ্ছন্নতায়ও নেশাগ্রস্থতায় আবৃত। সেই আচ্ছন্নতাকে বুঝতে গিয়েই লেখক মূল্যবান তামাক বা বড় তামাকের কথা বলেছেন। তিনুবাবুর গল্প কেউ বিশ্বাস করবে কি না এই প্রশ্ন যখন উঠলো তখন বলা হল,—"না, না, আপনার সে ভয় নাই। আপনি যখন বড় তামাক সেবন করেন, তখন আপনি আমাদের ভাই। আপনার কথা সকলেই আমরা বিশ্বাস করিব।" লেখক কৌতুকছলে বাঙ্গালীর—স্বভাবের ভাবাচ্ছন্নতাকে, তার সাহিত্য সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টাকে এ গল্পে ব্যঙ্গ করেছেন।

এক যুবকের ভাগ্য-বিড়ম্বিত কারুণ্য নিয়ে মুক্তামালার "সে-কালের মোহর" গল্প রচিত। জীবনের করুণ-কথা থাকলেও লেখক এর মধ্যে দিয়ে আমাদের হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি থেকে মনকে মুক্ত করে তোলার জন্যে চেষ্টা করেছেন। আমরা যেন সত্য-ভ্রষ্ট না হই, ঈশ্বর-বিমুখ না হই, ইহাই তাঁর যেন একমাত্র কামনা। এইভাবে চলতে গিয়ে হয়তো আমাদের অশেষ লাঞ্ছনা আসতে পারে, কিন্তু তাকে সহ্য করতেই হবে, এই সহগুণ ও ঈশ্বর-বিশ্বাসই আমাদের শেষ পর্যন্ত দুঃখ-জয়ী করে তুলবে, এক অমৃতময় শান্তি-সুখের মধ্যে ডুবে যেতে পারবো। গিরিশ নিরপরাধ। জীবনে সে কখনই অন্যায় করেনি। কিন্তু সেই অল্পবয়স্ক যুবকটিকে তার জীবনের পরম আনন্দের মুহূর্তে এক কঠিনতম শাস্তির বোঝা বহন করে চলতে হল, অশেষ দুঃখ, লাঞ্ছনায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল। মরবার সময়ে স্ত্রী-কন্যার জন্যে হয়তো তার হৃদয়ে এক চাপা কান্না থেকে গেছে, কিন্তু সে যে সত্যনিষ্ঠ এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেছে। গোপীবাবু অবিশ্বাসী, ধর্মবুদ্ধিশূন্য স্বার্থপর মানুষ। তাঁর নীচ মানসিকতাই তাঁকে গিরিশ-বিদ্বেষী করে তোলে।

অন্যায় ভাবে গিরিশকে চোর প্রতিপন্ন করে, তাকে দেহে-মনে জর্জরিত করে। এমন কি বলা যেতে পারে গিরিশকে মৃত্যুমুখীন সেই করে তোলে। গিরিশের অকাল মৃত্যুতে গোপীবাবুর অমানবিক নিপীড়নই দায়ী। কিন্তু এই অন্যায়, পাপের জন্যে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। গোপীবাবু তাঁর যন্ত্রণাকাতর হৃদয় নিয়ে ছুটে এসেছেন গিরিশের কাছে, আর আকুল ভাবে বলেছেন, "গিরিশ, আমি অতি পাপিষ্ঠ, আমি অতি নরাধম। বিনাদোষে আমি তোমার প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছি। তোমার এ রোগের কারণ আমি। ক্ষমার পাত্র আমি নই বটে, কিন্তু তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে গোপীবাবুর পাপার্ত হৃদয় আজ অনুতাপে দগ্ধ, সেই জ্বালাই তাঁকে গিরিশের দ্বারে টেনে এনেছে। এখন হৃদয়ের দিক থেকে গিরিশ হলেন রাজা, আর গোপীবাবু দীন হীন ভিখারি। গোপীবাবুর হৃদয়ের এই শূন্যতার চিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক যেন ঐ ধরনের আত্ম-অহংকারী, নির্বোধ ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ করতে চান। গিরিশের জয় যেন গোপীবাবুর পরাজয়কে অলক্ষ্যে ব্যঙ্গ করে। মানব জীবনের এই করুণতম অসঙ্গতির চিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক আমাদের সত্য-নিষ্ঠ ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী করে তুলতে চান।

"ভয়ানক আংটি" (মুক্তামালা) একটি সুন্দর ব্যঙ্গাত্মক গল্প। যদিও কিছুটা অলৌকিকতার আশ্রয় আছে, তবুও সত্যও এখানে যে একেবারে নেই তা' নয়। বরং বলা চলে সত্য ও অলৌকিকতার মিশ্রণে গল্পটি আমাদের কাছে যেন এক পরম বিস্ময়রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। লেখক এদিকটাকেও অতি হাস্যকরভাবে উপস্থাপনা করেছেন। আমরা যার ব্যাখ্যা করতে পারি না তারও যখন একটা মানে দিতে যাই তখন তা' যে কি হতে পারে তাকে লেখক দেখিয়েছেন, "আংটি-বীরের কথা লইয়া অনেক স্থানে অনেকরূপ বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। কেহ বলিলেন, সে দেবতা, কেহ বলিলেন সে ভূত; কিন্তু হাঁদাই মোল্লা বলিলেন যে, সে দেবতাও নয়, ভূতও নয়, সে এক জাতীয় ইফ্রিট। মাখনতোষ, অর্থাৎ ম্যাকিণ্টস নামে একজন ইংরেজের কানে এ কথা উঠিলে, তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আংটি-বীর এক প্রকার জীব, পিরিনি-পর্বতে একবার এইরূপ জীবের কঙ্কাল বাহির হইয়াছিল।" আংটি-বীরকে লেখক দেবতা বা ভূত, ইফ্রিট বা পিরিনি পর্বতের একপ্রকার অদ্ভুত জীব কিরূপে আঁকতে বা দেখাতে চেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কোন মতামত

দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে মানুষের অজ্ঞতার ব্যাখ্যাকে যে সহাস্যে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসলে মানুষের ভাগ্যই মানুষকে তার নির্দিষ্ট চক্রে ঘুরাচ্ছে। এই ভাগ্যই নানাভাবে আমাদের সামনে আসে, আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস উৎপাদন করে, কর্মে নিয়োজিত করে। তবে এ গল্পে লেখক আংটি-বীরের ভয়ংকর প্রভাব, আরসীতে নানা দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আমাদের স্বপ্নময় মনোজগতের বিচিত্র গতিবিধি, কামনা-বাসনার সত্যস্বরূপকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন, অজ্ঞান, অচেতন মনের ভয়, ভাবনা, ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠাগুলিকে বাস্তব চেতনার সঙ্গে মিশিয়ে এক শ্বাসরোধকারী রহস্যের মায়ায় গল্পে এক অপূর্ব জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। সে যাই হোক, গল্পটি যে একটি প্রেম-বিষয়ক ব্যঙ্গ রচনা তাতে সন্দেহ নাই। অল্প বয়স্ক তরুণ-তরুণীর মনে যে প্রেমাকাঙ্ক্ষা তারই এক বিকৃত প্রকাশ যেন হারাধন ও বিমলার কাহিনীর মধ্যে আছে। হারাধন উনিশ-কুড়ি বছরের এক যুবক আরব্য উপন্যাস পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রে যে স্বয়ম্বর সভার স্বপ্ন দেখবে এবং এক সুন্দরী কন্যার মুখচ্ছবি তার মানসপটে সুচিহ্নিত হয়ে যাবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। স্বয়ম্বর সভার চিত্রটি অতিশয় হাস্যজনক। "কন্যা অন্য কাহারও প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া, হারাধনের নিকটে আসিয়া তাঁহারই গলায় মাল্য প্রদান করিল। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ন্যায় রাজগণ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। কামান, বন্দুক, গোলাগুলি লইয়া তাঁহারা হারাধনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। হারাধন যুদ্ধ করিলেন না, তিনি বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় কেহ কর্ণপাত করিলেন না। মুষলমুখবিশিষ্ট কদাকার এক রাজা আসিয়া সবলে তাঁহার কান মলিয়া দিল। সেই কান-মলার চোটে হারাধনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল।" এখানে ভীরু দুর্বল প্রেমের এক হাস্যকর চিত্রের উদ্ঘাটন হয়েছে। তা'ছাড়া, বাঙালীর সাহসহীনতা, দুর্বলতার প্রতিও এখানে হারাধনের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, তার বক্তৃতাপ্রিয়-স্বভাবকেও কটাক্ষ করা হয়েছে। হারাধনের ধন হয়ে যে কল্পিত নারী তার সমস্ত সৌন্দর্যরাশি নিয়ে তাকে সুদীর্ঘ তিন বৎসর ধরে আচ্ছন্ন করে রাখে তা' যেমন অবাস্তব তেমনি হাস্যকর। পরে চলন্ত ট্রেনে যাকে সে রক্ষা করে তাকেই সে কল্পনার বাস্তব রূপায়ণ বলে যেভাবে গ্রহণ করে তাতেও যথেষ্ট আকস্মিকতা

আছে। তরুণ-মনের ধর্মের সহজতর প্রকাশ এতে আছে। তবে হারাধন ও বিমলা তাদের মনের রোমান্টিক মোহ দিয়ে সেই আকস্মিকতাকে যেভাবে চিত্রিত করে তাতে যথেষ্ট হাস্যকর দিক আছে। এর পর আংটি বদলের পালা। কন্যার হাতের সন্ন্যাসী-প্রদত্ত আংটি হারাধনের হাতে এসে যাওয়ায় হারাধনের যে যাতনা তাতেও যেন ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি আছে। যে কল্পিত নারীর জন্যে এত সুদীর্ঘ দিন ধরে হারাধনের আকুলতা, ভাগ্য যখন তারই হাতের আংটিকে হারাধনের হাতে পরিয়ে দিল তখন তার অসুখ আরও শতগুণে বর্ধিত হল। এমনিই বোধ হয়। আমাদের অধরা বস্তু যখন ধরার মধ্যে আসে তখন সে অনেক সময়েই যাতনাদায়ক হয়ে পড়ে। যাকে সুখ বলে ভাবি সে সুখ নয়। বস্তুতপক্ষে আংটিটি হারাধনের প্রাণ সংহারের কারণ পর্যন্ত হয়। শেষে ভাগ্যের নির্দেশে বিমলার আবির্ভাব ও বিবাহ ঘটে। গল্পের শেষে লেখক স্পষ্টতই ব্যঙ্গ করেছেন। তা'ছাড়া কিছুটা জ্ঞান পূর্ণ তথ্য পরিবেশন করে অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণকে কটাক্ষ করেছেন। হারাধনের মূর্চ্ছা দেখে তার চিকিৎসক তাকে মৃত বলেন, হারাধনের শরীর কিন্তু কিছু উত্তপ্ত ছিল। ডাক্তার বললেন, "কোন কোন মৃতদেহে এরূপ উত্তাপ থাকে।" এই কথা বলে ভিজিট নিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল হারাধন জীবিত কিন্তু মূর্চ্ছিত ছিল। সুতরাং এ ধরনের চিকিৎসক নিন্দিত হওয়ারই যোগ্য। দ্বিতীয়তঃ ধনী গৃহের গৃহিণীদের অকর্মণ্যতা ও বিলাসিতাকে ও তরুণ-তরুণীর উদ্বেলিত প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে কিছু পরিহাস করে লেখক বলেছেন, "ইহা পাঠ করিলে কি শ্রবণ করিলে, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণ কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ; অবিবাহিত যুবকগণ রূপবতী ও গুণবতী পত্নীলাভ করেন অবিবাহিত কন্যাগণ মনের মত পতি পাইয়া, নানা ভূষণে ভূষিত হইয়া কাজ করা সাটিনের জ্যাকেট পরিয়া, গরবে গরবিনী হইয়া, ঠুটোর মত বসিয়া নাটক-নবেল পড়িয়া কালযাপন করিতে থাকেন।"

মুক্তামালার রহস্য করুণ একটি গল্প "কেন এত নিদয় হইলে"। গল্পের মূল সুরটি গানের একটি কলির মধ্যেই মুক্তি পেয়েছে, তাই নামকরণ থেকে আরম্ভ করে, সমগ্র গল্পের মাঝে মাঝে সেই একটি কলিই যেন ঘুরে ঘুরে আর্তনাদ করে বেড়িয়েছে। লেখকের কাছে এক সকরুণ প্রশ্ন হয়ে উঠে যে মানুষ কেন এত নিষ্ঠুর হয়। এমন কি আছে যার জন্যে আমরা জীবনের মধুর ক্ষণে, সুরময় আবেশকেও রক্ত-কলঙ্কিত করতে পারি, 'নিদয়' হতে

পারি ; যেমনভাবে নবীন তার পরমা রূপবতী পত্নীকে খুন করেছিলেন। লোভই মানুষকে এমন করে তোলে। লোভ সর্বনাশা। মানুষকে পিশাচ করে। নবীনবাবু পিশাচ। তাই স্ত্রীকে হত্যা করেন। শালীকে বিবাহ করাই তাঁর ইচ্ছা। তাঁর স্বভাবে কোন ভাল গুণ নেই। বদমাইসির শেষ সীমায় তিনি পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু লেখক দেখাতে চাইলেন এই ধরনের পাপীর আর যেন বেঁচে থাকার অধিকারই নেই। তাই তো নবীনবাবুকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে, যেন তার দুষ্কর্মই তাকে তাড়া করে নিয়ে গিয়ে অসহায়ভাবে মেরে ফেলে। এই দুষ্ট লোকের যেমন বাঁচার অধিকার নেই, তেমনি যে অত্যন্ত সৎ, ভাল, তারও বাঁচার উপায় নেই। কেননা এ জগতের নিয়ম তা নয়। এ জগত স্বভাবের বাঁধনে বাঁধা। সেখানে কোন চরমের জায়গা অতি অল্প, নেই বললে হয়। এই গল্পের অতি সৎ, মহৎ, চরিত্র বাগানের মালীটি। একটা মহৎ আদর্শ বা প্রেরণা দ্বারা তার সমগ্র জীবন উদ্ভাসিত। পাপকে কিছুতেই সে প্রশ্রয় দিতে পারে না। তাই মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সে পৃথিবীকে পাপমুক্ত করতে এগিয়ে যায়। কিন্তু নবীনকে সে মারতে পারে না। তার মহৎ হৃদয় মা-লক্ষ্মীর মৃত্যুকালীন প্রার্থনাকে ভুলতে পারে না। তার অন্তর দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে এক সময়ে। তাই পুলের উপর থেকে নবীনবাবুকে জলের গভীরে পড়ে যেতে দেখেও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নবীনবাবুর ব্যর্থ প্রার্থনা মালীর হৃদয়ে কোন সাড়া জাগায় না।

"জগু! আমি সাঁতার জানি না। আমার প্রাণ রক্ষা কর্। তোরে অনেক টাকা দিব।"—কিন্তু অনেক টাকা দিয়েও জগতের অনেক জিনিষই ক্রয় করা যায় না, এ-সত্য নবীনবাবুর মত অনেকেই জানেন না। এঁরা ব্যঙ্গের পাত্র। কিন্তু লেখক এঁদেরই ব্যঙ্গ করেন নি। এর পাশে মালীর দিকেও তাঁর সমান দৃষ্টি প্রসারিত। মালীর আদর্শবাদও পৃথিবীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সমানভাবেই ব্যঙ্গময় বলে লেখকের মনে হয়েছে। যাকে এতদিন ধরে মারবার জন্তে মালীর হাত নিস্‌পিস্ করছিলো, আজ সেই লোকটি যখন তার সামনেই জলে ডুবে যেতে লাগলো, তখনও সে পূর্বের কোন প্রতিজ্ঞাকে ভুলে যেতে পারলো না। শেষে এক স্বর্গীয় প্রেরণা তাকে জলে ঝাপ দিতে বাধ্য করল। তার অতি-সাধুতাই তার মৃত্যুর অস্ত্র হল। লেখক এই ধরনের চরিত্রকে ব্যঙ্গ করেন। কেননা মালীর মূল্য আমাদের কাছে অতি নগণ্য।

অপরদিকে এ পৃথিবীর স্বভাবে নটবরের চরিত্র গঠিত। সে অতি-ভালও নয়, অতি-মন্দও নয়। সে সাধারণ। তাই কোন অবস্থাতেই সে অধীর হয়ে পড়ে না। যদিও সে কখনও যে অসম্ভব কথা বলে না এমন নয়। সে যখন বলে, "যদি ইহাকে পাই, তাহা হইলে এ প্রাণ রাখিব, না পাইলে এ প্রাণ বিসর্জন দিব" তখন তার এই মৌখিক সাহসের কথায় আমরা হাসি কারণ এ ধরনের বীরত্বসূচক প্রতিজ্ঞায় যথেষ্ট অসঙ্গতি আছে। সে যাই হোক, নটবরই এ পৃথিবীর যোগ্য লোক। তাই সে নবীনবাবুর মত পাপেও লিপ্ত হয় না, আবার মালীর মত সত্যকারের সাধুতার পরিচয়ও দেয় না। তাই তার জীবনে আসে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য। গল্পের শেষে লেখক তৎকালীন বাঙালী সমাজের নব্য-বাবুদের অবিশ্বাসী মনকে ব্যঙ্গ করেছেন,—"ইংরাজী খাঁ বাবুদের সুমতি হউক; ভূতের প্রতি তাঁহাদিগের ভক্তি হউক, এই আমার প্রার্থনা।" নটবরের মনে বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাসে ভূতের অদৃশ্য স্বরও তাকে আকুল করে দেয়। এবং স্বর্ণকে অর্থাৎ নবীনবাবুর শালীকে পত্নীরূপে পাওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। তৎকালীন ইংরাজী-সভ্যতাভিমানী নব্যবাবুর মধ্যে কোন বিশ্বাসই ছিল না—কি ভূত, কি ভগবান। তাদের এই স্বভাবও অমঙ্গলজনক, তাই কিছুটা ব্যঙ্গেরও। সামগ্রিকভাবে গল্পটি করুণ রসাত্মক হলেও লেখকের ব্যঙ্গ-দৃষ্টিকেও স্পষ্ট করেই খুঁজে পাই।

আমরা যখন কোন কার্য সাধন করতে গিয়ে নিজেকেই একমাত্র বলে মনে করি তখন ভুল করি। আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি। তার অতিরিক্ত কিছু নয়। ঈশ্বর-বিশ্বাস আমাদের সর্ববিধ বিপদ থেকে মুক্তি দিতে পারে। আমাদের কঠিনতম সাধনাতেও দুঃখ ও ব্যর্থতা, আসতে পারে, যদি আমরা নিজেকেই একান্ত ও সর্বস্ব বলে মনে করি। মুক্তামালার "বেতাল ষড়বিংশতি" গল্পতে গৌরীশঙ্করের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে লেখক এই কথাই বলতে চেয়েছেন। আমাদের মধ্যে অনেকেরই প্রায় অর্থবান হবার সাধ আছে। গৌরীশঙ্করেরও এই সাধ ছিল। এজন্য সে কঠিন শব-সাধনায় ব্রতী হয়। শব-সিদ্ধ হলে সে অতি শক্তিবান পুরুষ হবে, যা-ইচ্ছে-তাই পাবে। কিন্তু তার সে সাধনায় যে বিপত্তি ঘটলো লেখক তার কারণ হিসাবে তার অবিশ্বাসী মনকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, "কিন্তু তোমার অজ্ঞানতার জন্য দুঃখ হয়। তুমি মনুষ্যের নিকট উপদেশ না গ্রহণ করে, সমুদয় চরাচর জগতের শিক্ষাদাতা সদাশিবকে একান্ত মনে গুরুপদে বরণ কর নাই কেন?"

মানুষের অহং-সর্বস্ব ভাবকে এ গল্পে লেখক ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন। গৌরীশঙ্করের শক্তি ছিল, সাহস ছিল, কিন্তু তবু সে যেভাবে তার সাধনার অর্ধপথে গিয়ে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করে ফিরে, তা' আমাদের কাছে এক চরম বিস্ময় বলে মনে হলেও লেখক কিন্তু তাতে এতটুকু বিস্মিত বা বিচলিত নন।

গল্পের এই দিকটি ছাড়া আরও দু' একটি দিক আছে যার মধ্যে দিয়ে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন। থিয়েটারের চরিত্রের সু-উচ্চ রবে অভিনয় করার পদ্ধতিটিকে কটাক্ষ করেছেন থিয়েটারী বীর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। এই থিয়েটারী বীর এসে গৌরীশঙ্করের শব-সাধনাকে নষ্ট করে দেয়। তার বক্তৃতা সহ্য করা অতি কঠিন। সাধক পর্যন্ত বিচলিত হয়। তা' ছাড়া যে সাধক সর্বপ্রকার ভয়, বিভীষিকা পার হয়ে এল সামান্য একজন থিয়েটারী বীরের আস্ফালনে সে যেভাবে আসন ছেড়ে উঠে পালায় তা' হাস্যের। এর মধ্যে দিয়ে লেখক ঐ বীর ও সাধক দু'জনকেই ব্যঙ্গ করছেন।

আর একটি ব্যঙ্গের দিক আছে। তা' বর্ষিত হয়েছে রোজাদের প্রতি। ভূত ছাড়ানোর যে রোজার ছবি এখানে আছে, তা' সম্পূর্ণ হাস্যের। ভূত ছাড়ানোর জন্যে তার যে বিবিধ ধরনের মন্ত্র-উচ্চারণ তাতে যথেষ্ট হাসি ও ব্যঙ্গ মিশে আছে। তবে সব লোকই যে ঐ রোজার মত তা নয়। কৃত্রিমের পাশে খাঁটিও আছে। এই খাঁটি লোকটিকে লেখক সামান্য লোক বলেছেন। কিন্তু তিনি সামান্য নন্, বরং অসামান্য। তাই তিনি কোন মিথ্যা, ছলনার আশ্রয় লন না। নিজের স্তুতি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। ভূত যখন সেই সামান্য মানুষের বহুবিধ গুণের প্রশস্তি রচনা করতে বসলো, তখন তিনি দৃঢ় মনে সেই প্রশস্তিকে থামিয়ে দেন। এঁরা শক্তিধর। সেই শক্তির সামনে সব ভূত পালিয়ে যায়। আর গৌরীশঙ্কর এই বাঙালী ভদ্রলোকের কাছে এসে তার সমগ্র ভয়-বিহ্বলতা, দুঃখ-দৈন্য থেকে মুক্তি পায়। বাঙালী স্বভাবের দু'টো দিক এই রোজাদের মধ্যে দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে একদিকে যেমন রোজার মত মিথ্যাশ্রয়ী ভণ্ড পুরুষ আছে, তেমনি সত্যকারের আত্মিক ক্ষমতাশালী সাধু প্রকৃতির ধার্মিক ব্যক্তি আছেন। প্রকৃত যাঁরা ঈশ্বর-বিশ্বাসী, সাধক, তাঁরা অসাধ্য সাধন করতে পারেন। গৌরীশঙ্করের মত অহং-সর্বস্ব, অবিশ্বাসী পুরুষের সকল কর্মই শেষ পর্যন্ত চরম হাস্যকরতায় ভরে ওঠে। অসীম লাঞ্ছনা, আর অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় জীবন ছেয়ে যায়। এ ধরনের চরিত্রের অজ্ঞানতা সত্যই ব্যঙ্গের।

আমাদের স্বভাবের এমন কতগুলি দিক আছে যেগুলিকে আমরা নিজেরা হয়তো হাস্যকর বলে বুঝতে পারি না, কিন্তু ব্যঙ্গ-লেখক সেগুলির অসঙ্গতি, অর্থহীনতাকে স্পষ্ট বুঝতে পারেন। তিনি সেগুলিকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেন, এ কথা আমরা জানি। মুক্তামালার "মদন ঘোষের বদনে হাসি" এই গল্পতে মদন ঘোষের চরিত্রকে সম্পূর্ণ বিকশিত করে তুলতে গিয়ে লেখক এই কথাকেই ব্যক্ত করেছেন। মদনের প্রথম জীবনের রোমান্টিকতা অসঙ্গতিময়, তাই তা হাস্যের। লেখক শেষ পর্যন্ত মদন ঘোষকে পূর্ণতা দান করেছেন, সে শুধুই হাস্যকর হয়ে থাকে নি, জীবনের কঠিনতর বাস্তবতার মুখোমুখী এসে মদন জীবনের সম্যক সত্যকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছে, তার জীবনে এসেছে পরিবর্তন। মদনের জীবনের এই পরিবর্তন তারই কথায় প্রকাশ পায়। রাধারানীকে লাভ করবার জন্য তার যে হাস্যকর প্রচেষ্টা তা আর রাধারানীকে লাভ করবার পরে নেই। সমস্ত রোমান্টিক মোহ ছিন্ন হয়ে গেছে। জীবনের ভয়ংকর রূপ তার জীবনে রূপান্তর এনেছে। তাই সে বলেছে,—

"পূর্বের ন্যায় যদি আমার প্রাণে রস থাকিত, তাহা হইলে কিরূপে বাসর-ঘর হইল, কিরূপে শালী-শালাজগণ আমার সহিত তামাসা করিল, সে সব পরিচয় বিস্তারিত ভাবে আমি আপনাদিগকে প্রদান করিতাম। কিন্তু নিয়োগী-পুত্রের চিতাগ্নিতে সে রস আমার শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।"

লেখক আমাদের জীবনের অসঙ্গতির দিকটিকে এ গল্পে দেখিয়েছেন। কখনও সে অসঙ্গতি আমাদের হাসিয়েছে, কখনও বা সে অসঙ্গতির সামনে এসে আমরা অসহ্য বেদনা-মিশ্রিত ভয়ে ভীত হয়ে উঠেছি। লেখকের উদ্দেশ্য অবশ্য দুই ক্ষেত্রেই এক। আমাদের স্বভাব ও মনকে সত্যে স্থিত করা, জীবনের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়ে জীবনের মূল সুরটিকে চিনিয়ে দেওয়া।

মদন ঘোষের জীবনে ছিল নানা মিথ্যা অহংকার। এ অহংকার শুধু মদন ঘোষের কেন, অনেকের জীবনেই আছে। কারও কারও এ অহংকারের প্রবৃত্তি সারা জীবনভোরই থেকে যায়, আর কারও জীবনে অতি অল্প সময়েই এ কেটে যায়। মদনের জীবন থেকে কিছু কিছু উল্লেখ করে এই অসঙ্গতিকে দেখাতে চেষ্টা করব। মদন তার নিজের নাম, নিজের রূপ ইত্যাদি নিয়েই কতই না অহংকৃত। ভট্টাচার্য মশায় তার নামটিকে ও তার বিদ্যাবুদ্ধি, চাকরীর কত প্রশংসা করলেন। এতে মদন আরও বেশী পুলকিত হয়ে

উঠলো। সে মনে মনে ভাবে, "আমার নামটি যে ভাল, জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত তাহা আমি জানিতাম। মনে মনে কত আমি আমার নামের গৌরব করিতাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আজ সেই নামের প্রশংসা করিলেন। তাঁহার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি হইল। ·· ····· ·· প্রতিদিন আমি সাবান মাখিয়া স্নান করি। এখন আর আমার পাড়াগেঁয়ে চেহারা নাই। নানারূপ সুগন্ধযুক্ত তৈল সিক্ত করিয়া, চুলগুলি ফিরাইতে প্রতিদিন আমি আধ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করি। আরসীতে যখন আমি আমার মুখ দেখি, তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা বলিলেন, আমিও তাহাই মনে মনে ভাবি। নিজের সুখ্যাতি নিজে করিতে নাই। কিন্তু আপনারা বরং আমার বন্ধু-বান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন, সকলেই বলিবে যে, মদন একজন সুন্দর পুরুষ বটে। ফল কথা, আমার নাম মদন, আমি কাজেও মদন।" মদনের এইরূপ স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে যথেষ্ট হাস্যরস থাকলেও ব্যঙ্গও আছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা এভাবে ব্যর্থ-অহংকারে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। ডমরুধরের মধ্যে দিয়েও লেখক মানব-স্বভাবের এই অসঙ্গতিকে নানাভাবে নানাস্থানে দেখিয়েছেন। মদন ঘোষের বিবাহ-সংবাদে যে উল্লাস দেখি তা যে সার্বজনীন তা'কেই লেখক বলেছেন নিম্নের উদ্ধৃতিতে,—

"বিবাহের কথা শুনিয়া প্রাণ আমার উল্লাসে পরিপূর্ণ হইল। কারণ, আমার নাম মদন। প্রাণের কথা আমি খুলিয়া বলিতেছি, সেজন্য আমাকে আপনারা পাগল মনে করিবেন না। বিবাহের সময় আপনাদের বোধ হয়, এইরূপ আনন্দ হইয়া থাকিবে। তবে আপনারা প্রকাশ করেন না, এই যা।" মানবমনের এক ব্যর্থ গৌরব বোধকে লেখক ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে দেখাতে চেয়েছেন।

এবার মদনের রোমান্টিক মনের ছবিকে লেখক দেখিয়েছেন। মদন তার কল্পনার জগতে বিচরণ করে। অল্পবয়সী তরুণের ভাব-কল্পনা, ভাবালুতা বিলাসিতা দিয়ে মদনের মন গঠিত। তাই তার সব আচরণই কেমন যেন অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। হাসির মনে হয়। রাধারানীকে মদন ভালবেসেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য তার ভালবাসা। যাকে একবারও দেখেনি তাকে ভালবাসার জগতে এনে বসানো অবিশ্বাস্য মনে হয়। লৌকিক জগতে এমন পূর্বরাগের স্থান নেই বলা যায়। কিন্তু তরুণের ভাবালুতায় সবই সম্ভব। মদন তার কল্পিত প্রেমের পাশেই থাকে, তবু তাকে দেখবার সৌভাগ্য হয় না। তার এই কল্পজগৎ আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হয়।

"সত্য বটে, সেই সুন্দরীকে আমি এখনও চক্ষেও দেখি নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়। তাহার পায়ের চারি-গাছি মলের রুণু-রুণু শব্দ সর্বদাই যে আমার কানে লাগিয়া আছে। অফিসে চাবি খোলার শব্দ হয়, আর আমার প্রাণটা ধরাশ করিয়া উঠে, আমি ভাবি, এ বুঝি আমার হৃদয়আসীনা আমার প্রাণ-দেবীর পদনিঃসৃত সেই কিঙ্কিনী শব্দ। তাহাকে আমি দেখি নাই সত্য; কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিবরণ অবলম্বন করিয়া আমার মানসক্ষেত্রে তাহার চিত্র আঁকিয়া লইয়াছিলাম।"

মানসক্ষেত্রের এই প্রেমাস্পদকে দৃষ্টিপথে আনার জন্যে মদনের সে কৃচ্ছ্রসাধন তা আমাদের হাসায়। মদন রাধারানীকে জানার জন্যে নিয়োগী পুত্রের সঙ্গে আলাপ করেছে, রাধারাণীর পিতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে চেষ্টা করেছে, রামায়ণ কিনে এনে স্থ-উচ্চে পাঠ করেছে। তবু কোন ফল হল না। এর পরে সত্য সত্যই মদন ঘোষ তার বহু কামনার পাত্রীটির সাড়া পেলো। বিশেষ একটি প্রয়োজনে রাধারাণী একখানি চিঠি লিখেছিল এবং অতি সাবধানে দরজার ফাঁক দিয়ে সে চিঠি মদন ঘোষের কাছে এসে পৌঁছালো। এই চার লাইনের চিঠি মদনের সমস্ত দেহ-মনে যেন এক পুলকের পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেল। তার এই অকারণ পুলককে আমরাও কিছুটা যে না উপভোগ করি এমন নয়। এরপর মদন ঘোষের পাল মশায়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হয়, প্রথমে মহাভারত পাঠের জন্যে পরে আহারের জন্য। কোন এক রবিবারে নিমন্ত্রিত মদন প্রথম রাধারানীকে দেখতে পেলেন। তার অপূর্ব লাবণ্য দর্শন করে মদনের "মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। প্রথমে শাকের ঘণ্ট না খাইয়া, প্রথমে অম্বলের বড়ি মদন বদনে দিয়া বসিল।" মদনের রোমান্টিক বিলাসিতার আরও পরিচয় আছে। সেদিন রাধারানীর ছদ্মবেশী ভাই বাড়ীতে এলো। তাদের জীবনে ভাগ্য-বিপর্যয়ের যে গোপনতা ছিল তা প্রকাশ হয়ে যায় দেখে মদনকে ডাকা হ'ল। রাক্ষসরূপী একটা মানুষকে দেখে প্রথমে তো মদন ভয়ে চৈতন্যই হারিয়ে ফেলল। পরে জ্ঞান ফিরে এলে সব কিছু বুঝলে। যেভাবে সাহসিকতার পরিচয় দেওয়ার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলো তাতে যথেষ্ট হাস্যরস আছে।

"আর আমার সাহসেরও প্রশংসা করিতে হয়। পূর্বে সাহসের অনেক পরিচয় দিয়াছি। এখন আমি ভাবিলাম যে, আরও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া এই কন্যার মন-প্রাণ আমি একেবারে কাড়িয়া লইব। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার

কন্যার মুখপানে চাহিয়া আমি পাল মহাশয়কে বলিলাম,—"ঘরে তলোয়ার আছে, থাকে তো দিন্, আমি লড়াই করিব।"

মদনের এই বীরত্বসূচক কথা সত্যই হাস্যের। কেননা এ-প্রকার আচরণ অসঙ্গতিপূর্ণ।

কিন্তু মদনের এই অসঙ্গতি বেশী দিন থাকেনি। বেচু ও মিহিরের কাহিনী তাকে যেন এক নূতনতর জগতে নিয়ে গিয়েছে। সেখানে সে দেখেছে এ জগত কত নিষ্ঠুর। সে অক্লেশে নির্দোষীকে দোষী, সত্যকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করতে পারে। বেচু যেভাবে তার হত্যার সত্যকে অপরের জীবনে চাপিয়ে দিয়েছে তা' মদনের কাছে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। মদন সমস্ত ঘটনাটি অবগত হয়ে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে এ জগতে এমনও মানুষ আছে যে মাত্র একশ'টি টাকার জন্যে বন্ধুকে পর্যন্ত খুন করে। আর সেই পাপের বোঝা এক নিরপরাধের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে। আর এমনি করেই সাধু সেজে ঘুরে বেড়ায়। জগতের এই মিথ্যা আচরণে মদন কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়। মিহিরের দুঃখ তার মনে এক পরিবর্ত্তন আনে। তার স্বভাবে যে সমুদয় দোষ আছে, এতদিন তা সে দেখেনি। সে সমুদয় দোষ তখন হতে তার কাছে অতি স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

এ জগতে পাপ করে' তার ফল থেকে দূরে দূরে সরে থাকা যায় না। বেচু খুন করেছিল। কিন্তু খুনের দায় অন্যলোকের পরে চাপিয়ে দিয়ে অতি স্বচ্ছন্দে তো দিন কাটাচ্ছিল। তবে কেন তাঁর এত দুঃখ। লেখক সেই দুঃখকে, পাপের সেই ভয়াবহতাকেই অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বেচু এ জীবনে সত্যকে গোপন করেই চলে যেতে পারতো। একদিন সে নিজের প্রাণকেই অত্যন্ত মূল্যবান বলে চিনেছিল। আজ মৃত্যুমুখীন হয়ে, দুঃখের আর অপরাধের অথৈ-সাগরে নিমজ্জমান হয়ে বুঝতে পারলো যে জীবনের প্রতিটি কর্মের হিসাব আমাদের কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হয়। বেচু ও তাই তার সব পাপকে স্বীকার করেই পাপ থেকে মুক্তি পায়। মিথ্যা আমাদের জীবনকে যে কি ভাবে কলঙ্কিত করতে পারে তার ধারণা হয়তো বেচুর মত আমাদের মধ্যে অনেকেরই নেই। গোপনতারও একটা সীমা আছে। সকলের কাছে গোপন করে থাকলে কি হবে, নিজের কাছে তো নিজেকে গোপন করে রাখা যায় না। সত্য থেকে বিচলিত হওয়া মহাপাপ, এ পাপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমরা অনেক সময় তা বুঝি না; লেখক আমাদের

সেই ভ্রান্তিকে, মিথ্যা অহংকারকে বেচুর জীবন কাহিনীর মধ্যে দিয়ে প্রকটতর করে দেখিয়ে দিলেন। যাতে আমরা ফাঁকিতে না পড়ি, মিথ্যাকে গ্রহণ না করি, মিথ্যা অহংকারে ডুবে না যাই। "আমি রূপবান্, আমি গুণবান্, আমি বুদ্ধিমান্, আমি সাহসী পুরুষ",—আমাদের মনের এই যে ভাব, এ গুলো সম্পূর্ণ হাস্যের। তাই লেখক এই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে, বিশেষ করে মদন ও বেচুর জীবনের উদাহরণের মাধ্যমে তা স্পষ্ট করে তুলেছেন। বেচুর মিথ্যাচারণকে তিনি ব্যঙ্গ করেন, মদন ঘোষের গর্বকেও তিনি ব্যঙ্গ করেন। এ ছাড়াও, ভট্টাচার্য মশায় ও নিয়োগী মশাইয়ের মত লোকও লেখকের কাছে ব্যঙ্গের পাত্র। ভট্টাচার্য মশাই-এর মত লোকেরা যে কোনভাবে দু:পয়সা উপার্জন করতে পারলেই সন্তুষ্ট। লোককে অপথে-কুপথে নিয়ে যেতেও তারা ভাবে না। মদনকে রাধারাণীর প্রতি প্রলোভিত করেছেন তিনিই। এবং সে যাতে সেই পথে অবিচল হয়ে থাকতে পারে তার জন্যেও তিনিই তৎপর হয়ে উঠেছেন। মদন যখন রাক্ষসের কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করলো তখন ভট্টাচার্য মশায় যেভাবে হারাণ সুরের গল্প শোনায় আর রামকবচ লিখে দেয় তাতে আমরা বেশ বুঝি যে ভট্টাচার্য মশায় অতিশয় ধূর্ত লোক। মদনের স্বল্প বুদ্ধিতার সুযোগে তিনি তাকে ঠকাতে চান। মানুষকে ঠকানোই তাদের ব্যবসা। এঁরা ব্যঙ্গের পাত্র। নিয়োগী মশাইয়ের মত চরিত্রগুলো ব্যঙ্গের। এঁদের কোন নীতিবোধ, ধর্মবোধ, কিছু নেই। তবু এরের মিথ্যা অহংকার আছে। মিহির ধরা পড়েছে এই সংবাদটি যখন সংবাদপত্রে বের হল, তখন নিয়োগী মশায়ের এক আনন্দপূর্ণ হৃদয় হয়, সেই আনন্দের বেগ সামলাতে না পেরে তিনি যে ভাবে সংবাদকে গীতের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন তা যেমন হাস্যের, তেমনি ব্যঙ্গের পরের বিপদে যাঁর অন্তর এমন পুলকিত হয় সে মানুষ যে কতখানি নীচ তা' সহজেই অনুমেয়। তাঁর সেই নীচতাকে লেখক ব্যঙ্গ করতে চান।

আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানের অসারতা, ভ্রান্তমোহ, এ গল্পের এক অংশে অতি সুন্দরভাবে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ হয়েছে! সেখানে একাধারে পাল মশায় ও ভট্টাচার্য মশায়ের চরিত্রের সত্যতা প্রকাশিত হয়েছে। দু'জনের স্বভাবের অসংগতিই অতি হাস্য-করুণভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। পাল মশায় মদনের সহিত কিছুতেই তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না। তিনি বলেছেন,

"আমরা লেখা-পড়া জানা চাক রে ভদ্র সদ্গোপ। স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া

চাষ করিত। অতি কষ্টে সে ছেলেটিকে লেখা-পড়া শিক্ষা দিয়াছে। চাষ করা যে নিতান্ত গর্হিত কাজ, লেখা-পড়া শিখিয়া মদন তাহা বুঝিয়াছে।......

চাষ করিলে মানুষ চাষা হয়, আর চাকরিতে মানুষ বাবু হয়। তাহার যত টাকা থাকুক না কেন, আপনার নিকট একজন চাষা আসিলে নাক সিট্‌কাইয়া আপনি তাহার সহিত কথা কহিবেন না। কিন্তু সেই জাতীয় কোন লোক যদি চাকুরে হয়, তাহা হইলে, 'আসুন, আসুন, বাবু আসুন' বলিয়া আপনি তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইবেন। কেবল আপনি নহেন, দেশের সকল লোকই এইরূপ করিয়া থাকে। · ···

পঞ্চু একটু ইংরেজী শিখিয়া পনর টাকা বেতনে রেলে টিকিট কাটা কাজ পাইয়াছে, সেজন্য সকলে তাহাকে পঞ্চুবাবু বলে। চাকুরি না করিয়া সে যদি চাষের কাজ করিত, তাহা হইলে সকলেই তাহাকে পেঁচো চাঁড়াল বলিত। এই জন্য হাড়ি বাগ্‌দী সকলেই আপন পুত্রদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিয়া চাকুরে করিতে চেষ্টা করিতেছে। কাহার না ইচ্ছা যে, তাঁহার ছেলে জেণ্টেলম্যান হয়?" এখানে একাধারে লেখকের গভীর স্বদেশপ্রেম অপর দিকে তৎকালীন বাঙ্গালী জীবনের অন্ধ মোহ, ইংরাজী সভ্যতার প্রতি বিচারহীন ভালবাসা, চাকুরে জীবনের প্রতি ব্যাকুল আকর্ষণ ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ করেছেন। ইংরাজ আগমনের প্রাক্কালে, আমাদের জীবনের সেই এলোমেলো পরিবেশে দাঁড়িয়ে আমরা যেভাবে উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম, যার অভিশাপে আজও আমরা জর্জরিত, তাকে লেখক সেই পরিবেশে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। অতি স্পষ্টভাষাতেই এ ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে।

অন্যত্র শাস্ত্রকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে—

"তুমি হতাশ হইও না। শাস্ত্র হইতে বচন বাহির করিয়া পাল মহাশয়কে আমি বুঝাইয়া দিব যে, সকল সদ্‌গোপ একজাতি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"শাস্ত্র হইতে বচন বাহির করিতে পরিবেন?"

ঈষৎ হাসিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আমাদের শাস্ত্র মহাসাগর স্বরূপ। এমন জিনিষ নাই, যা ইহার ভিতর হইতে বাহির হয় না।"

টাকা দিলে শাস্ত্রের ভিতর হইতে যাহা ইচ্ছা তাহাই বাহির করিয়া দিতে পারা যায়।"

ভট্টাচার্য শ্রেণীর মানুষগুলোর হাতে প'ড়ে আমাদের মধ্যে অনেকেই

অনেক সময় নির্যাতিত হই। এরা ধর্মের নামে অনেক কিছুই করে থাকেন, যেগুলিতে ধর্মের কোন স্পর্শ নেই। এঁরা চতুর। মিথ্যা শাস্ত্রপ্রণেতা। এঁরা ব্যঙ্গের পাত্র।

মোটকথা, 'মদন ঘোষের বদনে হাসি' গল্পটির আরম্ভ হাস্যরসে হলেও এর মধ্যে করুণরসও জড়িয়ে আছে। জীবনের নানাতরো অসঙ্গতির চিত্র এখানে আছে। যে অসঙ্গতিগুলিকে আমরা বুঝি না, তাকে লেখক দেখিয়েছেন, যে জয়কে আমরা জয় বলে মনে করি তার অসারত্বকে বুঝিয়েছেন, যে পাওয়ার জন্যে আমরা লালায়িত হয়ে উঠি তার অকিঞ্চিতকরতাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য অতি নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি পালন করে গিয়েছেন। মানুষকে, বাঙ্গালীকে, তার পাপ থেকে মোহ থেকে, ভাবালুতা থেকে মুক্ত করে বাস্তবমুখী ও সত্য-আশ্রয়ী করে তুলতে তাঁর সর্বশক্তিকে যেন মনপ্রাণ ঢেলে নিঃশেষে নিয়োজিত করেছেন। ব্যঙ্গ-গল্পরূপে এটি একটি সার্থক প্রয়াস।

এতক্ষণ আমরা ত্রৈলোক্যনাথের রচনাবলীর প্রাণকেন্দ্রে যে ব্যঙ্গধারা—তারই বহুতর প্রকাশকে লক্ষ্য করলাম। মনে হ'ল, শুধু গল্প বলা, চরিত্র অঙ্কন করাই তাঁর লক্ষ্য নয়। নিছক গল্প শোনাতেও তিনি দক্ষ। তাঁর বর্ণনা-রীতি, ভাষার গতি, কল্পনার অভিনবত্ব আমাদের সর্বক্ষণই যেন কোন এক আলোছায়ায় ঘেরা জগতে নিয়ে যায়, তন্ময় করে রাখে। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়েও তার ব্যঙ্গ দৃষ্টি আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় না। সমাজের নানাদিককে, মানব চরিত্রের নানা অসঙ্গতিকে, তিনি অতি নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই পর্যবেক্ষণের ফলেই তাঁর প্রতিটি রচনা হয়ে উঠেছে ব্যঙ্গাত্মক সৃষ্টি। তাই (গ্রন্থাবলীর ক্রম-সজ্জা অনুযায়ী) বোধহয় "ফোকলা দিগম্বর" থেকে "মুক্তামালা" পর্যন্ত এই বিপুল রচনা সম্ভারের স্তরে স্তরে ব্যঙ্গ মাল্যের সুসজ্জা। তবু বলা যায়, বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন কাহিনীকে অবলম্বন করে তাঁর ব্যঙ্গের প্রকাশ ঘটালে কি হবে, মূলত তাদের মধ্যে বিভিন্নতা অতি নির্দিষ্ট। তাঁর ব্যঙ্গ প্রধানত গড়ে উঠেছে সামাজিক নিষ্ঠুরতা, নারীত্বের লাঞ্ছনা, ধর্মে ভ্রান্তি, সর্বপ্রকার ভণ্ডামি, অর্থের লালসা, ভোগের লালসা, চারিত্রিক দুর্বলতা, ইংরাজ-মোহ, হুজুগপ্রিয়তা, ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। এইদিক থেকে তাঁর ব্যঙ্গ রচনাকে সাধারণভাবে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে দিতে পারি। এই সাধারণ বিভাগের বাইরে যে কিছুই থাকতে পারে না এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। তবে ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গে গতি প্রকৃতিকে সহজভাবে অনুধাবন করার জন্যেই এই শ্রেণীবিভাগটি করা যেতে পারে। ধর্মীয়, ব্যবসায়িক ও সাহিত্যিক ভণ্ডামি, শিক্ষা-দীক্ষা, দাম্পত্য, প্রেম এবং মানব স্বভাবের সর্বপ্রকার ভ্রান্তি, দুর্বলতা, মূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতা নিয়েই তাঁর ব্যঙ্গ রচিত। তাই এই কয়টি শ্রেণীতেই তাঁর ব্যঙ্গকে ফেলতে পারি। এখানে বলে রাখা ভাল যে, পরশুরামের ব্যঙ্গের শ্রেণীবিভাগেও আমরা এইসব বিষয় অবলম্বন তো পেয়েছিই, আরও একটা দিক অতি অধিক মাত্রায় পেয়েছি, যাঁর প্রকাশ ত্রৈলোক্যনাথের প্রায় নেই। নেই এ কথা বলা ভুল। হয়তো তা ভিন্নতর রূপে আছে। আর যেটুকু নেই সেটুকুর জন্যে লেখকের পর্যবেক্ষণ শক্তির বা জ্ঞানের দীনতার কথা যেন না ভাবি। পরশুরাম রাজনীতিকে নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ গল্প সৃষ্টি করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ তা করেননি। করেননি কারণ প্রয়োজন হয়নি। তা'ছাড়া সাহিত্যে যুগপ্রভাবকে

স্বীকার করতেই হয়। পরশুরামের শিল্পী মানসের উপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ও স্বাধীন ভারতের ছায়া অতি স্বচ্ছভাবেই পড়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের সামনে এই দুইটিরই কোনটিই আসেনি। পরাধীন দেশে বসে তাই তিনি নিজেদেরই (জাতির) দুঃখ, দুর্দশা, দুর্বলতা, মূঢ়তাকেই লক্ষ্য করেছেন। জাতিকে তিনি সমগ্রভাবে গ্লানিমুক্ত করে তুলতে প্রয়াসী ছিলেন। ইংরাজকে গালি দিয়ে বাহবা নিতে চাননি। বরং তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে আমরা আমাদেরই স্বখাত সলিলে ডুবে মরছি, স্বজাতিয়ত্ব, স্বদেশপ্রেম, চারিত্রিক শৌর্য-বীর্য সবকিছু বিসর্জন দিয়ে, অন্ধ ইংরেজ মোহে, ভ্রান্ত ধর্মবুদ্ধিতে, কুসংস্কারের সঙ্কীর্ণ খাতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। এই খাত থেকে জাতিকে তুলে আনতে চেয়েছিলেন। তাই রাজনীতির নানা অসঙ্গতিকে বা ভণ্ডামিকে নিয়ে ব্যঙ্গ রচনা করার প্রয়োজনকে তিনি অনুভব করেননি। শাসকশ্রেণীকে সমালোচনা না করে, শাসিতের প্রতিই তাঁর ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে। কেননা, তিনি যে দেশকে ভালবাসেন, জাতিকে ভালবাসেন। "জাপানের উপকথা" (মজার গল্প) গল্পে তিনি যে উপকথাটি শুনিয়েছেন তার মধ্যে দিয়ে তিনি রাইকোর সাহস, বীরত্বের সুদৃঢ় সঙ্কল্পকে দেখিয়ে বাঙালীকে, ভারতবাসীকেও এ' বীরত্ব ও সুমহান সাহসের মধ্যে স্থাপন করতে চেয়েছেন। "পাপের পরিণাম" উপন্যাসের শেষে এসে তিনি বাঙ্গালী জাতির প্রতি একান্তভাবে মিনতি জানিয়েছেন যে সে যেন সৎ, সত্যবাদী হয়। সর্বত্রই তাঁর এই আকুতিকে আমরা দেখতে পাই।

ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় ধর্ম বিষয়ক ব্যঙ্গের একটি বিস্তৃত স্থান যে আছে তার সন্ধান আমরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে গল্প ও উপন্যাসের নানা স্থানে, নানা ঘটনায় দেখেছি। অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উদাহরণ দিলে এদিকটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই বিভিন্ন স্থান থেকে ত্রৈলোক্যনাথের ধর্মবিষয়ক ব্যঙ্গের উল্লেখ করা হল। "লুল্লু" গল্পতে আমীর লুল্লু প্রভৃতি ভূতদিগকে পৃথিবীর সমস্ত ভূতদিগকে যখন নিমন্ত্রণ করে আনতে বললেন, তখন লেখক লুল্লুর মুখে বলালেন, "সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল-ভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা। যেরূপ অপক্ব মৃত্তিকাভাণ্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্রপারের বায়ু লাগিলেই আমাদের ধর্ম ফুস করিয়া গলিয়া যায়"...ধর্ম সম্বন্ধে এই ধরণের ভ্রান্ত চেতনা দিয়ে অনেক গুরু, মাতাজীর, আবির্ভাব ঘটেছে, কেহ বা নয়নচাঁদের মত শীতলার ব্যবসা খুলেছে,

কোথাও বা "মুক্তামালা"র গড়গড়ি মহাশয়ের গুরুদেবের মত গুরু সেজে যতরূপ পাপকর্মে অবলীলায় আত্মনিয়োগ করেছে, "বীরবালা"র অম্নাবন্তা বাবাজীর মত বাবাজীর আবির্ভাব হয়েছে, "পাপের পরিণামে"র কালো বাবার মত বাবার আত্মপ্রকাশ দেখা গেছে, কত শত 'গাছে কোলা সাধু' ও রসিক মণ্ডলের সপ্তম বর্ষীয় কন্যার (ডমরুধর) মত কত কন্যার ঘাড়ে কত রকম ঠাকুরের যে আবির্ভাব ঘটেছে তার শেষ নেই। এইসব চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে লেখকের ধর্মবিষয়ক ব্যঙ্গের অনেকখানি প্রকাশ হয়েছে। তা' ছাড়া, আমাদের ভ্রান্ত ধর্মচেতনা থেকে আমাদের মধ্যে যে কত কুসংস্কার, মিথ্যা, পাপের প্রকাশ ঘটেছে তারও উল্লেখ ব্যঙ্গ-আলোচনার ক্ষেত্রে বিস্তৃতভাবেই দেখিয়েছি। এই ধর্মবিষয়ক ব্যঙ্গের মধ্যেই আমাদের পাপপুণ্যের ধারণাকে অতি সরসতার সহিত ব্যঙ্গ করা হয়েছে নানাস্থানে। এ প্রসঙ্গে আমাদের "নেই আঁকুড়ে দাদা," "মিস্তির-জা" ও যমপুরীর দৃশ্যের (নয়নচাঁদের ব্যবসা) চিত্র, ডমরুধরের লিঙ্গশরীর প্রাপ্ত হয়ে যমপুরীতে অবস্থানের দৃশ্যটির কথা বিশেষভাবেই মনে পড়ে। এই ধরণের ব্যঙ্গের মধ্যে আরও একটি দিক সহজেই এসে যায়। ধর্মের নামে তৎকালীন সমাজের যে নারী নির্যাতনরীতি তা-ও অতি করুণভাবে ব্যঙ্গের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। "ডমরুধরে" শুক্লাম্বর চাক মহাশয়ের কাহিনী, কঙ্কাবতীর সহমরণ গ্রহণের চিত্র, নেই-আঁকুড়ের বিধবা ভগ্নীর কারুণ্য ইত্যাদির মধ্যে ধর্মের নামে সামাজিক ব্যঙ্গ রচিত হয়েছে।

প্রেম ও দাম্পত্য বিষয়ক ব্যাঙ্গও ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় কোন কোন স্থানে আছে। এ প্রসংগে "ডমরু-চরিত", "ফোকলা-দিগম্বর", "মদন ঘোষের বদনে হাসি", "ভয়ানক আংটি", "পাপের পরিণাম", "বাঙ্গাল নিধিরাম" ইত্যাদি অনেক গল্পের নামই উল্লেখ করা যায়। এই গল্পগুলিকে নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে, সুতরাং আলোচনা না করে শুধুমাত্র উল্লেখ করলাম। ডমরুধরের দাম্পত্য জীবনকে আমরা জানি, সেখানে এলোকেশীর এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিষ্ঠান রয়েছে, ডমরু এলোকেশীর ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত, কেননা এলোকেশীর মেজাজটা কিছু ধারালো। শুধু কি তাই। ডমরুর স্বভাবকেও তো আমরা জানি। নারীর প্রতি তার যে এক দুর্নিবার আকর্ষণ। একা এলোকেশীর তার জীবনের সেই প্রচণ্ডমত আকর্ষণকে তৃপ্ত করবার শক্তি নেই। তবু এলোকেশীকে লুকিয়ে ডমরু যান দুর্লভী ও চঞ্চলার কাছে।

এলোকেশী যতই গ্রাম্য, অশিক্ষিতা, কুরূপা, হোন না কেন স্বামীর এ ধরণের চৌর্যবৃত্তিকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারে না, অসহিষ্ণু হয়ে তাঁর হস্তের মার্জনা বার বার ডমরুর পৃষ্ঠদেশকে ক্ষতবিক্ষত, করেছে। তবে সব সময়েই যে তিনি ক্ষিপ্ত তা' নন, ডমরুর অসুখে তিনি চিন্তাগ্রস্থও হয়ে পড়েন,—দাম্পত্যের এ এক বিচিত্র রীতি। এ রীতিতে অনেক অসঙ্গতি আছে, হাসির উপাদান আছে, তবু সত্যও আছে। ফোকলা দিগম্বরের স্ত্রী দিগম্বরীর আবির্ভাব ও দিগম্বরের লাঞ্ছনার দৃশ্যও দাম্পত্যের এক নূতনতর বিস্ময়ের নিদর্শনরূপে চোখে পড়ে, "কঙ্কাবতী"র অসুরায় পরিণত বয়সে স্ত্রীর কাছে যেভাবে ভীত দুর্বল হয়ে তাঁর (স্ত্রীর) কথাকে অমান্য করতে ইতস্তত করে—সবই একই ধরণের হাস্যাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এইরূপ পরশুরামে ত্রৈলোক্যনাথের মতই অনেক দাম্পত্য বিষয়ক ব্যঙ্গ-গল্প দেখতে পাই। এ ছাড়া, প্রেমের দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে ত্রৈলোক্যনাথের মদন ঘোষ, ভায়নক আংটির হারাধন, "কেন এত নির্দয় হইলে"র নটবর, মালতীকে দেখার পর ডমরুধর কালাবাবার প্রতি সোনাবৌ (পাপের পরিণাম) অথবা সুবালার প্রতি ধনুক-ধারী ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে অতি হাস্যকরভাবেই চিত্রিত করেছেন। এই সব স্থানেই তিনি প্রেমের নামে মানুষের মনে যে অহেতুক চঞ্চলতা, হাস্যকর ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্তা তাকেই ব্যঙ্গ করেছেন। প্রেমের নামে মানুষের মনে যে নির্বোধ আত্মযাতনার সৃষ্টি, তার হাস্যকর উপাদানটুকুকেই লেখক ব্যঙ্গ করেছেন। সত্যকারের প্রেমের জগতে যে ত্যাগ, দুঃখবরণ তা এ সব গল্পে প্রায় নেই, কঙ্কাবতীতে সেই মহত প্রেমাদর্শের প্রকাশ আছে। তাই কঙ্কাবতীকে অশেষ দুঃখ স্বীকার করতে হয়েছে। সেখানে তাই এদিক থেকে কোন ব্যঙ্গ নেই। পরশুরামও তাঁর গল্পের নানা স্থানে ভীরু প্রেমকে লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত করেছেন।

আমাদের ইংরাজ-প্রীতি যে আমাদের কতদিক থেকে পঙ্গু করে তুলেছে তার প্রতিও ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গ করেছেন। ইংরাজ আদব-কায়দা, ভাষা, অনুকরণকে অতি হাস্যকরভাবে দেখানো হয়েছে তাঁর রচনার নানা স্থানে। বিশেষ করে "কঙ্কাবতী"র সেই ব্যাঙ চরিত্র সৃষ্টিটিকে যেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে দেখানো যায়। এ ছাড়া "লুল্লু" চরিত্রকে যেভাবে সভ্য ভব্য নব্যতার প্রতীক-রূপে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে স্পষ্টতই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা-রুচিকে অতি তীব্রভাবেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এ ছাড়াও আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

যেমন "কঙ্কাবতী"র "ভূত-কোম্পানী" অংশতে 'স্কল, স্কেলিটন এ্যাণ্ড কোং'তে, "ডমরু-চরিতে"র পঞ্চম গল্প "স্বদেশী-কোম্পানী" অংশে, ইংরাজীতে বক্তৃতার কথায় লেখক আমাদের বিকৃত রুচি ও শিক্ষাকেই ধিক্কৃত করেছেন।

বাঙালীর হুজুকপ্রিয়তাকেও তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। বাঙালী অতি অল্পতেই এক একটা হুজুকের দ্বারা মেতে উঠে। কোন ঘটনার পিছনে সত্য-মিথ্যার স্থান কতটুকু আছে না ভেবেই আমরা কি ভাবে যে দলে দলে সেদিকে ছুটে যাই তা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। কিন্তু যখন আমরা যাই তখন একটুও ভাবি না। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে রকলেই তখন সমান ভাবে হাস্যকর হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতার সুযোগে অনেকে আবার লাভবান হন যেমন, নয়নচাঁদ, ডমরুধর গাছে ঝোলা সাধু, ইত্যাদি হয়েছিলেন।

মানুষের অতিরিক্ত অর্থ-পিপাসাকে তিনি অতি প্রকটভাবেই ব্যঙ্গ করেছেন। বিশেষ করে তৎকালীন সমাজে যে কন্যা বিক্রয়ের রীতি ছিল তাকে অতি নিষ্ঠুরভাবেই আঁকতে চেয়েছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে সাহিত্যবিষয়ক ব্যঙ্গও কোথাও কোথাও আছে। "লুল্লু", "মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প" (মুক্তামালা) এ প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবেই মনে পড়ে। এ ছাড়াও কোথাও কোথাও দু-একটি লাইনেও এ ধরণের ব্যঙ্গ দেখা যায়।

সাধারণ মানুষের ছোট ছোট ত্রুটি দুর্বলতাগুলিও তাঁর ব্যঙ্গ-দৃষ্টির অন্তরালে ঢাকা পড়েনি। তাহলে তিনি ডমরুধরকে অত নিখুঁত করে আঁকতে পারতেন না। তাঁর ভিখু ডাক্তার চরিত্র-অঙ্কন সর্বাংশে সার্থক। গ্রামের একটি ডাক্তার ভিখু। চিকিৎসা বিদ্যায় তাঁর বিশেষ জ্ঞান নেই, জ্ঞানের মধ্যে জানতে পাই যে কলকাতায় তিনি কেবল ছয় মাস কম্পাউণ্ডারি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখে তাঁর অতীত চিকিৎসা জীবনের যে সব অবিশ্বাস্য হাস্যকর কাহিনী শুনতে পাই তা আমাদের চমক জাগায় ও হাসায়। পরশুরামের "চিকিৎসা সঙ্কটে"র তারিণী কবিরাজের কথা বিশেষভাবেই মনে করায়।

হাস্যরস সৃষ্টিতে (কেদারনাথ ও প্রভাতকুমারের উপরে)
ত্রৈলোক্যনাথের প্রভাব

কেবলমাত্র হাস্যরস সৃষ্টির জন্যেই সাহিত্যে আবির্ভাব, বাংলা সাহিত্যে এমনজনের নাম অতি অল্পই। যে কয়জনকে পাই তাঁর মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে পারি। এঁর পাশাপাশি আরও দু'একজনকে মনে পড়ে। তাঁদের মধ্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। কেদারনাথ অকৃত্রিম, দরদী লেখক। অসহায় মানুষের প্রতি ভালবাসায় তাঁর অন্তর কানায় কানায় ভরা। সভ্যতা অভিমানী মানুষের গর্বিত-স্পর্ধা, তাদের সহজ প্রাণধারার অভাব, তাদের হীনতা, দীনতার পাশাপাশি প্রকৃতি-লালিত, স্বভাব-সুন্দর মানুষগুলোর প্রাণ-প্রাচুর্য, সরলতা, উদারতা লেখককে কেমন যেন স্তম্ভিত করে তোলে; একজনের সঙ্গে আর একজনের কত প্রভেদ। এই ভাবনা লেখককে ব্যথিয়ে তোলে। তাই তো তিনি প্রতিকারের সরল পথটি বেছে নিলেন। হাসির মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের ব্যথাকে ভুলতে চাইলেন। হাসির মধ্যে দিয়ে আমাদের সতর্ক করতে চাইলেন। রচনা হল ব্যঙ্গ-সাহিত্যের, সৃষ্টি হ'ল "কোষ্ঠির ফলাফল", "ভাদুড়ী-মশাই"। এই দুইখানি গ্রন্থই কেদারনাথের প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা। যদিও বলা চলে, তাঁর সমগ্র রচনারই মূলসুর একটি। সে কোন একটি বিশেষ রস নয়। সে হচ্ছে হাসি ব্যঙ্গ করুণা ও কান্নার সংমিশ্রণে গড়া মিশ্র রস।

কিন্তু কেদারনাথ সাহিত্যের জগতে যে পথের সন্ধান পেয়েছিলেন, সে পথকে দ্যুতিমান করে গেছেন যিনি তাঁকে যদি আমরা না দেখতে পাই তবে যে আমরা মোহাচ্ছন্ন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। সেটা আমাদের পক্ষে এবং লেখকের পক্ষেও দুর্ভাগ্যের কারণ। যাঁর যেটুকু পাওনা তাঁকে সেটুকু না দিয়ে যে কারও মুক্তি হতে পারে না। তাই কেদারনাথের হাস্য-রসের সৃষ্টির ওপরে যে ত্রৈলোক্যনাথের প্রভাব রয়েছে, এ-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। সে প্রভাব কোথায় স্পষ্ট। কোথাও বা ছায়া ছায়া। তবু প্রভাবকে তো স্বীকার করতেই হবে। তবে এই প্রভাবে তিনি চাপা পড়ে গেছেন, না ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন সে প্রসঙ্গ-স্বতন্ত্র।

কেদারনাথের উপরে ত্রৈলোক্যনাথের প্রভাব-প্রসঙ্গ অবতারণার পূর্বে

হাস্যরসিক কেদারনাথের রচনা-বৈশিষ্ট্য কিছু জানা আবশ্যক। কোন সংকোচ না রেখেই আমরা বলতে পারি কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সার্থক হাস্য-রসস্রষ্টা। নির্মল, নির্দোষ, উপভোগ্য হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি সুনিপুণ জীবন-দর্শনে তাঁর কোন ফাঁক নেই। তাইতো-হাল্‌কা কথা, লঘু পরিবেশ, সামান্য চরিত্র সৃষ্টির পাশে পাশে কখন যে তাঁর মুখ থেকে গভীর কথা বেরিয়ে পড়ে তা' ভাবলে আমরা অভিভূত না হয়ে পারি না। ছোট্ট একটি উদাহরণ।

"একলা একখানা আস্তো লেপের মধ্যে যে এত আরাম তা বড় একটা জানা ছিলনা,—সুযোগ ঘটে নাই। দেখি যতদূর হাত-পা ছড়াই—ততদূর রাজত্বি। কেহ আপত্তি করে না,—বাঃ!

লেপের মধ্যে হাত দুখানা কখনো বুকের আশ্রয়ে কখনো পাজরার পাশে, কখনো বা কাঁধচাপা (অবশ্য নিজের)—থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের বাড়্ (growth) মরিয়া গিয়াছিল। পদও নিরাপদ ছিল না।

আজ রাত্রে ঠাণ্ডাটা খুবই ছিল; তাই লেপ-খানা লইয়া কতকটা পাছতলায় মুড়িয়া দিলাম, আর দু'ধার টানিয়া গুটাইয়া খোল বানাইয়া ফেলিলাম। বাঃ বেশ তো! এতদিন এ আরাম-শিল্পটা শিক্ষার সুযোগই হয় নাই। হাত-পার অবস্থা তো পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি। তাহার উপর ব্রাহ্মণী পাশ ফিরিলে লেপের আশ আর থাকিত না,—"নিয়ে নড়তেন।"

সবচেয়ে উপভোগ্য ছিল,—প্রণয়ের প্রভাতী পাল্‌টা। নিদ্রান্তে আমাকে শয্যাপ্রান্তে, এই অবস্থায় দেখিয়া যখন সরোষে বলিতেন,—"সারা নেপখানা যে বড় আম্মার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন এত গরম কিসের! একটা শক্ত কিছু না পাকিয়ে ছাড়বে না বুঝি। আমার আর সে গতোর নেই।" ওই সুমধুর "সে" শব্দটার অর্থ যদি জিজ্ঞাসা করি তো অনর্থ অনিবার্য্য।

একদিন বলিয়াছিলাম "ও কিছু নয়; তুমি ভেবনা, ও একটা, সাধনা। গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'হায় রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়,
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।'

—তাই লেপখানা থেকে আরম্ভ করে দেখছি।" তিনি স্থির চক্ষে একদৃষ্টে

আমার দিকে চাহিয়া বলেন—"বটে!" —বারেন্দর বললে না? তিনি তো হরিমতিদের গুরু, তোমার আবার গুরু হলেন কবে! না-না-ও সব হবে না, রোগ হলে তিনি দেখতে আস্‌বেন কিনা!—যত সব অলুক্ষুণে মোস্তোর! ক্যালা ফেলি আবার কি!"

বৈকালে গায়ের কাপড় খুঁজিয়া পাই না,—সব সিন্দুকে ঢুকিয়া পড়িয়াছে! বলিলেন—"হ্যাঁ—দিলুম আর কি,—তারপর "পথপ্রান্তে" হয়ে যাক্!"

কি মুস্কিল! জগৎটা এইরূপ বোঝাবুঝি লইয়া বেশ চলিয়াছে!" —এখানে এই একটি মাত্র শেষ ছত্রই সমস্ত ঘটনাটির হালকা মেঘের চঞ্চলতার মাঝে অকস্মাৎ কালো মেঘের গভীরতা নিয়ে দেখা দিয়েছে। এ রকম তাঁর রচনায় অনেক আছে।

হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অভিনব অলংকার প্রয়োগ কেদারনাথের একটি বিশেষরীতি। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

"যান পরিবর্তন অর্থাৎ আমার পক্ষে 'জান পরিবর্জন", (পৃঃ ৮) "সব যেন মড়কের মাল", "গেঁটে যাত্রা (পৃঃ ৯)", "বিকশিত মোড়ক মহাশয়", "এ ভিড্ ভাসুরকে ভরা" (পৃঃ ১৬)", "আরোহীগুলি গান্ধী মহারাজের নামে যেন গেঞ্জী বনিয়া গেল! (পৃঃ ১৮)", "অম্বলের অসুখ থাকিলে স্ত্রীলোকের লজ্জা থাকিতে পারে না।" "মানুষ অবস্থার দাস না হইলে জগতে বৈচিত্র্য বলিয়া কথাটা একটা কথার-কথা হইয়া অভিধানের মধ্যে আত্মহত্যা করিত।" (পৃঃ ২৩০) "চেহারাখানা দেখেছ ত'—যেন নাটমন্দিরের দেরকো।" (পৃঃ ২৭৯) "ঝির ওপর একটি তক্ষকের কটাক্ষ হেনে" (পৃঃ ৩০৩), "হাবসী হাঁচি" (পৃঃ ৩০৩), "হাত তো নয়, যেন সেকালে জামবাটী (পৃঃ ৩০০), "আমি পরের জিনিষের মত একখানা বেঞ্চে পড়ে রইলুম" (পৃঃ ৩৬৪), "মেয়েদের সাগ্রহ চক্ষুগুলি চৌদ্দ পিদ্দীমের মত জ্বলিয়া উঠিল" (পৃঃ ২৮৬), মরণের সহিত পূর্ব-পরিচয় না থাকায় বিমূঢ় জয়হরি ভাবিয়াছিল—সে মরিয়া গিয়াছে।" (পৃঃ ২৬৫) "কড়ি-মধ্যমের উচ্ছ্বাস" (পৃঃ ২৬৮)—ইত্যাদি কত সুন্দর সুন্দর অর্থবহ শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ কেদারনাথে দেখা যায়। এগুলো যেন তাঁর হাস্যরসের প্রাণকেন্দ্র।

এতক্ষণ কেদারনাথের রচনায় কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরার চেষ্টা

১। কোষ্ঠীর ফলাফল—২৭৮ পৃঃ

করেছি। কিন্তু এসব বৈশিষ্ট্যের আড়ালে ত্রৈলোক্যনাথের প্রভাবকে পেতে আমাদের কোন কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। অতি সহজেই তা' চোখে পড়ে। কেদারনাথকে দেখতে দেখতে ক্ষণে ক্ষণেই ত্রৈলোক্যনাথ চোখের সামনে ভেসে ওঠেন। কিছু কিছু উদাহরণের পথ দিয়ে না গেলে বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে তোলা সম্ভব নয়। কাজে কাজেই সেই পথই নেওয়া হ'ল।

"মাতুল যে খুব দুর্বল ধাতের ভীতু-লোক, তাহা বুঝিয়াছিলাম। তিনি শশব্যস্তে প্রশ্ন করিলেন—"কি ঠাকুর মশাই ?" গম্ভীরভাবে বলিলাম—"যে-সে ঠাকুর নন,—বাবাঠাকুর!"

"বলেন কি মশাই,—অ্যা—এখানেও!" বলিয়া মাতুল দুই হাত শিথিলভাবে একত্র করিয়া—যেন একটি সুপুষ্ট কাবুলী কাম্‌রাঙ্গা কপালে ঠেকাইলেন ও ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিলেন—"অপরাধ নিওনা বাবা, বড় বিপদে পড়েছি—জানতেই পারচো, দয়া ক'রে ভাল করে দাও; তা' না হলে আমিও বে-খিদ্‌মতে মরে' যাব' ঠাকুর।"

মামার আবেদনটা যেমন সত্য, তেমনি আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল।

অমর কিছু বুঝিতে না পারিয়া, বিশেষ আগ্রহে দুই চক্ষু ও ভ্রূদ্বয় কপালে তুলিয়া, ঘাড়টা পশ্চাতে হেলাইয়া তাহার বৈবাহিককে প্রশ্ন করিল—"দেবতা নাকি,—কোন্ দেবতা ?"

মাতুল তাহার কানের কাছে ঝুঁকিয়া—গম্ভীরভাবে বলিলেন—"দেবতা নয়—দেবতার বাবা!"

"কাজ নেই বাবা, সকলকে সন্তুষ্ট রাখাই ভাল, কে কখন কি কাজে লাগে বলা যায় না।" এই বলিয়া অমরও নমস্কার করিল।[২]

মানুষের দুর্বলতার শেষ নেই। দুর্বল মানুষ তার সকল অপরাধকে মনে করে যখন অসহায় হয়ে পড়ে, তখনই সে চায় অবলম্বন। যার পরে সে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে বাঙালী চিরদিনই ধর্মভীরু জাতি। এ জাতির অস্থি-মজ্জার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভীরুতা। তাই সে সুযোগ ও সুবিধা মত ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর সৃষ্টি করে নিয়েছে। এখানে দেবতাকে ভক্তি অথবা উপলব্ধির প্রশ্ন নেই। বাঙালী চরিত্রের এই দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করেছেন কেদারনাথ।

২। কোষ্ঠির ফলাফল—৯২-৯৩ পৃঃ

ইতিহাসের পূর্বেও ইতিহাস আছে, তেমনিই কেদারনাথের পূর্বে ত্রৈলোক্যনাথের প্রস্তুতি। পূর্বে-উদ্ধৃত অংশটির সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের নিম্নে-উদ্ধৃত রচনা-অংশটির যে কত মিল তা বোধহয় বুঝিয়ে বলার কিছু নেই।

"আজকাল দেশের যেরূপ হাওয়া পড়িয়াছে, তাতে সেকালের মত আর হাবড় হাটি ব্রহ্মজ্ঞান তেত্রিশকোটি দেবতার পায়ে তেল দিলে চলিবে না। উহারই মধ্যে দুই চারিটি মাতালো মাতালো দেবতা বাছিয়া লইতে হইবে। পূজা দিতে হয়, সেই দুই চারিটি দেবতার দাও। আর সব দেবতাও মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকেন, থাকুন! ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাইবেন।"

সকলেই বলিলেন,—"ঠিক! ঠিক! ঠিক কথা। হাবড় তাবড় তেত্রিশকোটীর চাল-কলা যোগায় কে হে, বাপু! পূজা না পাইয়া মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাকে, থাক। বেচারি গুলিখোরদের যে পুঁটি মাছের প্রাণ, সে-টি তো বুঝিতে হবে। উহার মধ্যে দু-একটি বাছিয়া লও, লইয়া বাকী সব না-মঞ্জুর করিয়া দাও।

সকলেই একবাক্য হইয়া সায় দিলেন। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, এই দুইটি দেবতাই অতি চমৎকার দেবতা। আর সমুদয় দেবতাকে না-মঞ্জুর করিয়া মাটীতে মাথা ঠুকিয়া, এই দুইটি দেবতাকে সকলে প্রণাম করিতে লাগিলেন। মাটীতে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সকলে বলিলেন,—"হে মা কাটি-গঙ্গা। হে বাবা ফণী মনসা! তোমাদের পায়ে গড়। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ।"[৩]

অন্যত্র দেখি, আমাদের দেশের ভীরু ধর্মপ্রাণ মানুষগুলোকে ঠকিয়ে এক-শ্রেণীর লোক বেশ দু'পয়সা করে নিচ্ছেন। অর্থ, যশ, মান, প্রতিপত্তি সবকিছুই তাঁরা প্রতারণার বিনিময়ে অতি সহজেই লাভ করছেন। অক্লেশে তাঁরা সব জুলুম চালান, আর বাঙালী অসহায়ের ন্যায়, মূর্খের ন্যায় ঐ সব ছদ্মবেশধারীর কবলে পড়ে। দুঃখ সেখানে যে, এই মুখোসধারীকে কেউ বুঝতে পারে না, অথবা বুঝতে চেষ্টা করে না। সমাজ এইভাবেই প্রতারিত হয়েছে, হচ্ছে।

"সহসা চেরা-আওয়াজ—"ধূমাবতী কবচ?"

চমকে চেয়ে দেখি—গাড়ির পা-দানে পাকৃতেড়ে এক সাধুমূর্তি! গলে—

৩। মঙ্গলদাঁদের ব্যবসা—৫১ পৃঃ।

রুদ্রাক্ষের মালায় ছোট একটি সিঁদুর মাখানো রূপার ত্রিশূল ঝুলছে। ভালে হোম-ভস্ম। পরিধানে গৈরিক। চক্ষু রক্তবর্ণ।

"অবধান" বলিয়া সুরু করিলেন,—"দেশের দারুণ দুর্দশা আসছে জেনে মন্ত্রসিদ্ধ আগমবাগীশ এই অমূল্য মন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। লোকহিতার্থে মাত্র পাঁচ সিকে নিয়ে বিতরণ করা হয়। তাঁর আদেশ—যতদিন না এই সজীব বর্ম বাংলার ঘরে ঘরে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, ততদিন আমাদের ছুটি নেই। যার যা কষ্ট এই কবচ তা কর্তন করে। অভীষ্টলাভান্তে সামর্থ্য মত মায়ের পূজা পাঠিয়ে দিতে হয়। এই কাগজে ঠিকানা প্রভৃতি সব পাবেন। এর গুণ ইতিমধ্যেই অনেকের পরীক্ষিত। সকল ট্রেনেই এমন অনেক লোক প্রত্যক্ষ করি, যাঁরা অযাচিতভাবে কবচের গুণ সমর্থন করেন,—আমাকে কিছু বলতে হয় না। এ দেশের দৈব ছাড়া পথ নেই জানবেন। জয় মা ধুমাবতি, সকলকে সুমতি দাও, দেশ রক্ষা হোক্ মা!"

চোখ উল্‌টে শূন্যে নমস্কার।

গাড়ীখানা বড় ছিল—বোগি। এক কোণ থেকে এক কানে হীরের মাকড়ি পরা একটি মাড়োয়ারী—হাতজোড় করে বললেন,—মহারাজ, হামি আপনেকো ঢুঁড়তে ছিলুম। যো তাবিজঠো দিয়েছিলেন সে বহুৎ নফা দিয়েছে। সাড়ে চার টাকায় মকাই ধরেছিলুম,—পউনে সাত দিয়েছে। মায়ের কিরপা। আউর দুঠো দিজিয়ে।"

আড়াই টাকা দিয়ে দু'টি কবচ নিলেন। মায়ের পূজার জন্যেও পাঁচ টাকা দিলেন।

আরো দু'তিনজন নিলেন। বললেন,—তাঁদের অঞ্চলের ভগবতীবাবুর ১২ বছরের হাপুরে-হাঁপানি,—'হিমরড্' হার মেনেছিল,—এই কবচ ব্যবহারে তা একদম সেরে গেছে। আশ্চর্য মহিমা মশাই!

একটি হ্যাট্-কোট-প্যাণ্ট পরা প্রৌঢ় চশমাধারী বাবু, গ্লাড্‌স্টোন্ ব্যাগ থেকে টাকা বার করে বললেন—"আমাকেও দু'টো দিন।"

আমরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাই করছিলুম। আমি আর থাকতে পারলুম না, বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করলুম—"—মশাই—আপনি শিক্ষিত লোক দেখছি, আপনার এরূপ বিশ্বাস জন্মাবার নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ আছে?"

"আছে বইকি মশাই। তা না তো—আমি একজন উকীল মানুষ,—যাদের প্রিন্‌সিপল্ প্রায় পুলিসের মতই—গুরুকেও মিথ্যেবাদী ঠাওরানো, আর

কাজ,—অন্যের মাথা মুড়ুনো, সেই আমিই মাথা মুড়ুচ্ছি!—রোগ, দুঃসময়, এসব তো দেখাই ছিল, কিন্তু কুচকুচে কালো-মেয়ে—ফুটফুটে গৌরাঙ্গী হয়, এই অভাবনীয় ব্যাপার—তাও চক্ষে-দেখলুম! আবার ভোলা-গাঁয়ের গোটা সাতেক রাবিস্ ফেঁসো-ছেলে, তিন তিনবার ম্যাট্রিক ফেল্ ক'রে যাত্রার দল ফেঁদেছিল; এই কবচ ধারণ ক'রে সাতটাকে সাতটাই,—শ্রীমন্তের পালা যাদের পুঁজি,—ফার্স্ট ডিভিসনে পাস্!..... আমারো দু'টো হাবাতে ছেলে ঐ ইস্কুলে পড়ে,—ম্যাট্রিক দেবে।......মাইনে আর পরীক্ষার ফি দিতে ফতুর না হয়ে—আড়াই টাকায় নিশ্চিন্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?"[৪]

আর একটি উদাহরণ।

"সহসা দ্বাররক্ষক বা দ্বাররোধকদের মধ্যে একটি সোরগোল—"নহি—নহি" শব্দে প্রকাশ পাইল,—কারণটা সহজেই সকলে বুঝিয়া লইয়া তাহাতে যোগ দিলেন। কারণ, সাযুজ্য অবস্থায় গ্রহণ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, তখন লোকে-প্রবৃত্তির পারে পৌঁছিয়া যায়, তাই (সরোষে ও সজোরে প্রবেশ-প্রার্থীদের ধাক্কা মারিয়া) ত্যাগই বিধি।

কিন্তু এ কি! এ যে আবার সেই সুপরিচিত স্বর! বোধহয় সুবিধে নয় দেখিয়া তিনি হাঁকিলেন—"বোলো ভাই গান্ধী মহারাজ কি জয়!"

কি আশ্চর্য প্রভাব,—উত্তেজিতেরা বিমূঢ়বৎ হইয়া গেল। কাহারো আর কথা ফুটিল না—কণ্ঠে জড়তা আসিয়া গেল। কেহ কেহ বলিয়া ফেলিল—"আপনি স্থান করিয়া লইতে পারেন ত' আমাদের কোন আপত্তি নাই।"—"ভাই ভাই এক্ ঠাঁই" বলিতে বলিতে তিনি তো উঠিয়া পড়িলেন।

আরোহীগুলি গান্ধী মহারাজের নামে যেন গেঞ্জী বনিয়া গেল!"[৫]

এই দুইটি উদ্ধৃতির সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের নয়নচাঁদ চরিত্রের সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে। কেদারনাথের "ধূমাবতী কবচ" বিক্রেতা সাধুটির সহিত অথবা "গান্ধী-প্রিয়" ধূর্ত লোকটির সহিত ত্রৈলোক্যনাথের নয়নচাঁদের বড় বেশী পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। এরা সকলেই একই সমাজের, একই গোত্রের, রূপ ভিন্ন ভিন্ন হলেও স্বরূপ একই।

কেদারনাথ গুরুবাদকে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁরও আগে যে ত্রৈলোক্যনাথও

৪। কোষ্ঠীর ফলাফল—৪৮৮—৪৯০ পৃঃ।
৫। কোষ্ঠীর ফলাফল—১৮ পৃঃ।

গুরুবাদকে ব্যঙ্গ করেছেন, তার সাক্ষরও আমরা দেখতে পাই। কেদারনাথের "ভাদুড়ী-মশাই" গ্রন্থের সাধুবাবাটি যেন ত্রৈলোক্যনাথের "মুক্তা-মালা"র গুরুদেব চরিত্রের অথবা "ডমরুধর-চরিতের" সন্ন্যাসীটির নবতর সংস্করণ। নিম্নে উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল।

"পূজারী শুনিয়ে দিলেন,—'দু'খানা বকরা, দু'গাছা কাপড়; দু' বোতল সরাব, আর পাঁচঠো টাকা চড়ালেই হোবে। সব আখণ্ড দেওয়া চাই। দেবতা বড় দয়াল আছে, ছিটে-ফোঁটা কি টুকরা-টাকরার হাঙ্গামা নেই। আর কর্তাবাবুর চাই কেবল মনমে মনমে অভীষ্টের প্রার্থনা, আউর একবার সষ্টাঙ্গ প্রণাম আর সাথ-সাথ তিন পাক উল্‌টি-পাল্‌টি (গড়াগড়ি) ;—বস্ সিদ্ধি।"[৬]

"আন্তরিকতার ফল আছেই। একদিন দেখি, একটি ভস্মমাখা হাস্যমুখ বলিষ্ঠ যুবা-সাধু রায়-সাহেবের বাংলোয় ঢুকলেন। আর যাবে কোথায়! দাঁড়া-হত্যে দিয়ে খাড়া রইলুম।—"

"আধ ঘণ্টা পরে প্রত্যাবর্তন, হাতে একটি নূতন হাঁড়ি। করযোড়ে পৌঁছে পাকড়াও করলুম। প্রসন্নমুখে কথা কইলেন—'আমি সিদ্ধমহাত্মার চেলা, বহু ভাগ্‌সে এই সাত বরিষ তাঁর সঙ্গলাভ ক'রে ধন্য হয়েছি। কুছু প্রার্থনা থাকে ত—আশ্রমে গিয়ে সাক্ষাৎ কোরো,—কৃপা করতে পারেন। বাধক-আধক থাকে ত সোভি আচ্ছা করে দেবেন। রিক্তহস্তে সাধুদর্শন নিষিদ্ধ—কিছু ঘিউ নিয়ে যেও,—কমসে কম এক পউয়া। তোমারে কুলকুত্তার বড়া বড়া ভুকিল ভি আসে। এই দেখিয়ে না রায় সাহেব পাঁন-সের গেইয়াকে ঘিউ ভেজিয়ে দিলে। মহাত্মা সব-কুছ করতে পারেন,—মনোবাঞ্ছা পুরে যাবে। সারি রাত্ হুমন করেন, কুছ খায়েন না,—ঘিউ রস পিয়ে থাকেন। ভীষমদেবকা সহপাঠী,—ইচ্ছামৃত্যু।"[৭]

ত্রৈলোক্যনাথের গুরু বা সন্ন্যাসীর মতই কেদারনাথের গুরু বা সাধুবাবা। ধর্মের পথে তাঁরা পা বাড়ান না; জীবনে জয়লাভের জন্যে অধর্মকেই তাঁরা একমাত্র পথ বলে বেছে নিয়েছেন। লোককে দেখান তাঁরা ত্যাগী মহাপুরুষ। তলে তলে তাঁরা ভোগের চূড়ান্ত করে ছাড়েন। দুর্নীতি আর দুরাচারকে তাঁরা ধর্মের গৈরিক বর্ণে মুড়ে রাখেন। তাঁরা আসলে অসাধু, নীচ, ঠক,

৬। ভাদুড়ী মশাই—১৪ পৃঃ।
৭। ভাদুড়ী মশাই—৭৪ পৃঃ।

প্রবঞ্চক। তলে তলে তাঁদের চলে কোথাও বা ঘি-এর ব্যবসা, কোথাও বা মাংসের কারবার, কোথাও বা আর অন্য কিছু!

মানুষের পাপ-পুণ্যের ভ্রান্ত ধারণাকে ত্রৈলোক্যনাথের মতই কেদারনাথও ব্যঙ্গ করেছেন। মাঝে মাঝে সে ব্যঙ্গের সুরে এত মিল আছে যে প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়।

"সেই বংশে জন্মে—হতভাগ্য আমি কিছুই পারলুম না তবে তাঁদের one of the পুত্র-বধূ—এই হতভাগ্যের পত্নী, যথাসাধ্য কিছু করেছে। বুদি-গাইটে বেন্ বন্ধ করে বসে বসে খাচ্ছিল, ছাড়লেই আনায় ছ'গণ্ডা। সেই জ্যান্তো গো-হাড় পুরুত ঠাকুরকে ধাঁ করে দান করে ফেললে। কি নাড়ী-জ্ঞান মশাই —তাঁর বাড়ী থেকে তিন দিনের মধ্যেই সে ভাগাড়ে পৌঁছে গেল, আর পুরুত মশাই ঋণ পরিশোধ করলেন ন'-সিকে! গো-দান মহাপুণ্য,—গরু তো বটে, গাধা তো কেউ বলবে না। কিছু আমাতে অর্শাবেই। কি বলেন?"[৮]

আর একটি উদাহরণ।

"পড়ি কি সাধে,—ওর মাহাত্ম্যে যে মেরে রেখেছে মশাই। নিত্য পড়লে আর গীতা দান করলে নাকি,—দানও যে করিনি তা নয়; যদিও তাঁর বাঁধাতে বারো আনা লাগবে, ভার্যা প্রিয়বাদিনী হন।"[৯]

কেদারনাথের এই ধরনের ব্যঙ্গ সৃষ্টির মূল উৎস ত্রৈলোক্যনাথ। এ উক্তির সত্যতা দেখানোর জন্যে নিম্নে উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল।

"যমদূতেরা আসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া টিকিটি খুঁজিতে লাগিল, ইচ্ছা যে, টিকিটি ধরিয়া আমাকে যমপুরীতে লইয়া যায়। কিন্তু আগে থাকতে আমি একটি বুদ্ধির কাজ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেইদিন প্রাতঃকালে, রোগের বে-গতিক দেখিয়া মনে করিলাম যে পৃথিবীতে আসিয়া আমি কখনও কোন একটি পুণ্যকর্ম করি নাই। চিরকাল পাপ করিয়াছি। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, চুরি, জাল প্রভৃতি যাহা কিছু পাপকর্ম, সকলই করিয়াছি। ভাল কাজ একটিও করি নাই। এখন তো দেখিতেছি, মৃত্যু উপস্থিত। যমকে গিয়া জবাব দিব কি? তাই মনে করিলাম যে, এই অন্তিমকালে একটি পুণ্যকাজ করি! আমি চন্দ্রায়নটি করিলাম। গোয়ালে

৮। কোষ্ঠির ফলাফল—২৯৬ পৃঃ।

৯। কোষ্ঠির ফলাফল—৩৩০ পৃঃ।

আমার একটি এঁড়ে বাছুর ছিল। আমি মিত্তির জা। আমার গোয়ালের এঁড়ে বাছুর কেমন তা' বুঝিয়া লও। এক ফোঁটা দুধ থাকিতে গাইকে আমি কখনও ছাড়ি নাই। মা'র দুধ কারে বলে বাছুরটি তা' কখনও চক্ষে দেখে নাই। অন্ন খাওয়া দাওয়াও তদ্রূপ। সুতরাং না খাইয়া খাইয়া বাছুরটি অস্থিচর্মসার হইয়াছিল। মর মর হইয়াছিল। সেই এঁড়ে বাছুরটি একজন ব্রাহ্মণকে দান করিলাম। দড়ি ধরিয়া বাছুরটিকে ব্রাহ্মণ লইয়া চলিলেন। আমার বাড়ীর বাহির হইয়াই রাস্তার উপর বাছুর শুইয়া পড়িল, সেইখানেই মরিয়া গেল।[১০]

আমাদের পাপপুণ্যের ভিত্তিহীন ধারণার মূলেই যে ত্রৈলোক্যনাথ কুঠার-আঘাত করতে চেয়েছেন তাহাই নয়, আমাদের ধর্মবোধ, মিথ্যা কুসংস্কারকেও তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন। কেদারনাথও তাঁর রচনায় ফাঁকে ফাঁকে ত্রৈলোক্যনাথের মতই ভ্রান্ত ধর্মবোধ, কুসংস্কার ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ করেছেন।

"তা তো বটেই,—আমরা আর কি করছি বলুন! আমাদের এই মুমূর্ষু ধর্মের, ওরাই মকরধ্বজ। তেমন সব গিন্নি-বান্নি ক্রমেই কমে আসছেন,—এমন প্রাচীন ধর্মটা রক্ষার পক্ষে সেটা"—"বড়ই চিন্তার কথা;—" এই বলচেন! কিছু ভাববেন না,—ও সব অমর জিনিষ। অন্ন-পিসিরা থাকতে কোন চিন্তা নেই, তাঁরা বীজ না রেখে যান না। কঠোর নিয়মী, বিধিনিষেধ খুঁটিয়ে পালন করেন। ষষ্ঠীগুলিতে কি নিষ্ঠার সহিত ময়দা মাখা; 'কুমড়ো-বলি' চলে,—দেখলে আপনার হতাশ হবার কোন কারণই নেই মশাই। দেখে থাকবেন,—দাঁত গিয়েছে—দাঁত-খোঁটা যায়নি। ধর্মের শরীর,—চিরদিন এই ধর্মটা সাম্‌লে আসচেন এবং রেখেছেন।—

"স্বর্গে তো যাবেনই, পাছে সেখানে না মেলে—তাই নবীপিসি শপথ করিয়ে রেখেছেন, সঙ্গে একখানা কুরুণী আর একটি হামানদিস্তে দিতে ভুলিস্‌নি বাবা—ধর্ম না খোয়াই। পাঁড় শশা, শাঁকালু, মূলো, নারকোল, নারকুলে কুল—এ সব কুরে আর থেঁতো করে খেতে হয় কিনা।"—এ ধর্ম কি যায় মশাই!"[১১] কেদারনাথের এই উদ্ধৃত অংশটির সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের যে কোথায় মিল তা' দেখানোর জন্যে নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ হ'তে উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল।

১০। নয়নচাঁদের ব্যবসা—৫৭ পৃঃ।
১১। কোষ্ঠির ফলাফল—৪৫০ পৃঃ।

"তিনি বলিলেন,—চিত্রগুপ্ত! তোমাকে আমি বারবার বলিয়াছি যে, পৃথিবীতে গিয়া মানুষ কি কাজ করিয়াছে, কি কাজ না করিয়াছে, তাহার আমি বিচার করি না। মানুষ কি খাইয়াছে, কি না খাইয়াছে, তাহার আমি বিচার করি। ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা করিলে এখন মানুষের পাপ হয় না; অশাস্ত্রীয় খাদ্য খাইলে মানুষের পাপ হয়। তবে শিবোক্ত তন্ত্র-শাস্ত্র মতে সংশোধন করিয়া খাইলে দোষ হয় না।"[১২]

"যম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিলাতি পানি? যাহা খুলিতে ফট্ করিয়া শব্দ হয়? যাহার জল বিজবিজ করে?"

সে উত্তর করিল,—"আজ্ঞা না।"

যম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য করিয়া বল, কোনরূপ অশাস্ত্রীয় খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলে কি না?"

সে ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল,—"আজ্ঞা একবার ভ্রমক্রমে একাদশীর দিন পুঁইশাক খাইয়া ফেলিয়াছিলাম।"

যমের সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"সর্বনাশ! করিয়াছ কি! একাদশীর দিন পুঁইশাক! একাদশীর দিন পুঁইশাক! ওরে! এই মুহূর্তে ইহাকে রৌরব নরকে নিক্ষেপ কর্। ইহার পূর্ব-পুরুষ, যাহারা স্বর্গে আছেন, তাহাদিগকেও সেই নরকে নিক্ষেপ কর। পরে ইহার বংশধরগণের চৌদ্দপুরুষ পর্যন্তও সেই নরকে যাইবে।"[১৩]

অথবা,

"যম বলিলেন,—"নেই-আঁকুড়ে শোন্, তোর বোন্ ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন আঙট পাতে ভাত খাইবার মানস করিয়াছিল। সেই পাপের জন্য আমি তার মাথায় ডাঙ্গস মারিতে হুকুম দিয়াছি।[১৪]

এ ধরনের মানুষের মিথ্যা ধর্মবোধ, পাপপুণ্যের ধারণাকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে কেদারনাথ ত্রৈলোক্যনাথকেই একান্ত আপন বলে গ্রহণ করেছেন।

টিকির আড়ালে ধর্মকে ধরে রাখার প্রয়াসকে ব্যঙ্গ করেছেন দুজনেই। কেদারনাথে দেখি,—

১২। ডমরু-চরিত—১৯২ পৃঃ।
১৩। ডমরু-চরিত—১৯৩-১৯৪ পৃঃ।
১৪। নয়নচাঁদের ব্যবসা—৫৯ পৃঃ।

"বেটা সট্‌কেছে' দেখেছ,—হারামজাদার টিকি দেখবার জো নেই,—বেইমান বেটা!"

বলিলাম—"ওর টিকি আছে নাকি?"

"কই—তা-তো দেখিনি! বেটা দেখায়ও না তো। জাত জন্ম খেলে দেখছি! পেলে বেটাকে দাঁড় করিয়ে রাখবেন তো;—দেখতে হয়েছে। ওরে বাপরে—ধর্ম নিয়ে কথা!—"[১৪ক]

ত্রৈলোক্যনাথেও এই টিকি-মাহাত্ম্য বেশ হাসির সঙ্গেই উপভোগ্য করে তোলা হয়েছে।

একজন বলিলেন,—উদ্ধবদাদার মদটুকু খাওয়া আছে, আবার টিকিও রাখা আছে।"

উদ্ধবদাদা উত্তর করিলেন,—"ওহে, তোমাদের টিকি না রাখিলে চলে, আমার চলে না। বংশজ ব্রাহ্মণ, বিয়ে হয় নাই। কাওরাণীর ভাত খাই। কেহ কিছু গোল তুলিলে অমনি টিকিটি খাড়া করিয়া ধরি। বলি, 'এই দেখ, বাবা, টিকি আছে।' অমনি সবাই চুপ, আর কথাটি কবার যো থাকে না।"...

রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন,—'বগলে এ কি! বটে! আর কপালে এ কি? এটি দেখিলে আর ওটি বুঝি দেখিলে না।' রামেশ্বর খুড়ো শুঁড়ির বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, পানাপুকুর হইতে একটু কাদা লইয়া কপালে একটি ফোঁটা কাটিয়াছিলেন। ছেলেকে সেই ফোঁটাটি দেখাইলেন। টিকি না রাখিয়া ফোঁটা কাটিলেও চলে, না চলে এমন নয়।"[১৫]

কেদারনাথের একস্থানে দেখি, "বাড়ী গেলেই যেন সবাই মিলে আমার ডলাইমলাই সুরু করে দেবে,—এমন তেল মাখাবে যমে ধরলে যেন পিছলে পড়ি।"[১৬] এই উক্তির পশ্চাতে যেন মিত্তিরজার যমদূতের সঙ্গে পেছলা-পিছলির দৃশ্যের ছায়া রয়েছে। সে দৃশ্যটি তোলা হ'ল।

"অন্ধকারে যমদূতেরা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিল যে, টিকি নাই। যমদূতেরা ফাঁপরে পড়িল। কি ধরিয়া আমাকে লইয়া যায়? অবশেষে চিন্তা করিয়া তাহারা আমার হাত ধরিল। গৌরচন্দ্রিকা-ঘৃতে আর বসন্তের রসে

১৪ক। কোষ্ঠির ফলাফল—৪১৬ পৃঃ।

১৫। বাঙ্গাল নিধিরাম—৮-৯ পৃঃ।

১৬। কোষ্ঠির ফলাফল—৬৮৩ পৃঃ।

আমার গা হড়-হড়ে হইয়াছিল। অনায়াসেই আমি হাতটি ছাড়াইয়া লইলাম। পা ধরিল, হড়াৎ করিয়া পা-টিও ছাড়াইয়া লইলাম। যেখানে ধরে আর আমি পিছলে গিয়া সরিয়া বসি। কখনও তক্তাপোষের উপর, কখনও তক্তাপোষের নীচে, কখনও ঘরের মাঝখানে, কখনও পাশে, এ কোণে, সে কোণে, যমদূতদিগের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে আমি এইরূপ পেছলা-পিছলি করিতে লাগিলাম।"[১৬ক]

ইংরাজী ভাষার প্রতি, সাহেব সাজার প্রতি, এবং সমাজে উচ্চশ্রেণীভুক্ত হওয়ার প্রতি তৎকালীন বাঙালীর যে উদগ্র কামনা তাকে ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গ করেছেন। এবং এ ধরনের ব্যঙ্গে কিছু আভাস কেদারনাথেও পাওয়া যায়। এগুলোকে একের ওপরে আর একজনের প্রভাব বলা চলে। পাশাপাশি উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

কেদারনাথে দেখি মাতুল পিনু পণ্ডিতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন,—

"গবেষণা নিয়েই থাকেন; সম্প্রতি মুসুর ডালে মগ্ন! বলেন—'মশাই, এম্-এতে থেমে থাকতে পারচি না—কোন কদর নেই। Ph. D. হতেই হবে, তাই মুসুর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। শ্বশুর বলেন, Suceess (সাফল্য) দেখলেই, বিলেতের ব্যয়-ভারও বহন করবেন।"

"পিনু ঠাকুরের Pronunciation (উচ্চারণ) কি সুস্পষ্ট। Accent after accent (গমকের পর গমক) যেন হাতুড়ি পিটছে,—স্যাংস্কৃটগুলো যেন ইংরেজি হয়ে বেরুচ্ছে!"[১৭]

এ ধরনের পণ্ডিতের আসলে শাস্ত্রজ্ঞান শিক্ষা, দীক্ষা অতি অল্পই। তাই তো সে জ্যান্ত মানুষের পিণ্ড দান করতে পিছিয়ে পড়ে না। ঠিক যেন ত্রৈলোক্যনাথের তনু রায়ের মতই। যখন যা সুবিধা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তাই করে। অন্যায় ন্যায় বলে চালিয়ে দিতে এতটুকু এদের বিবেকে বাঁধে না।

"তনু রায় বলিলেন,—"কন্যাদান করিয়া বংশজ কিঞ্চিৎ সম্মান গ্রহণ করিবে। শাস্ত্রে ইহার বিধি আছে।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ শাস্ত্রে আছে? এরূপ শুল্কগ্রহণ করা তো ধর্মশাস্ত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ।"

১৬ক। ময়নচাঁদের ব্যবসা—৫৭ পৃঃ।

১৭। কোষ্ঠির ফলাফল—২৯৮-২৯৯ পৃঃ।

গোবর্ধন চুপি চুপি বলিলেন,—"বল না? মহাভারতে আছে!"

তনু রায় তাহা শুনিতে পাইলেন না। ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন—"দাতা কর্ণে আছে।"

এই কথা শুনিয়া নিরঞ্জন একটু হাসিলেন। নিরঞ্জনের হাসি দেখিয়া তনু রায়ের রাগ হইল।

নিরঞ্জন বলিলেন,—"রায় মহাশয়। কন্যার বিবাহ দিয়া টাকা গ্রহণ করা মহাপাপ। পাপ করিতে ইচ্ছা হয়, করুন; কিন্তু শাস্ত্রের দোষ দিবেন না, শাস্ত্রকে কলঙ্কিত করিবেন না। শাস্ত্র আপনি জানেন না, শাস্ত্র আপনি পড়েন নাই।"

তনু রায় আর রাগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। নিরঞ্জনের প্রতি নানা কটু কথা প্রয়োগ করিয়া অবশেষে বলিলেন, "আমি শাস্ত্র পড়ি নাই? ভাল। কিসের জন্য আমি পরের শাস্ত্র পড়িব? যদি মনে করি, তো আমি নিজে কত শাস্ত্র করিতে পারি। যে নিজে শাস্ত্র করিতে পারে, সে পরের শাস্ত্র কেন পড়িবে?"ক

ইংরাজী ভাষার প্রতি অতি মোহ, প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতী হ'তে অপর একটি উদাহরণ সংগৃহীত হ'ল।

"আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—কোন্‌দিক্ দিয়া যাইলে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতে পারা যায়?" ব্যাঙ বলিলেন,—"হিশ্‌ ফিশ্‌ ড্যাম।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—ব্যাঙ মহাশয়। আমি দেখিতেছি,—আপনি ইংরেজী কথা কহিতেছেন। আমি ইংরেজী পড়ি নাই, আপনি কি বলিতেছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, অনুগ্রহ করিয়া যদি বাঙ্গালা করিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারি।"

ব্যাঙ এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, কেহ কোথাও নাই। কারণ, লোকে যদি শুনে যে, তিনি বাঙ্গালা কথা কহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি যাইবে, সকলে তাঁহাকে "নেটিভ" মনে করিবে। যখন দেখিলেন,—কেহ কোথাও নাই, তখন বাঙ্গালা কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল।"খ ....

ক। কঙ্কাবতী—৭৩ পৃঃ

খ। কঙ্কাবতী—১২৯।

পৈতে পরে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে কেদারনাথ লিখেছেন,—

"আমাদের সে-সময়ের সমাজ মনে পড়ে ত'—তার উপর পৈতে পরার পাপ; তাই একটু ইতস্তত ছিল। এখন হাড়ি-মুচিতে পৈতে প'রে সে বালাই ঘুচিয়ে দিয়েছে। গেল বছর দেখি গণ্ডা-কণ্ডা গ্রাজুয়েট্,—কেউ ভট্টাচার্য্য, কেউ মুখুজ্যে,—আবগারী-তলায় আর্জির অঞ্জলি হাতে উমেদার, ঘাসের উপর গড়গড়া বোসে বিড়ি খাচ্চে!"গ

এইভাবে পৈতে পরে জাতে ওঠার কথা ত্রৈলোক্যনাথেও পাই,—

"পৃথিবীতে তোমার বংশধর কায়স্থগণ কি করিতেছে, একবার চাহিয়া দেখ। উড়ে গয়লার মত এক এক গাছা সূতা অনেকে গলায় পরিতেছে। ব্রাহ্মণকে তাহারা আর প্রণাম করে না। ইংরাজী পড়িয়া তাহাদের মেজাজ আগুন হইয়া গিয়াছে। তাই বলি যে, চিত্রগুপ্ত তুমিও ইংরাজী পড়। ইংরাজী পড়িয়া তোমার হেডটি গরম কর। হেডটি গরম করিয়া তুমিও গলায় দড়ি দাও। মোটা দড়ি নয়। বুঝিয়াছ তো? গলায় দড়ি দিয়া 'চিত্রবর্মা' নাম গ্রহণ কর।' ঘ

ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় আমরা এক ধরনের কিম্ভূত হাস্যরসের সন্ধান পাই। লৌকিক-অলৌকিকের মিশ্রণে এই ধরনের হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। কেদারনাথ অবশ্য লৌকিক-অলৌকিকের মিশ্রণ ঘটান নি। কিন্তু কখন কখন সম্ভব-অসম্ভবের খেয়ালী হাওয়ায় উড়ে চলেছেন। সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ত্রৈলোক্যনাথও রাখেন নি। ফলে ত্রৈলোক্যনাথের মতই কেদারনাথেও কিম্ভূত রস সৃষ্টি হয়েছে। ভূতপ্রেত কেদারনাথে নেই। কিন্তু এখানে দু'একজন মানুষেরই এমন চেহারা দেখি যাকে ভূত বললে অত্যুক্তি হয় না'।

"চেহারা যতই দেখতে লাগলুম, ততই মন ফিরতে লাগলো, শেষ দাঁড়ালেন —'খাঁটি জিনিষ'। কারণ এ ত সাধারণ মানুষের চেহারা নয়, একদম নির্লোম মাংসপিণ্ড। চুল, চোখের পাতা, ভ্রূ ঝ'রে গেছে বা পচের মুখে দিয়েছেন। দুই কসে মাত্র দু'টি বহির্মুখী গজদন্ত। প্রথম দর্শনে চারুপাঠের সেই সুশিল্পীর আঁকা সিন্ধুঘোটকই মনে পড়েছিল। বস্তুতঃ তা নয়, **mammoth** (মান্ধাতার)

গ। কোষ্ঠির ফলাফল—৮৫।

ঘ। ডমরু চরিত—১৯৩।

যুগের মানুষ হবেন। কৃপা ক'রে আমাদের জন্যে এখনও যুঝছেন; দেহ দোরস্ত রেখেছেন। মনে মনে ক্ষমা চেয়ে, কৃতার্থ হয়ে ফিরলুম।

ফেরবার পথে দেখি—বাবুদের একটি ছেলের তড়কার মত হয়েছে, দাসী সামলাতে পাচ্ছে না। আমাকে দেখে বললে,—ঐ কি সাধুর মূর্তি গা! তা হ'লে আমাদের নফর সামন্ত কি দোষ করেছে? তাকে দেখলেও ত বড় বড় বীর হনুমান্ পালায়!—এখন ছেলে বাঁচলে হয়। এরা আঙুর খায়—আপেল-খেগো গোপাল, এদের কি বনমানুষ দেখাতে আনে!'...... . ...

হাবাতে কপাল কি না,—রাত্রে স্বপ্নে দর্শন পেয়েও—মওকা মাটি হয়ে গেল! আঁৎকে চেঁচিয়ে উঠলুম, গা ছমছম করতে লাগলো।"

আচার্য্য বললেন—"দুঃখু করবেন না, পার্থই পারেন নি,—মুখ শুকিয়ে আম্‌সি, এক জালা জলের তেষ্টা। সে তবু দিনের বেলায়। যা শুনছি, অন্য কেউ হ'লে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। ভাববেন না—আপনার হবে। বলুন—"

—"দ্বিতীয় দিন ঘি নিয়ে যেতেই প্রসন্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কুছ দেখা'?"

আচার্য্য বললেন,—"উনি নিজের প্রভাব জানেন ত।"[১৭] এ ধরনের মানুষরূপে যেমন স্বভাবেও তেমনি ভয়ঙ্কর।

আর একটি রূপবর্ণনা। এ বর্ণনাটিও কেদারনাথ হইতে গৃহীত। এ বর্ণনাটি যেমন ভয়ঙ্কর তেমনিই হাস্যকর।

"পাগড়িটি খুলিয়া ফেলায়, এতক্ষণে শব্দভেদী পরিচয় শেষ হইল—মানুষটিকে চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ পাইলাম। বয়স পঞ্চাশের উপকূলে উপস্থিত; বেঁটে গড়ন,—ময়রার দোকানের মালিকের মত বেশ গোল্‌গাল। চক্ষু দুইটি আলুবক্‌রার বিচি পরিমাণ, অথবা চতুর্দিকের মাংসের চাপে ঐরূপ দেখাইতেছিল, মাথাটি বড় কিন্তু কেশ বিরল; মধ্যে টাক্ থাকায় অনেকটা ফাঁক, কাল চুল কয়গাছি সাদার আওতায় পড়িয়া গিয়াছে। সুপুষ্ট দুই গালের গর্ত্তে পড়িয়া নাসিকাটি কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে। যে কারণেই হোউক্ গোঁফ্ জোড়াটি ত্যাগ করা হইয়াছে; কিন্তু তন্নিয়ে দন্তগুলি সবই বজায় আছে, এবং তাহারা জীবন্ত ছাগেরও ভয়ের কারণ বলিয়াই অনুমান করি। ইনি আয়েসা বা তিলোত্তমা নহেন যে, রূপ বর্ণনার আবশ্যকতা

১৭। ভাদুড়ী মশাই—৭৫-৭৬ পৃঃ।

ছিল ; কিন্তু আমার বহুক্ষণের আগ্রহটা যে-ভাবে মিটিল, তাহাও যে একক উপভোগ করার মত নহে!"[১৮]

উপরের এই বর্ণনার সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ-সৃষ্ট চরিত্রের রূপ বর্ণনার তুলনা করা যেতে পারে।

"বরের পরিধান মূলবান্ চেলি, গায়ে ফুলকাটা কামিজ, গলায় দীর্ঘ সোনার চেন, হাতে পাথর বসান পানিপথের বাঁতি। ফল কথা, বর-সজ্জার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। যুবা বর হইলে এরূপ সজ্জা করে কি না, সন্দেহ। কিন্তু সজ্জা হইলে কি হয়, বরের রূপ দেখিয়া আমার হরিভক্তি উড়িয়া গেল। বয়স ষাটি বৎসরের কম নহে, কৃষ্ণকায়, মুখে একটিও দাঁত নাই, মাথায় একগাছি কাল চুল নাই। অতি কদাকার বৃদ্ধ। তাহার পর, সেই ফোক্‌লা মাঢ়ি বাহির করিয়া বিবাহের আনন্দে যখন তিনি রসিকতা করিয়া হাস্য করিতেছিলেন তখন এরূপ কিম্ভূত কদাকার রূপ বাহির হইতেছিল যে, সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার দুই গালে দুই থাবড়া মারিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছিল।"[১৯]

উপরে যে সব রূপ বর্ণনা করা হ'ল তা'তে নিঃসন্দেহে কিম্ভূত রস সৃষ্টি হয়েছে। তা'ছাড়া কেদারনাথের সাধুবাবাটির রূপের সংগে, এবং স্বরূপের সংগে ত্রৈলোক্যনাথ-সৃষ্ট সাধুবাবাগুলির মিল আছে। এরা রূপে যেমন স্বভাবে তেমনি অদ্ভুত, কখনো বা ভয়ঙ্কর। কেদারনাথের সাধুবাবাটি অন্যকে ভগবৎ দর্শন ঘটায় অদ্ভুতভাবে। কারও চোখে এমন মোক্ষম স্পর্শ করে যে তাকে হাসপাতালে ছুটতে হয়, আর কেউ বা চোখে লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি নানা রং এর জ্যোতি দর্শন করে, আর কখনও বা গরম জলের সেক্ দিতে থাকে। সুতরাং একে মানুষ না বলে ভূত গোত্রীয় করায় ক্ষতি নেই। এদের দিয়ে কেদারনাথ যে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তা ত্রৈলোক্যনাথ-সৃষ্ট কিম্ভূত হাস্যরসের অনুরূপ। আবার এই হাস্যরসের সন্ধান পাই ভাদুড়ী মশাই এর এ' মোটা বেঢপ দেহটাকে নিয়ে গিয়ে সাধুবাবার পায়ে প্রণাম করানোর দৃশ্যের মধ্যে। নবনী নূতন ইঞ্জিনিয়ার ; তাই সে অনেক ভেবে একটি যন্ত্রের উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করল, যার সাহায্যে অতি সহজে ভাদুড়ী মশাই প্রণামের ব্যাপারটি সেরে

১৮। কোষ্ঠির ফলাফল—২০ পৃঃ।

১৯। ফোক্‌লা দিগম্বর—২৪।

নিতে পারবেন। এ ধরনের চিত্র অংকনের মধ্যে দিয়ে কেদারনাথ কিম্ভূত হাস্যরস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তা'ছাড়া, ভাদুড়ী মশাই, ও জয়হরির চেহারা পরিকল্পনাতেও কিম্ভূত হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে।

রূপ বর্ণনার দ্বারা এ ধরনের কিম্ভূত হাস্যরস সৃষ্টি না করেও, কখন কখন শুধু যেন হাসানোর জন্যেই হাসাতে চেয়েছেন কেদারনাথ। অবশ্য ত্রৈলোক্যনাথে এ ধরনের রূপবর্ণনা অনেক আছে। এবং তা অতি সুন্দরভাবে সার্থকতা লাভ করেছে। কেদারনাথের 'ভাদুড়ী মশাই' এর সপ্তর্ষিমণ্ডলের বিভিন্ন চরিত্র এ প্রসংগে স্মরণীয়। উদাহরণ স্বরূপ কিংশুক চরিত্রটি তুলে ধরতে পারি।—

"বড়লোকের ছেলে। কোষ্ঠিতে লেখা ছিল—যৌবনের পূর্বেই পূর্ণ ভাগ্যোদয় হবে, তা হয়েছে। বাপ মারা গেছেন। কোম্পানীর কাগজের সুদে আর বাড়ীভাড়ায় এখন তার বাৎসরিক আয় হাজার বাটেক। কার্তিকের মত চেহারা। হাসিটি কিন্তু ফিকে। B.Sc. র (বি, এস, সির) মাঝামাঝি চৌদ্দ বৎসরের বাগ দত্তা কস্তুরিকা মারা যাওয়ায় মোচ্‌কে গেছেন। গবাক্ষ-পথে সন্ধ্যার আবহাওয়ায় দু'দিন দেখেছিলেন, আর দু'কিস্তিতে সাড়ে সাত লাইন (নিক্ষিপ্ত) পত্রপ্রাপ্তি। এইতেই তাঁকে বৈরাগ্যের পাকে চড়িয়ে দিয়ে কস্তুরিকা চলে গেছেন। চুপ্‌চাপ্‌ থাকেন, আর বৈরাগ্য মুখস্থ করেন। তবে থাকেন খুব ফিটফাট্‌। বৈরাগ্যের বেগ যেদিন প্রবল হয়, সেদিন শোক সঙ্গীত লিখে ফেলেন। একশো হলেই 'শোক-শতক' নামে প্রকাশ করবেন।"[২০]

এর পাশাপাশি ডমরুধর হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে,—

"আমার গায়ের বর্ণটি কৃষ্ণঠাকুরের চেয়ে কালো। বাঘ মিথ্যা কথা বলে নাই—শরীরের ভিতর কেবল খানকতক হাড়। মাথার মাঝখানে এমন চক্‌চকে টাক আর কার আছে? প্রকাণ্ড টাক। টাকের চারিদিকে পাকা চুল, মুখের দুই পাশে সাদা ফেকো। দাঁত একটিও নাই। তথাপি আমার কিরূপ একটি শ্রীছাঁদ আছে, কিরূপ একটা লাবণ্য আছে যে, তাতে রাহুরও ভুল হয়। আর মাগীগুলোও আমার গায়ে যেন ঢলিয়া পড়ে। অবাক হইয়া ধাঙ্গড় মাগী আমার টাক পানে চায়, আর মুচকে মুচকে হাসে।"[২১]

২০। ভাদুড়ী মশায়—৪৩।

২১। ডমরু-চরিত—২৪৩।

ডমরুধর নিজের কথা নিজেই বলে, আর কিংশুকের কথা অন্যে বলিয়া দেয়। নিজের মুখে নিজের প্রশংসা অধিকতর হাস্যকর হবেই। তবুও দু'জনের মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টিতে কোথায় যেন মিল রয়ে গেছে। পুনরায় কিংশুক চরিত্রকে নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথের মদন ঘোষের তুলনা করতে পারি। কিংশুকের জীবনে বৈরাগ্য এসেছে। এ বৈরাগ্য এনেছে চোদ্দ বছরের বাগ্‌দত্তা কস্তুরিকা। যাকে সন্ধ্যার আবছায়ায় গবাক্ষপথে মাত্র দু'দিন দেখা গেছে, আর দু'কিস্তিতে সাড়ে সাত লাইনের নিক্ষিপ্ত পত্র প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে। এতেই কিংশুক প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খেতে আরম্ভ করেছিলেন। মদন ঘোষ পত্র পেয়েছে মাত্র চার লাইনের, সেই চার লাইনের মধ্যে মাত্র একটি মাত্র লাইনই তার প্রেমের পথে আলো হয়ে জ্বলে উঠেছে। "আমাদের এই উপকার করিবেন।" মদন ঘোষের নিজের মুখে শুনলেই তার আভাস পেতে পারি।

"আমাদের এই উপকার করিবেন।" ইহার অর্থ কি? পাল মহাশয়ের কন্যা দ্বারের ফাঁক দিয়া আমাকে দেখিয়া থাকিবে। আমার রূপ দেখিয়া সে মোহিত হইয়াছে, আমার উপর সে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। এ' চারিটি কথার ইহা ভিন্ন অন্য অর্থ হইতে পারে না। উপকার। আমাকে ভালবাসে, আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত সে লালায়িত হইয়াছে। সামান্য ঐ' "উপকার" কথাটির ভিতর যে এত অর্থ নিহিত অন্যে তাহা বুঝিবে না। কিন্তু আমাদের দুইজনের মন-প্রাণ এক হইয়া গিয়াছে, সেজন্য তার মনের ভাব আমি অনায়াসেই বুঝিতে পারি।

পুলকে পুলকিত হইয়া কাগজখানি আমি একবার মাথায় রাখিলাম। তাহার অর্থ এই যে "হে সুন্দরি। তোমার আজ্ঞা আমি শিরোধার্য্য করিলাম।" তারপর তক্তপোষের উপর শয়ন করিয়া কাগজখানি আমি বুকের উপর রাখিলাম। তাহার অর্থ যে, "হে বরাননে। তোমার পত্রস্পর্শে আমার উত্তাপিত হৃৎপিণ্ড সুশীতল হইল।"

সাধে কি পিতা-মাতা আমার নাম মদন রাখিয়াছেন। মদন না হইলে এত ভাবুক আর কেহ হইতে পারে না।"[২২] কিংশুকও এই ধরনের একটা আত্ম-প্রসন্নতা লাভ করেছিল। প্রথম প্রেমিকার অকাল মৃত্যুতে যে বৈরাগ্য,

২২। মুক্তামালা—৩৪৫-৩৪৬।

তার রং কিছু ফিকে হয়ে এসেছিল ইরাণীর সংস্পর্শে এসে। ইরাণীর মামা-বাবুর সংগে তার প্রথম দিনের সাক্ষাৎকার থেকে যখন সে জানতে পারলো যে মামাবাবুর উড়িয়া ভাষায় কথোপকথন এবং পকেটে করে চিনি নিয়ে আসার পেছনে চঞ্চল ইরাণীর দুষ্টুমি লুকিয়ে রয়েছে তখন কিংশুক যেন কোন মধুময় সুখের সন্ধান পেলো। মনে করলো ইরাণী নিশ্চয় তাকে চায়, তাকে ভালবাসে। "কিংশুকের মধ্যে তখন এমন একটা আনন্দ তাল পাকিয়ে মাথা ভাঙ্গা ঢেউয়ের মত তোল্‌পাড় আরম্ভ ক'রে দিয়েছে যে সে আর থাকতে পারলে না, চট্ করে পাশের ঘরে উঠে গেল।"[২৩]

ডমরুধর চরিত্রের সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্যে যেন জয়হরি চরিত্রের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ডমরুধরের সাদাসাদিভাব, সহজ সরল গ্রাম্য সরলতার সঙ্গে জয়হরি চরিত্রের মিল খুঁজে পেতে আমাদের এতটুকু কষ্ট হয় না। বয়সের দিক থেকে অবশ্য দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাই বোধ হয় স্বভাব ধর্মেও কিছু পার্থক্য। জয়হরি চরিত্রের হাস্যকর অসঙ্গতি হচ্ছে তার ঔদারিকতা, আর ডমরুধর চরিত্রে তার অতৃপ্ত ভোগলালসা। ডমরুধর যে কোন পরিস্থিতিতে পড়ুক না কেন তার কামনা-বাসনার উর্ধ্বে সে কিছুতেই উঠতে পারে না,—তিনবার সে বিয়ে করেছে তবু পররমণীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি সে ফেরাতে পারে না। এজন্যে তাকে নানা পরিস্থিতির চাপে পড়ে নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। তবু তার অহংকারের শেষ নেই। জয়হরিও অনুরূপ। খাওয়ার কথা শুনলে সে আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না। গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই একইভাবে তাকে দেখি। এজন্য তাকেও নানা অবস্থায় নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অবশ্য যখনই যে অবস্থাতেই পড়ুক না কেন, সে কিছুতেই ঘাবড়িয়ে যায় না। ডমরুধরের সে যেন সহোদর ভাই। মান, সম্মান, লজ্জা, অপমানের কোন প্রশ্নই এদের সামনে ঘেঁসতে পারে না। বিপদে তারা বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে না। লোভের জন্যে জয়হরির জীবনে চূড়ান্ত ও মর্মান্তিক পরিণতি ঘনিয়ে এসেছে। নির্বিকারভাবে তাকে সে গ্রহণ করেছে। জয়হরির এই রকম একটি লাঞ্ছিত অবস্থা—

"মানসিক বিকারের আকস্মিক উত্তেজনায় ঘটিলেও, জয়হরির এই ত্যাগ

২৩। ভাদুড়ি মশায়—১৯৮।

স্বীকারটি যে কত বড় ছিল তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। রাজ্যত্যাগ, বিত্তত্যাগ, গৃহত্যাগ প্রভৃতির পশ্চাতে একটি পরমার্থাদি লাভের প্রতি লোকের লক্ষ্য থাকে। দধীচি হাড় ছাড়িয়াছিলেন,—জয়হরির মাস-ছাড়াটা তদপেক্ষা ছোট ত্যাগ ছিল না,…… ……

আমাদের বাসাটা দেওঘর স্টেশনের নিকটেই ছিল। "লরী" আসিয়া প্রত্যহই সেখানে দাঁড়াইত ও যাত্রী লইয়া ডুমকা পর্যন্ত যাতায়াত করিত।

সত্বর বীমার সীমা এড়াইয়া বাসায় পৌছিবার আশায় জয়হরি লরী ধরিয়াছিল। একটু সামলাইয়া চাহিয়া দেখে চারিদিকে জনশূন্য প্রান্তর। যখন মন্দির চূড়াও নজরে পড়িল না তখন সে চঞ্চল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা কোথায় চলেছি?" একজন মাড়ওয়ারী কালেক্টর বলিয়া উঠিল, "ডুমকা,—তুম্‌ কাঁহা যাওগে।"

"দেওঘর ইষ্টিশান।"

"পাগল হো। সাড়ে চার মিল মুফৎ আয়ে। দেও—রূপেয়া নিকালো।"

তাহার কথা শেষ না হইতেই দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য জয়হরি লাফ মারিল। মাংস ত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগে সে বোধহয় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। তাহারা গাড়ী না থামাইয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।……

রাস্তার ধারে একপাল গরু চরিতেছিল; সে তাহারই একটির উপর গিয়া পড়ে। পৃষ্ঠোপরি এই আড়াই মুণি জীবটির সবেগ পতনে, আহত ও ভীত গাভীটি সলম্ফ বিকট চিৎকারে রাস্তা হইতে মাঠে পড়িয়া উর্ধ্বশ্বাসে নিরুদ্দেশ রওনা হল। গাভীটির সশঙ্ক লম্ফনের শূন্যপথেই জয়হরির সবেগ উৎক্ষিপ্ত পতন ও দেড়গজ ঘর্ষণ এবং মাঠের মধ্যেই বীরশয্যা গ্রহণ—একই সময়ে সমাধা হয়। মরণের সহিত পূর্বপরিচয় না থাকায় বিমূঢ় জয়হরি ভাবিয়াছিল—সে মরিয়া গিয়াছে। চেতনায় যা একটু আভাসমাত্র ছিল তাহার সাহায্যে সে বহুক্ষণ ঠিক করিতেই পারে নাই—সে আছে কি নাই—এটা তার পারলৌকিক অবস্থা কিনা। তাহার বুদ্ধি ও স্মৃতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অনেক এলো মেলো চিন্তার পর হঠাৎ সে নিজের গায়ে চিম্‌টি কাটিয়া দেখিল—লাগে। তখন—"ওরে বাবারে। পোড়ালে সইতে পারব না।" বলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসে ও সভয়ে চারিদিকে চাহিতে থাকে। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া লরী যে পথে আসিয়াছিল সেই পথ ধরে। বেদনা কি আঘাতের প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল না।

অর্ধাধিক পথ অতিক্রম করিবার পর, পথের ধারে একটি কূয়ায় একটি সাঁওতাল স্ত্রীলোককে জল তুলিতে দেখিয়া সে দীনের মত গিয়া দাঁড়ায়। তাহার অবস্থাই ছিল তাহার আবেদনের Original Copy—বা অলিখিত আর্জি। স্ত্রীলোকটি জল তুলিয়া তাহার সম্মুখে ধরে ও তাহাকে হাত পা ধুইয়া ফেলিতে বলে। · ···রমণীর এই প্রস্তাবের ভিতরকার স্নেহটুকু সহজেই তাহার প্রাণে পৌঁছিল। সে হাত পা ধুইতে গিয়া তাড়াতাড়ি চোখের জলটাও ধুইল।·· ·· বুঝিল এখন তাহার সর্বপ্রধান আবশ্তক—পেটে কিছু দেওয়া,—নচেৎ বাসায় পৌঁছিতে পারিবে না,—পথেই গা ঢালিতে হইবে। তাই সে মন্দির চূড়ায় লক্ষ্য রাখিয়া চূড়ার (চিঁড়ের) আড্ডায় গিয়া পড়ে।”[২৪]

এই দৃশ্যের সঙ্গে ডমরুধরের জীবনের লাঞ্ছনায় কোথায় যেন করুণ অথচ হাস্যরসাত্মক সাদৃশ্য রয়েছে। ডমরুধরের ধাঙ্গড়ানীর ঘরে আশ্রয় গ্রহণ, প্রহার, বস্ত্রশূন্য হয়ে প্রাণপণ দৌড়ানো, লাল ঘাঘরা পরিধান, দুর্লভীর মেটে ঘরে আশ্রয় গ্রহণ, শেষ পর্যন্ত এলোকেশীর ও দুর্লভীর হাতে মুড়ো খেঙরার প্রহারে ক্ষতবিক্ষত অবস্থা গ্রহণ ও দেবীর নিকট হইতে কৃপাপ্রাপ্তির সঙ্গে লেখকের সহানুভূতি প্রাপ্ত আহত, অশ্রুসজল জয়হরি চরিত্রের কি অপূর্ব মিল রয়েছে। মনে হয় একই স্রষ্টার হাতেই বুঝি দু'জনেরই সৃষ্টি। তাই এত মিল। এ মিলকে প্রভাব বললেও সত্যের অপলাপ হবে না।

সবশেষে ত্রৈলোক্যেনাথ ও কেদারনাথের শিল্পী আত্মার কিছু ইঙ্গিত দিয়ে এ প্রসঙ্গে ছেদ টানা যেতে পারে। একে প্রভাব বলা যায় না। এ হ'ল দুই ব্যঙ্গ-শিল্পীর অন্তর ধর্মের একাত্মতা। দুইজনেই মানবদরদী। তাই মানুষের কল্যাণকেই তাঁরা চেয়েছেন। তাই যেখানে যেখানে মানবজীবনের হাস্যাত্মক অসঙ্গতি আছে সেগুলিকে সংশোধন করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রতিটি মানুষের পরেই রয়েছে তাঁদের অকৃপণ ভালবাসা। মানুষের প্রতি ভালবাসাই তাঁদের সৃষ্টিকে জ্বালাময়ী, তীব্র, তীক্ষ্ণ করে তোলেনি। তাঁদের ব্যঙ্গ নিষ্ঠুর নয়, পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের হাতের বেত নয়। তবে পার্থক্য কিছু যে নেই এমন নয়। দরিদ্র মধ্যবিত্তের প্রত্যেকের জন্যে কেদারনাথের কান্নার অন্ত নেই। অন্তপুরচারিণী মহিলারা,—যাঁরা নিজের সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্বিকারে ত্যাগ করে' কেউ বা অম্বলের রুগী, কেউ বা জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়েছেন, তাঁদের

২৪। কোষ্ঠির ফলাফল—২৬৪-২৬৬।

জন্মে, এমন কি নিঃসন্তান মাতঙ্গিনীর ব্যর্থতা—সবই তাঁর দরদী প্রাণে আঘাত করে। মানব ও আজিজের বন্ধুত্ব, সে বন্ধুত্বের নিবিড়তর বন্ধন এবং তার প্রতি সমাজের উপেক্ষার পরিহাস লেখককে একেবারে অশ্রুভারাক্রান্ত করে তোলে —একটুকু বলতে গিয়ে আর কিছুতেই থামতে পারেন না। এইরকম সব-কিছুতে লেখক কাঁদেন। সেই কান্নাকে যেন তিনি চেপে রাখতে পারেন না। হাসতে গিয়েও কেঁদে ভাসান। ত্রৈলোক্যনাথও মানবদরদী। মানুষের বা জাতির ভুলভ্রান্তি, আশা-হতাশা তাঁকেও কাঁদায়, তবে কোথাও তা' অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে না। বাইরে তাঁর হাসি, অন্তরে তাঁর কান্না। কেদারনাথ নিঃসন্দেহে একজন উঁচু শ্রেণীর হাস্যরসিক, কিন্তু কোথাও কোথাও তাঁর হাস্যরস শুধু হাস্যরস থাকেনি, হাসি ও কান্নার কড়াপাকে পড়ে কারুণ্যই প্রধান হয়ে পড়েছে, এক মিশ্ররস সৃষ্টি হয়েছে। তাই মনোধর্মে একই প্রকৃতির হয়েও একজনের প্রভাবে আর একজন প্রভাবিত হয়েও হাস্যরস স্রষ্টারূপে ত্রৈলোক্যনাথই অধিকতর সার্থক, ব্যঙ্গ-সাহিত্যিকরূপে এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

হাস্যরস স্রষ্টারূপে কেদারনাথের উপরে ত্রৈলোক্যনাথের প্রভাব ও কেদারনাথ অপেক্ষা ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করবার পরে, এ প্রসঙ্গে আমরা এ যুগের অপর আর একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে গ্রহণ করতে পারি। ঔপন্যাসিক হিসাবে, বিশেষ করে ছোট গল্পকার হিসাবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যে অতি ব্যাপক পরিচয়। তাঁর রচিত উপন্যাসের অথবা ছোট গল্পের স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হাস্যরস। এই হাস্যরসের সন্ধান প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রচনায় স্থানে স্থানে স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই স্বল্প পরিমাণ হাস্যরসের মধ্যে আবার কোথাও কোথাও ত্রৈলোক্যনাথের প্রভাবকে লক্ষ্য করি। যদিও এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, প্রকৃতির জগতের মত সাহিত্যের জগতেও কোনকিছু অকস্মাৎ ঘটে না, একজনের প্রভাব প্রত্যক্ষে অথবা অপ্রত্যক্ষে অপরজনের উপর পড়ে। এমনিভাবেই হয়তো ত্রৈলোক্যনাথের প্রভাব প্রভাতকুমারের উপরে এসে পড়েছে।

প্রথমেই আমাদের মনে রাখা দরকার যে প্রভাতকুমার মূলত ব্যঙ্গ-শিল্পী নন। তিনি গল্পকার। তাঁর গল্প বলার রীতিটি সাবলীল। তবে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও কোথাও কিছু ব্যঙ্গ আছে। ঘটনাবহুল গল্প বলতে

গিয়ে কোথাও তিনি থেমে যান না, স্বাভাবিক গতিতে গল্পধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। Wit-এর চাকচিক্য বা অলঙ্করণের কোন চেষ্টা নেই। সহজ সরল রচনাভঙ্গী। সুতরাং তাঁর রচনার উদ্ধৃতি তুলে সকল স্থানে হাস্যরস নির্ণয়, অথবা ত্রৈলোক্যনাথের প্রভাব দেখানো সম্ভব নয়। তবে চিন্তাধারার দিক থেকে, ঘটনা উপস্থাপনার দিক থেকে, কোথাও বা চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়ে দেখলে প্রভাতকুমারের গল্পে যে ব্যঙ্গ ধরা পড়ে, তার সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গের একটি অস্পষ্ট মিল চোখে পড়ে।

প্রভাতকুমারের হাস্যরসের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই দুই একটি গল্পের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে, যেমন 'বলবান জামাতা', 'মাষ্টার মশায়', 'খুড়া মহাশয়', 'প্রতিজ্ঞাপূরণ' ইত্যাদি গল্প। এ গল্পগুলির মধ্যে যে সহজ হাস্যধারার ধীর গতিকে পাই তা' বেশ উপভোগ্য। তবে 'বলবান জামাতার' আগাগোড়ায় তিনি হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, কথনও চেহারার পরিবর্তন করে, কখনো ঘটনার ভ্রান্তি ঘটিয়ে, তাতে কতকটা জোর করেই হাস্যরসের সৃষ্টি করতে চেয়েছেন মনে হয়। যা শুধুই হাসায়, হাসির শেষে এতটুকু ভাবায় না, তাকে উচ্চাঙ্গের হাস্যরস বলা যায় না। এদিক থেকে বলবান জামাতা অতি স্থূল, কিছুটা বা শিশুসুলভ। কিন্তু এদিক থেকে "রসময়ীর রসিকতা" গল্পটি যেন সার্থক ব্যতিক্রম। এ গল্পে সত্যকার হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে, যদিও শেষের দিকে গল্পটি তেমনভাবে জমে উঠতে পারেনি। আমাদের যেন কিছুটা বিস্ময় জাগে, রসময়ীর রসিকতার মত প্রথমশ্রেণীর সার্থক হাস্য-রসাত্মক গল্প কি ভাবে হঠাৎ সৃষ্টি হয়ে উঠলো। তা' ছাড়া, আমরা প্রভাতকুমারের শিল্পী মেজাজটিকে জানি, তিনি ভাল করে গল্প বলতেই চেয়েছেন, ব্যঙ্গ করতে চাননি। অজস্র গল্প লিখে গেলেও, অজস্র হাস্যরস সৃষ্টি করতে চাননি। তবু বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠলে দেখতে পাই এ ধরনের হাস্যরস সৃষ্টির উপরে লেখকের জ্ঞাতে হোক, অজ্ঞাতে হোক, ত্রৈলোক্যনাথের প্রভাব এসে পড়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথ "ফোক্লা দিগম্বর" নামে যে সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন তারই একটি অংশ এখানে স্মরণীয়। ঐ উপন্যাসের চতুর্থ ভাগের চতুর্থ পরিচ্ছেদ। গলা ভাঙ্গা দিগম্বরী সরোষে জনতা ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছেন। প্রথমেই তাঁর রূপ বর্ণনা। তাঁর রূপ, আলাপ ব্যবহার, কথাবার্তা ইত্যাদি দেখে প্রভাতকুমারের রসময়ীর কথা মনে

পড়ে যায়। দিগম্বরীও রণরঙ্গিণী, রসময়ীও রণরঙ্গিণী। গল্পের প্রথমেই আছে,—

"ক্ষেত্রমোহনবাবুর অষ্টাদশবর্ষব্যাপী দাম্পত্য জীবন স্ত্রীর সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি করিতে করিতেই কাটিয়াছে। এমন রণরঙ্গিণী স্ত্রী বঙ্গদেশে প্রায়ই দেখা যায় না।"[১]

এই ধরনের স্ত্রীর দাপটে যাঁরা পড়েছেন তাঁদের সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। এই স্ত্রীর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ারও কোন উপায় নেই। মনে মনে নূতন বিবাহের স্বপ্ন রচনা করে চললেও সে স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে ভয় পান। তবে যদি সুযোগ পান, তাহলে সে সুযোগের অপব্যয় করেন না। তাই বোধহয় ঝগড়া-অন্তে রসময়ীর পিত্রালয়ে গমনের অব্যবহিত পরেই ক্ষেত্রমোহন নূতন বিবাহের আয়োজন করেছেন। আর দিগম্বরও পাঞ্জাবে বদলী হয়ে, স্ত্রীকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েই বিবাহের আসরে উপস্থিত হয়েছেন। ক্ষেত্রমোহন বিবাহের আয়োজন করেছিলেন শুধু, আর দিগম্বর বিবাহের দু'একটি মন্ত্রও উচ্চারণ করেছেন। এ-হেন সময়ে বিপত্তি। বিবাহ সভায় দিগম্বরীর আবির্ভাব, ঠিক যেমন আবির্ভাব হয়েছিল রসময়ীর মাধবী-তলায় সেই হরিশবাবুর গৃহে। রসময়ী একা যা'ননি, সঙ্গে ছিল দিদি, দিগম্বরীর সঙ্গে তাঁর একান্ত অনুগত, ও তাঁরই স্বভাবের অনুরূপ এক দাসীকে তিনি এনেছিলেন।

এবারে রসময়ীর রণচণ্ডীনী রূপের কিছু বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।

"বিনোদিনী বলিল—"তোমাদের মেয়ের নাকি বিয়ে?"

গৃহিণী বলিলেন—"হ্যাঁ—আমার ছোট মেয়েটির "বিয়ে।"

"কবে?"

"এই বিশে মাঘ দিন স্থির হয়েছে।"

"পাত্রটি কে?"

"ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী—হুগলীতে মোক্তারী করেন।"

"সতীনের উপর মেয়ে দিচ্ছ বাছা?"

গৃহিণীর বিস্ময় প্রতি কথায় বাড়িয়া চলিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা চেন নাকি?"

১। রসময়ীর রসিকতা—২৮২; ২৯০ প্রভাত গ্রন্থাবলী ৩য়, ৪র্থ ভাগ।

বিনোদিনী বলিল—"চিনিনে আবার—খুব চিনি। আমাদের গ্রামেই তো বিয়ে করেছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"হ্যাঁ—সতীন আছে বটে—কিন্তু সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে।"

রসময়ী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিল, তাহার মনের রাগ ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। এই কথা শুনিয়া হস্তপদ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—চক্ষু দুইটি লাল হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন পরিত্যাগ করেছে, কিছু শুনেছ গা?"

"শুনেছি সে মাগী নাকি বড় দজ্জাল।"

শ্রবণ মাত্র রসময়ী তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বারান্দার কোণে ছিল একগাছা ঝাঁটা। নিমেষ মধ্যে সেইটা দুই হস্তে ধরিয়া গৃহিণীর উপর সপাসপ মারিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল—"কেন?—কেন?—আর কি মরবার জায়গা পেলে না?—জায়গা পেলে না?—আমার সোয়ামী ছাড়া কি তোমার মেয়ের অন্য পাত্র জুটলো না?—জুটলো না?"—

এর পরেই রসময়ীকে এই একই ভাবে ক্ষেত্রমোহনবাবুর সামনে দেখি।

"কাছারী হইতে বাড়ী ফিরিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, অন্তঃপুরে বসিয়া ক্ষেত্রবাবু তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের মত রসময়ী আসিয়া প্রবেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হইয়া ক্ষেত্রমোহনের পানে দৃষ্টিপাত করিল—সেই প্রকার দৃষ্টিপাত, যে দৃষ্টিপাতে পূর্বে মুনি ঋষিরা লোককে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"কি মনে ক'রে?"

রসময়ী অসম্ভব সংযমের সহিত উত্তর করিল—"একটা শ্রাদ্ধের যোগাড় করতে।" তাহার ওষ্ঠে যুগলক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল।

তামাক টানিতে টানিতে ক্ষেত্রমোহনবাবু বলিলেন—"শ্রাদ্ধটা কার?"

"হরিশ চাটুজ্যের মেয়ের—আর মেয়ের মা'র।"

"তা হ'লে দুটো শ্রাদ্ধ বল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজেরটাও সেরে নিলে হয় না?"

"সেইটি হবে না এখন। বুড়ো বয়সে বিয়ে করছ নাকি শুনলাম?"

হুঁকা নামাইয়া, একটু উত্তেজিতভাবে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"করছিই ত। করব না কেন? তোমার ভয় না কি?"

রসময়ী চীৎকার করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—"কর না, ক'রে একবার মজাটাই দেখ না।"

"কি করবে তুমি?"

এই এমন কিছু না। আঁশবঁটি দিয়ে সে মেয়ের নাকটা কেটে দেব আর বুকে একখানা দশমুণে পাথর চাপিয়ে দেব।"

"আর তোমার নাকটা কানটা কেউ যদি কেটে দেয়?"

"এস না। কাট না। তুমিই কাট না হয়।"—বলিয়া রসময়ী নিজ কোমরে দুই হাত দিয়া, ঝুঁকিয়া, নিজের মুখ ক্ষেত্রমোহনের অতি নিকটে সরাইয়া দিল।

স্ত্রীর এতাদৃশ বিনয় দেখিয়া ক্ষেত্রমোহন আবার হুঁকা উঠাইয়া লইয়া আপন মনে টানিতে লাগিলেন। ঝুঁকিয়া থাকিয়া যখন ক্লান্তি বোধ হইল, দয়াময়ী তখন নিজের মুখ সরাইয়া লইয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বলিল—"তা হ'লে আঁশবঁটিতে শান দিয়ে রাখি গে? সম্বন্ধ পাকা হ'লে খবরটা দিও—চুপি চুপি যেন শুভকর্মটা সেরে ফেল না।"

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—' তুমি না মরলে আর বিয়ে করছিনে। মরবে কবে?"

এই কথা শুনিয়া রসময়ী বিদ্রূপের স্বরে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আমি মরব কবে জিজ্ঞাসা করছ? রসি বামনি এখনি মরছে না। তার এখনও অনেক দেরী—বিস্তর বিলম্ব। তোমার বিয়ে করবার বয়স যাবে—বুড়ো থুড়থুড়ো হবে—ভূঁয়ে মুয়ে হয়ে যাবে—যখন আর কেউ তোমায় মেয়ে দিতে রাজি হবে না—তখন আমি মরব।"[২]

এরই পাশাপাশি ত্রৈলোক্যনাথ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।

'জনতা ঠেলিয়া তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, অর্ধভগ্ন গুরুগম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন,—'কৈ। কোথায় সে ফোক্‌লা কোথায়? সে মুখ-পোড়া নচ্ছার কোথায়?"

তাঁহার মূর্তি দেখিয়া, সকলে অবাক হইয়াছিল; এখন তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলে আরও অবাক্ হইল।' অর্ধভগ্ন গুরুগম্ভীর স্বর।......

গলা ভাঙ্গা স্ত্রীলোকটি পুনরায় বলিলেন,—"কৈ। সে ফোক্‌লা মুখপোড়া কোথায়?"

২। রসময়ীর রসিকতা—২৯০ পৃঃ (প্রভাত মুখোপাধ্যায়)

আমার নিকটে বসিয়া, ফোক্‌লা মহাশয় একদৃষ্টে কুলী ও সন্ন্যাসীর মুখ পানে চাহিয়া পাখা নাড়িতে ছিলেন। "ফোক্‌লা মুখপোড়া কোথায়" এই গম্ভীর শব্দ শুনিয়াই তাঁহার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। পাখাখানি তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। আমার পশ্চাৎ দিকে তিনি লুকাইতে চেষ্টা করিলেন। স্ত্রীলোকটি কে, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, ফোক্‌লাকে আমি লুকাইতে দিলাম না আমার পশ্চাৎ দিকে তিনিও যত সরিয়া আসেন, আমিও তত সরিয়া যাই।

ইতিমধ্যে সেই স্ত্রীলোকের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। তিনি বলিলেন,— "এই যে পোড়ার মুখ লুকাইতেছেন। হ্যাঁ-রে। ঢ্যাকরা এ সব তোর কি কারখানা বল দেখি?"

দিগম্বরবাবু বলিলেন,—"কেও। মনুর মা! তুমি কোথা হইতে?" গলা ভাঙ্গা উত্তর করিলেন,—"আমি কোথা হইতে। আমি যমের বাড়ী হইতে। তোর নড়া ধরিয়া সেইখানে লইয়া যাইব, সেই জন্যে আমি আসিয়াছি।"[৩]

তার রসময়ী অপেক্ষা দিগম্বরী বয়সেও বড়, তাঁর অভিজ্ঞতাও বেশী। তাই যেন দিগম্বর তাঁকে ক্ষেত্রমোহনের চাইতে বেশী ভয় করেন। তা'ছাড়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর সহিত মুখোমুখী হওয়ার আগেই কাছারীতে হরিশবাবুর মুখেই রসময়ীর সব কথাই শুনেছিলেন, রাগে তাঁর সর্বশরীর জ্বলছিলো। সেজন্যই বোধ হয় ক্ষেত্রমোহন তাঁর বিবাহ প্রসঙ্গকে বেশ সজোরেই স্বীকার করলেন। কিন্তু দিগম্বরের মনোজগতে দিগম্বরীর আগমন বিষয়ে কোন প্রস্তুতি ছিল না। তাই অকস্মাৎ দিগম্বরীকে দেখে তিনি ভয়ে ভয়েই বললেন,—

"বে! কার বে? আমি বে করিতে আসি নাই ত মাইরি বলিতেছি, আমি বে করিতে আসি নাই।......"

গলাভাঙ্গা উত্তর করিলেন,—তোর বে নয়? তবে তোর হাতে সূতা বাঁধা কেন রে ড্যাকরা?

দিগম্বরবাবু উত্তর করিলেন,—'হাতে সূতা বাঁধা? আমার?"

স্ত্রী বলিলেন, "একবার ন্যাকামি দেখ। হাতে সূতা বাঁধা কেন তা বল?"

৩। ফোক্‌লা দিগম্বর—৪৯ পৃঃ
(ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়)

"হাতে সুতা বাঁধা। তাই তো। ওটা আমার ঠাওর হয়নি।"

গলাভাঙ্গা উত্তর করিলেন,—"ওটা তোমার ঠাওর হয়'নি! পিণ্ডিতে চল। তোমার বাসায় গিয়া যাহাতে ঠাওর হয়, তাই করিব। ঝাঁটার বাড়ীতে তোমার ঠাওর করিয়া দিব। তবে আমার নাম জগদম্বা বামনী।"

এই দুইটি দৃশ্যের মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টিতে অতি নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। 'ফোক্‌লা দিগম্বরের' রচনা কাল—১৩০৭, আর রসময়ীর রসিকতা'র ১৩১৬। তাই এখানে রসময়ী চরিত্র সৃষ্টিতে প্রভাতকুমারের উপরে যে ত্রৈলোক্যনাথের দিগম্বরীর প্রভাব রয়েছে এ সত্যকে অস্বীকার করা যায় না।

ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পে মানুষের বৃথা ধর্মবিশ্বাস, দেব-দেবীর আরাধনা, বিপদে পড়ে মূর্খের মত যা' সত্য নয় তাকেই সত্য বলে ধরে নেওয়া, হুজুগে পড়ে সব কিছুকে বিশ্বাস করা ইত্যাদিকে সুন্দরভাবে ব্যঙ্গ চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষের এই দুর্বলতাগুলোকে নয়নচাঁদ জানে। এবং এই জানার ফলে সে এই সুযোগগুলোকে বেশ নিজের সুবিধে মত কাজে লাগাতে দেরী করে না। প্রভাতকুমারের গল্পের স্থানে স্থানে এ ধরনের ব্যঙ্গ আছে। তবে তা ত্রৈলোক্যনাথের মত এত সুস্পষ্ট নয়। তবে দুই একটি স্থানে প্রভাতকুমারের ব্যঙ্গও বেশ ফুটেছে। উদাহরণরূপে আমরা "বিবাহের বিজ্ঞাপন" গল্পটির উল্লেখ করতে পারি। গাজীপুরের রাম আওতার নামে যে যুবকটি শিক্ষালাভের ও বিলাত গমনের আশায় কাশীতে ছুটেছিল, তার পরিণতির চিত্র যেভাবে লেখক এঁকেছেন তার মধ্যে সুন্দর হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ যে বাইরেরটুকু দেখেই কেমন করে ভুলে যায়, ভুল করে, আর একজনকে সে যা' নয় তাই বানিয়ে তুলতে দ্বিধা করে না তারই জলন্ত দৃষ্টান্ত যেমন 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' তেমনি 'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পটির' শেষ অংশ উদ্ধৃতি দিয়ে দেখালে প্রভাতকুমারের ব্যঙ্গটি আমরা যথার্থ অনুধাবন করতে পারবো।

"মহাদেও বলিল, "না—না। উহাকে সন্ন্যাসী বানাইয়া ছাড়িয়া দে। কাল সকালে যখন নেশা ছুটিয়া জাগিয়া উঠিবে, তখন খাইবে কি? একটা গেরুয়া কৌপীন পরাইয়া দে। সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখাইয়া দে। একটা চিমটা দে। একটা ঝুলিও সঙ্গে দিয়া দে। কাশীতে সন্ন্যাসী বেশী লোক কখনও ক্ষুধায় মরে না।"......

কয়েক দিবস পরে গাজীপুরের সকলেই শুনিল, রাম আওতার লাল ধনসম্পদ

পরিত্যাগপূর্বক সংসার বিবাগী হইয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিল; সৌভাগ্যবশতঃ তাহার মাতুল কাশীর রাস্তায় তদবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া, অনেক কষ্টে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়া এখন হইতে রাম অওতারের একটা খ্যাতি জন্মিয়া গেল।"[৪] রাম অওতারের কিন্তু সন্ন্যাস-গ্রহণের কোন বাসনাই ছিল না। কিন্তু তার পরিধেয়, কাশীতে তার অবস্থিতি, পথের ধারে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকা, মাতুলের দৃষ্টিপথে পড়া—ইত্যাদি মিলিয়ে যে জনশ্রুতি গড়ে উঠলো তাতে 'দ্বাবিংশতি বৎসর বয়স্ক বিবাহেচ্ছু যুবককে একেবারে সন্ন্যাসের উঁচু বেদীতে তুলে দেওয়া হল, বেশ একটা খ্যাতিও গড়ে উঠলো। নয়নচাঁদেরও ঠিক এমনি অবস্থা হয়েছিল। বিভিন্ন ঘটনায়, ও জনরবে শেষ পর্যন্ত নয়নচাঁদ শীতলার পাণ্ডা থেকে বসন্তের ডাক্তার হয়ে ওঠে। নয়নচাঁদের কথায় শুনতে পাই,—

"আগে যদি এক গুণ পসার ছিল, এখন দশ গুণ পসার হইল। কলেজের সেই যারা এম. এ পাশ দিয়াছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল। খবরের কাগজে আমার শীতলার নাম উঠিল। ফিরিঙ্গিরা আসিয়া আমার শীতলার পূজা দিতে আরম্ভ করিল। একদিন লোক সব হাঁড়ি চড়ানো বন্ধ করিয়া খই কলা খাইয়া রহিল। আমার বুজরুকি চারিদিকে খুব জাহির হইল। ক্রমে আমি বসন্তের ডাক্তার হইলাম।"[৫]

প্রভাতকুমারের রচনার দু'একটি স্থানে সম্পাদকের কথা আছে। খবরের কাগজের সম্পাদকরা তাঁদের ইচ্ছেমত মতামতকে পরিচালনা করতে পারেন। তাঁরা তাঁদের সুবিধামতই কোন জিনিষ সম্পর্কে মন্তব্য করে থাকেন। সম্পাদকের এই ধরনের কার্য-কলাপকে ব্যঙ্গ করে ত্রৈলোক্যনাথও বলেছেন। তবে ত্রৈলোক্যনাথ দু'একটি কথার টানে যাকে অতি স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন, প্রভাতকুমার তাকেই দীর্ঘ গল্পের মধ্যে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের "সম্পাদকের আত্মকাহিনী" "ছদ্মনাম" গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে "সম্পাদকের আত্মকাহিনী" গল্পটিতে প্রথম দিকে "আর্যশক্তি"র গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সম্পাদকের যে আত্মস্বীকৃতি তা' সত্যই ব্যঙ্গাত্মক। অবশ্য শেষ দিকে দুর্বল স্বদেশপ্রেমকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

৪। বিবাহের বিজ্ঞাপন—১৮০ পৃঃ। (৩য়-৪র্থ ভাগ, প্রভাত গ্রন্থাবলী)

৫। নয়নচাঁদের ব্যবসা—৬৩ পৃঃ।

'ছদ্মনাম' গল্পটির মধ্যে সম্পাদকের যে চিত্র পাই তাতে মনে হয় লেখক এখানে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন। যদিও তা' অতি স্পষ্ট নয়। এ গল্পে দেখি একই উপন্যাস একই সম্পাদকের হাতে পড়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সমালোচনায় ভূষিত হতে চলেছে। সম্পাদক অথবা লেখকদের এই স্বেচ্ছাচারীরূপকে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর "লুল্লু" গল্পটির শেষে বেশ চমৎকাররূপে ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি বলেছেন সম্পাদক ও লেখকগণ অনেক সময় ভূতগ্রস্থ হয়ে লিখতে থাকেন, তখন তাঁরা নিজেরাই জানেন না যে কি লিখছেন, বা কেন লিখছেন। এই লেখকদলকে সাবধান ক'রে বলেছেন,—

"যথাসময়ে আমীর একখানি সংবাদপত্র বাহির করিলেন। একে ভূত সম্পাদক, তাতে আবার চণ্ডুখোর ভূতগুলির চৌদ্দপুরুষ। সে সংবাদপত্রের সুখ্যাতি রাখিতে পৃথিবীতে আর স্থান রহিল না। সংবাদ পত্রখানি উত্তমরূপে চলিতে লাগিল, তাহা হইতেও আমীরের বিলক্ষণ দুই পয়সা লাভ হইল।

গোঁ-গোঁ যে কেবল আপনার সংবাদপত্রটি লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা নহে। সকল সংবাদপত্র আফিসেই তাঁর অদৃশ্যভাবে গতায়াত আছে। (অন্যান্য কাগজের লেখকেরা যখন প্রবন্ধ লিখিতে বসেন, তখন ইচ্ছা হইলে লেখকেরা কত কি যে লিখিয়া ফেলেন, তাহার কথা আর কি বলিব। তাই বলি, লেখক দল। সাবধান।"[৬])

বাঙালীর জাতকে নিয়ে, তার ইংরাজ মোহ নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথের মত প্রভাতকুমারও তাঁর গল্পের দু'একটি স্থানে সামান্য দু'এক ছত্র ব্যঙ্গ করেছেন। যেমন, "আমার উপন্যাস" গল্পে,—

"বাবুটি নরম হইয়া বলিলেন, "হুঁ"। একটু করিয়া বলিলেন, "সত্যি বামুন? না বামুন সেজেছ? গলায় একগাছা পৈতে দিয়ে অনেক ব্যাটা হাড়ি-মুচি এসে বামুন হয়।"[৭]

"লেডী ডাক্তার" গল্প থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল :—

"বাবু বলিলে সে রাগিয়া উঠে না, কিন্তু সাহেব অভিহিত হইলে খুসী হয়। বাড়ীতে ধুতি পরিতে বিশেষ আপত্তি নাই, কিন্তু পায়জামা সুটই সুরুচিসঙ্গত মনে করে।"[৮]

৬। লুল্লু—৪৯ পৃঃ।
৭। আমার উপন্যাস—১৬৫ পৃঃ।
৮। লেডী ডাক্তার—৬৮৭ পৃঃ।

"কিন্তু পাইপটি দাঁতের মধ্যে চাপিলেই মুখভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটে—উহার মধ্যেই একটু কাঠখোট্টাগোছ দেখায়—মনে হয়, অত্যল্প কারণেই হয় ত এ ড্যাম বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিবে।"

এ ধরনের ব্যঙ্গ ত্রৈলোক্যনাথে প্রচুর আছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রভাতকুমার এই ধরনের ব্যঙ্গ অঙ্কনে ত্রৈলোক্যনাথের প্রভাবে প্রভাবিত।

সাধু-সন্ন্যাসীর ভণ্ডামিকে নিয়ে প্রভাতকুমার তাঁর রচনার অনেক স্থানেই হাস্যরস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এ ধরনের হাস্যরস সৃষ্টি ত্রৈলোক্যনাথের আছে, এবং তা সর্বাংশে সুন্দর হয়েছে। কিন্তু প্রভাতকুমার যে ভাবে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তাতে যেন স্পষ্টই ধরা পড়ে যায় লেখক এ-ধরনের চরিত্রকে ঘৃণার চোখে, উপহাসের চোখে দেখেন। তাদের তিনি তাই সর্বত্রই নীচ করে এঁকেছেন। প্রভাতকুমারের সন্ন্যাসীরা ত্রৈলোক্যনাথ সৃষ্ট সন্ন্যাসীদের মত জীবন্ত নয়, তাই এ ধরনের চরিত্রসৃষ্টি করে প্রভাতকুমার কোন সহজাত হাস্যরসের স্ফুরণ ঘটাতে পারেননি, তা' ছাড়া, এ ধরনের চরিত্র-সৃষ্টি করতে গিয়ে ত্রৈলোক্যনাথের প্রভাবকে তিনি গ্রহণ করছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা "মনের মানুষ" নামক উপন্যাসটির উল্লেখ করতে পারি। এ উপন্যাসের জ্যোতিষী ও নিগমানন্দ স্বামীর উপরে কুঞ্জলালের অগাধ বিশ্বাস। জ্যোতিষীও মিথ্যা বলে দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা করছে, সে নিজে মুখেই স্বীকার করেছে সে-কথা, আর নিগমানন্দ স্বামী এঁরূপই। ত্রৈলোক্যনাথের নয়নচাঁদও ঠকিয়েই পয়সা রোজগার করছে, "ডমরুধর-চরিতে" সেই গাছেঝোলা সাধুও শঠতার আশ্রয় নিয়েই জীবন কাটাতে চেয়েছিল। এবং ডমরুধরের কাছে দ্বিতীয় যে সন্ন্যাসী এল সেও ডমরুধরকে ঠকিয়ে তার সব কিছু করায়ত্ত করতে চেয়েছিল। সে ডমরুধরকে অজ্ঞান করে ফেলেছিল। নিগমানন্দ স্বামীও কুঞ্জকে অদৃশ্য করে দিয়েছিল। এইভাবে সন্ন্যাসীরা নিজেদের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে যত্নতৎপর হন। তবে ত্রৈলোক্যনাথের বলবার ভঙ্গীটিই অতি সুন্দর, সহজেই আমরা হাসি, কিন্তু প্রভাতকুমার তেমন ভাবে বলেন না, তাই প্রভাতকুমারের এ-ধরনের চরিত্র ততবেশী হাস্যরসাত্মক হয়ে ওঠে না, তা ছাড়া, মনে হয় কোথায় যেন এ সব ভণ্ড সন্ন্যাসীদের দেখেছি, তাদের যেন চিনি। শেষে, স্পষ্টভাবেই মনে পড়ে এদের তো ত্রৈলোক্যনাথের হাতেই জন্ম, সেখানেই তো এদের পুষ্টি। সেই পরিবেশ থেকে তুলে এনে প্রভাতকুমার তাদের আর তেমনিভাবে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন নি।

তবে সাধারণ মানুষের সহজ বোকামিকে নিয়ে প্রভাতকুমার অনেকস্থানে হাস্যরস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, এগুলো মোটামুটিভাবে ফুটেছে। তবে এখানেও চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে, তাদের বোকামির পরে ত্রৈলোক্যনাথের অস্পষ্ট ছায়া দেখা যায়। উদাহরণরূপে আমরা "জীবনের মূল্য" উপন্যাসের গিরিশের চরিত্রকে স্মরণ করতে পারি। গিরিশের দু'বার স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। দুটি পুত্র ও দুটি কন্যা আছে। পুত্রেরাই বিবাহযোগ্য। কিন্তু গিরিশ একটি স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী মৃত্যুর পরে বামুনপাড়ার জগদীশ বাঁড়ুয্যের মেয়ে প্রভাবতী বা পটলি রূপে জন্মগ্রহণ করেছে। একে বিবাহ করার জন্যে গিরিশ পাগল হয়ে উঠলেন। এই গিরিশের চরিত্রটিকে যেভাবে আঁকা হয়েছে, তাতে স্পষ্টই ত্রৈলোক্যনাথের ফোকলা দিগম্বরের কথা মনে পড়ে। ফোক্লা দিগম্বরও বিয়ে পাগলা বুড়ো। কিন্তু কেউ তাকে বুড়ো বললে সে চটে যায়। কিছুতেই স্বীকারই করতে চায় না যে সে বুড়ো। সে বলে "তুমি আমাকে বুড়ো বলিলে। এরূপ কটু কথা কখন আমাকে কেহ বলে নাই। তোমার নামে আমি ড্যামেজের নালিশ করিব। তোমাকে জেলে দিব; যত টাকা খরচ হয়, তাহা করিব।"…।[১ক] জীবনের মূল্য থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল, "বুড়ো বয়সের কথাটা শুনিয়াই সে রাগে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন—"হ্যাঁ দেখ, তোমাদের কেমন বদ অভ্যেস—পরের চর্চা না ক'রে কিছুতেই থাক্‌তে পার না। কিসে আমার ভাল, কিসে আমার মন্দ, তা আমি বিলক্ষণ বুঝি।"……বলিয়া তিনি উঠিলেন, চটিজুতা ফটফট করিতে করিতে বারান্দার পৈঁঠা দিয়া নামিয়া গেলেন।"[খ] বার্ধক্যে বিবাহের জন্য উন্মত্তপ্রায় এই দুই বৃদ্ধের বোকামি প্রায় একই প্রকার। তাই দুটি চরিত্রই হাস্যরসাত্মক। এবং ত্রৈলোক্যনাথ সৃষ্ট চরিত্রের ছাপ প্রভাতকুমারের গিরিশের পরে এসে পড়েছে। একথা বললে ভুল হবে না। সুতরাং সবশেষে বলতে পারা যায় যে হাস্যরস সৃষ্টিতে কেদারনাথের মতই প্রভাতকুমারও ত্রৈলোক্যনাথের নিকট অনেকাংশে ঋণী।

১ক। ফোক্‌লা দিগম্বর—৪৬ পৃঃ।

খ। জীবনের মূল্য—১০ পৃঃ।

পরিশিষ্ট

ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী বহির্ভূত একটি গল্প ও একটি প্রবন্ধ অংশ

ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলীর ২য় ভাগে "ভূত ও মানুষ" অংশের একটি গল্পের নাম 'বাঙ্গাল নিধিরাম'। এই 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পে শেষ পর্যন্ত নিধিরাম মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু হিরণ্ময়ীর যে কি অবস্থা হল তার বিশদ বিবরণ সেখানে নেই, শুধু সে নবীনের সঙ্গে নৌকায় করে ভেসে চলেছে— এই টুকুই আমরা জানি। কিন্তু এখানেই হিরণ্ময়ীর জীবন শেষ নয়। আরও আছে। তারই কথা "রূপসী হিরণ্ময়ী"[১] গল্পে প্রকাশিত। গ্রন্থাবলীতে এই গল্পটির স্থান লাভ ঘটেনি। তাই গল্পটি উদ্ধৃত হ'ল।

রূপসী হিরণ্ময়ী

১। যেন কেমন—কেমন

বাঙ্গাল নিধিরাম মরিয়া গেলেন, তাহার পর কি হইল? হিরণ্ময়ীর কি হইল? অনেকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন। কারণ মাথার উপর ভগবান আছেন। হিরণ্ময়ীর মত কলঙ্কিনী যদি সুখে সচ্ছন্দে জীবনযাপন করে, তাহা হইলে ধর্মাধর্ম সব মিথ্যা, বিধাতার সৃষ্টি বৃথা, তবে ভাবিয়াছিলাম এই যে, এই হতভাগিনীর কথা লিখিয়া আমার লেখনী কেন আর কলঙ্কিত করি? তাই চুপ করিয়াছিলাম। কিন্তু সকলে বলেন যে হিরণ্ময়ীর শেষ দশা কি হইল তাহা না বলিলে ধর্মের অবমাননা করা হয়। তাই বলিতে হইল। কিন্তু লিখিতে আমার মন হইতেছে না, কলম সরিতেছে না।

হিরণ্ময়ী যখন বলিলেন—"দেখ, দেখ। বাঙ্গাল কি করিতেছে দেখ। ঠাট করিয়া আবার বাবার কোলে শোয়া হইয়াছে।" তখন নবীন সেই ঘাটের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। হাতে পৈতা, অর্ধ জলমগ্ন, ভূতলশায়ী নিধিরামের দিকে নিমেষের নিমিত্ত তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। নৌকা মোড় ফিরিল, আর তিনি কিছু দেখিতে পাইলেন না।

১। জন্মভূমি, মাঘ—১৩০০, ২য় সংখ্যা পৃঃ ৬৫, ৪র্থ ভাগ, পঞ্চম বর্ষ।

অধিক আর কিছু দেখিবার আবশ্যকও ছিল না। যাহা কিছু দেখিলেন, তাহাতেই যেন তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। হিরণ্ময়ীর সেই মৃদু মধুর কথাগুলি শেল সমান তাঁহার বুকে বাজিল।

নবীন বলিলেন,—হিরণ্ময়ী। ঘোর সর্বনাশ হইয়াছে। আমার মন বলিতেছে, নিধিরামের অমঙ্গল ঘটিয়াছে। আমি আজ ঐ দেবতা-সমান ধর্ম পরায়ণ ব্রাহ্মণকে বধ করিলাম। তোমার বিদ্রূপ বাক্য শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। এখন বুঝিতেছি। তুমি ঐ দেবপুরুষের সেবাদাসী হইবার উপযুক্ত পাত্রী নও, তাই তুমি তাঁহাকে পাইলে না। এখন মন দিয়া শুন, তোমাদের জন্য নিধিরাম কিরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, কিরূপ ভয়াবহ বিপদ সমূহ হইতে রক্ষা পাইয়া তোমার পিতার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন।"

নিধিরামের সমুদয় বিপদ ও ক্লেশের কথা নবীন হিরণ্ময়ীকে বলিলেন।

হিরণ্ময়ী উত্তর করিলেন, নিধিরাম আমাদের নিমিত্ত কষ্ট পাইয়াছেন সত্য, নানা বিপদে পড়িয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরাও কি তাঁহার কিছু করি নাই? যখন তিনি বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইয়া আমাদের বাটীতে আসিলেন, তখন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমরা তাঁহার সেবা করিয়াছিলাম। যখন গোবিন্দ ও তাহার সঙ্গীদিগের লাঠির প্রহারে তিনি আহত হন, তখন আমরা সেইরূপ সেবা করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। আমাদিগকে তিনি সাত শত টাকা দিয়াছিলেন, এই বৈ তো নয়। তা আমরাও তাঁহার যাহা করিয়াছি, সাত শত টাকায় তাহা পরিশোধ হয় না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে তিনি আমাদের কিছু করেন নাই, বরং আমরা তাঁহার অনেক করিয়াছি।

নবীন চুপ। একবার কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার মনে হইল,— "কালসাপিনী বুকে ধরিলাম।" কিন্তু হিরণ্ময়ীর রূপে তাঁহার মন এখন আচ্ছন্ন। তিনি এখন অন্ধ, উন্মত্ত। এখন তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে হিরণ্ময়ী দেবীরূপা লক্ষ্মীস্বরূপা পবিত্রময় নারী। তিনি সত্যের আধার। সতীত্বের আদর্শ। তিনি যাহা বলেন তাহাই সত্য; তিনি যাহা করেন তাহাই ঠিক। নবীন ও হিরণ্ময়ী ঘরে পৌঁছিলেন। নবীনের মাতা-পিতা যথাবিধি সমাদরে পুত্রবধূকে ঘরে লইলেন। হিরণ্ময়ীর রূপে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। মেঘের কোলে সৌদামিনী অতি লাবণ্যময়ী। প্রতিবাসীগণ সকলে এক বাক্য হইয়া বলিলেন যে, হিরণ্ময়ীর রূপ সেই মেঘের কোলে সৌদামিনীর মত। সে

রূপের পানে স্থির হইয়া চাহিবার যো নাই, চক্ষু ঝলসিয়া যায়, মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

নবীনের মাতা কিন্তু সেই অতুল রূপরাশি দেখিয়া সুখী হইলেন না। তাঁহার মনে যেন কেমন একটি ঘৃণার ভাব উদয় হইল। স্বামীকে তিনি বলিলেন—"দেখ। বৌ-মার সব ভাল বটে, কিন্তু তাঁর চাউনিটা যেন কেমন-কেমন। যেন "কি দেখি কি দেখি, যেন কি করি সর্বদা এইভাব। বৌমা বোধহয় একটু চঞ্চলা হইবেন।"

২। মনের বাসনা

হিরণ্ময়ী শ্বশুর বাড়ীতে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। সেই চঞ্চলভাব ক্রমে বাড়ীতে লাগিল, ঘুচিল না। সকলে দেখিলেন, যে হিরণ্ময়ীর লজ্জা-সরমও কিছু কম। উচ্চরবে হাসিলে, কি কথা কহিলে যদি শাশুড়ী বকিতেন, তাহা হইলে দুই একদিন হিরণ্ময়ীর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইত না, যেন এমন ধীর শান্ত স্ত্রীলোক আর জগতে নাই। কিন্তু সে কেবল দুই একদিনের জন্য। তাহার পর আবার যে সেই। জানলা দিয়া উঁকি মারাটাও বিলক্ষণ ছিল। ধরণচলন ভাবভঙ্গী সকলই—আর দুঃখের কথা কি বলিব ?—ভদ্রলোক গৃহস্থ কুলবধূর মত নয়।

নবীন মাঝে মাঝে হিরণ্ময়ীকে বুঝাইতেন। নবীন বলিতেন,—"দেখ হিরণ্ময়ী। সকলেই তোমার নিন্দা করিতেছে। কাহারও মুখে তোমার সুখ্যাতি শুনি না। তোমার নিন্দা শুনিলে আমার মনে দুঃখ হয়। ধীর শান্ত হইবে। সকলে বলিবে যে, বেটীর যেমনি রূপ তেমনি গুণ। সে কথা শুনিতে ভাল, কি নিন্দা শুনিতে ভাল ? তোমার বুদ্ধি আছে, তুমি কিন্তু নির্বোধ নও। একবার স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখ, কোনটি ভাল ?"

হিরণ্ময়ী মধুর হাসি হাসিয়া নবীনকে বুঝাইয়া দিলেন যে শ্বশুর, শাশুড়ী। প্রতিবেশিনীগণ অর্থাৎ কিনা পৃথিবীর আর যাবতীয় লোক সবাই মন্দ, সবাই মিথ্যাবাদী। সকলে মিথ্যা মিথ্যা তাঁহার নিন্দা করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে ভাল কেবল হিরণ্ময়ী এক আপনি নিজে আর সবাই কুলোক।

হিরণ্ময়ীতে নবীন আচ্ছন্ন। নবীন অন্ধ, উন্মত্ত। নবীন তাহাই বুঝিলেন। নবীনকে একদিন হিরণ্ময়ী বলিলেন,—'দেখ। এই আরশী হইতেছে যত

অনিষ্টের মূল। যখন আরসী দিয়া নিজের মুখ দেখি, যখন নিজের অতুল সৌন্দর্য বুঝিতে পারি, তখন জগতের লোকের জন্য মনে বড় দুঃখ হয়। আমি ঘরের ভিতর বদ্ধ হইয়া রহিলাম, জগতের লোক এ অপূর্ব রূপ রাশি দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতে পাইল না। মনে মনে ভাবি যে, আমার এই অনুপমরূপ দেখিলে জগতের লোক পাগল হইয়া আমার পদাশ্রিত হয়। মুনি হউন, কবি হউন, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারি।'

নবীন উত্তর করিলেন, "ছি হিরণ্ময়ী। এরূপ কথা মুখে আনিতে নাই, এরূপ সাধ মনে স্থান দিতে নাই। তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, তুমি ভদ্রলোকের বউ। এরূপ পাপ কথা আর কখনও মুখে আনিও না।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন,—"লেখাপড়া শিক্ষা করা আমার বড় সাধ। যদি লেখাপড়া পাই তাহা হইলে আর কিছুই চাই না। তাই লইয়া ভুলিয়া থাকি, ওরূপ কথা আর মনে উদয় হয় না।"

নবীন সেই দিন হইতে হিরণ্ময়ীকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। যখন পড়িতে লিখিতে শিখিলেন নবীন তখন হিরণ্ময়ীকে মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুস্তক আনিয়া দিলেন। কিন্তু তাহা পড়িতে হিরণ্ময়ীর মন হইল না। নাটক নভেল, বটতলার চটি, গানের পুস্তক, এই সকলে হিরণ্ময়ীর মতি।

একদিন হিরণ্ময়ী একজন প্রতিবাসীর বাড়ী বিবাহ বাসরে গিয়াছিলেন। সেখানে বিনুর মা গান করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ও বিনুর মা ব্যবসাদার লোক। বিনু ভিক্ষা করিয়া প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন। তাহাতেই তাঁহার সংসারে নির্বাহ হয়। কিন্তু সংবৎসর বাটীতে থাকেন না। পূজা করিবার নিমিত্ত দেশ বিদেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। পূজার পূর্বে বাটী আসেন। বাটী আসিয়া একখানি প্রতিমা নির্মাণ করিয়া লন। পূজা-আর্চ্চা নামমাত্র। তবে ঢাকিঢুলি থাকে, সমারোহে বাজনাটা হয়। একবার অষ্টমী পূজার দিনে বিনুর মা একটি পাত্র হাতে করিয়া একজন প্রতিবাসীর বাটীতে দাল চাহিতে গিয়াছিলেন। বিনুর মা বলিলেন,—"তোমরা বাছা আমাকে একটু দাল দিতে পার? বাজনদারদের দুটি ভাত দিতে হইবে। ব্যঞ্জন তরকারি কিছুই নাই। তাই মনে করিলাম, তোমাদের বাটী হইতে একটু দাল লইয়া বাজনদারদের এক মুঠা ভাত দিই।" প্রতিবাসিনী বলিলেন,—"সে কি কথা গো? তোমার হইল পূজাবাড়ী। আমাদের

পূজাবাড়ী নয়। আমাদের বাড়ী তুমি দাল চাহিতে আসিয়াছ—সে কিরূপ কথা? এমন পূজা তোমাদের কি না করিলে নয়, বাছা?" বিনুর মা উত্তর করিলেন,—বিনু আমার পূজাটি যদি না করিবেন, তবে বিনু খাবেনটি কি কোরে?" কথা এই, পূজা করিবার নামে বিনু ভিক্ষা করিয়া যা অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহার যৎসামান্য খরচ করিয়া বাকি পুঁজি করেন। বিনুর মা-ও অর্থোপার্জন করিয়া থাকেন। তিনি গান গাহিতে পারেন। যদিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি একটু আধটু নাচিতে ও তাঁহার বিশেষ কোন আপত্তি নাই। তিনি না উপস্থিত থাকিলে লোকের বাসর জমে না। বাসর জাগিয়া তিনি টাকাটা সিকাটা উপার্জন করিয়া থাকেন।

বিনুর মার সহিত হিরণ্ময়ীর সদ্ভাব। তাঁহার নিকট তিনি দুই চারিটা গান শিখিয়াছিলেন, একটু একটু নাচিতেও শিখিয়াছিলেন, আজ বাসরে হিরণ্ময়ী গান করিলেন, একটু নাচিলেন ও তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া, তাঁহার নৃত্যের ভাবভঙ্গি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল।

হিরণ্ময়ী বাটী আসিয়া নবীনকে বলিলেন, "দেখ, আজ আমার গান শুনিয়া সকলেই মোহিত হইয়াছিল। সকলেই বলিল,—আহা এমন গলা, কখন শুনি নাই।" কিন্তু এ সব গুণ আমার বৃথা হইয়াছে। ঘরে ঠিক কারাগারের মত বদ্ধ হইয়া আছি। মনে সাধ হয় যে, পাঁচজনকে আমার গান শুনাই। সকলেই আমার গানে মুগ্ধ হইবে।"

নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী। তুমি পাগল নাকি? ছি ছি। ওরূপ কথা মুখে আনিও না। কুচরিত্রা স্ত্রীলোকদিগের মনে এ'রূপ বাসনা হয়। ছি ছি, ওরূপ কথা মুখে আনিও না।"

হিরণ্ময়ী উত্তর করিলেন,—"তাহাতে দোষ কি? মেয়েরা ত পাঁচজনের সমক্ষে গান গাইয়া ও নাচিয়া থাকেন, তা বলিয়া তাঁহারা কি অসতী? লোকের একটা গুণ থাকিলে পাঁচজনকে দেখাইতে ইচ্ছা হয়।"

নবীন হিরণ্ময়ীতে আচ্ছন্ন। নবীন অন্ধ, উন্মত্ত, নবীন চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছুদিন পরে হিরণ্ময়ীর একটি পুত্র সন্তান হইল। সকলে ভাবিলেন, এইবার হিরণ্ময়ী ধীর ও শান্ত হইবেন। অপত্য স্নেহে তাঁহার চপলতা দূর হইবে। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। সন্তানের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহের উদয় হইল না। সন্তানের তিনি ঘোরতর অযত্ন করিতে লাগিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া, নবীনের মাতা নিজে ছেলেটিকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ছেলেটির নাম সকলে সুধীর রাখিলেন।

৩। গবেশচন্দ্র

ধর্ম কথা যে হিরণ্ময়ী জানিতেন না, তাহা নহে। প্রতিবাসীদিগের জামাতা আসিলে তাহাদের নিকট তিনি কত ধর্মকথা বলিতেন, কত সৎ-উপদেশ দিতেন। সেই বিদেশীয় লোকেরা অনেকেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইতেন। তাঁহারা বলিতেন,—"আহা! এই স্ত্রীলোকটি সাক্ষাৎ সরস্বতী। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি ধীর, তেমনি মিষ্ট কথা, তেমনি ধর্মজ্ঞান। নবীন বাবুর কি সৌভাগ্য যে, এই অমূল্য নারী রত্ন তিনি লাভ করিয়াছেন।"

কিন্তু সকল জামাতার নিকট হিরণ্ময়ী যশ লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ধর্মকাহিনী ভেদ করিয়া কেহ কেহ তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই লজ্জাবনত মুখে ঈষৎ চপলতার লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই অর্ধমুদিত ঘন পল্লব বেষ্টিত উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ের কোণ হইতে আড়-দৃষ্টি নিরিক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, "এই স্ত্রীলোকটিকে সহসা দেখিলে লক্ষ্মীরূপিণী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। একটু বুঝিয়া দেখিলে ইহাকে রাক্ষসপুরীর বারবিলাসিনী নারীরূপে জ্ঞান হয়। তাই এত রূপ, তাই এত কপটতা। এ স্ত্রীলোকটা সৎকুলেই জন্ম লইয়া থাকুক, সদ্বংশেরই কুলবধূ হউক, আর রাজরানী হউক, পরিণাম ইহার অতি শোচনীয় হইবে।" আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসীদিগেরও সেই মত। তাঁহাদিগের নিকট হিরণ্ময়ীর ধর্মকথা অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। 'হিরণ্ময়ীর "ছোঁক ছোঁক" চঞ্চলভাব দেখিয়া সকলে কখনও তাঁহাকে পাগল মনে করিতেন, কখনও তাঁহার দুরভিসন্ধির আশঙ্কা করিতেন। বিনুর মা আড়ালে বলিতেন,—"বৌটার ভাব যেন সদাই কারে খাই—কারে খাই, কারে গিলি—কারে গিলি।"

সুলোক কুলোক সকল স্থানেই আছে। কুলোক থাকুক তাহাতে ক্ষতি নাই। স্ত্রীলোক যদি আপনার মান মর্যাদা, ধর্মকর্ম, লজ্জা সরম বজায় রাখিয়া চলিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে দেখিয়া মনে ভক্তির উদয় হয়, তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে সহসা কাহারও সাহস হয় না। স্ত্রীলোকের

হাবভাবে চঞ্চলতা থাকিলেই বিপদ। তখন তাহার একখানি দোষ দশখানি হইয়া উঠে। হিরণ্ময়ীর তাহাই হইল। ক্রমে হিরণ্ময়ীর কুযশ চারিদিকে রটিল। মন্দ লোকেরা হিরণ্ময়ীর প্রতি কুদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। কিন্তু হিরণ্ময়ীর শ্বশুর বড় মানুষ। সহসা কেহ হিরণ্ময়ীকে প্রণয় ডোরে বাঁধিতে সাহস করিল না।

গ্রামবাসী গবেশচন্দ্রের সে ভয় ছিল না। গবেশের মান অপমানের ভয়ও ছিল না। গবেশ চিরকালই হিরণ্ময়ীর শ্বশুরের বিরোধী। মামলা, মকদ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দলাদলি সকল কার্যেই গবেশ হিরণ্ময়ীর শ্বশুরের বিপক্ষ। গ্রামের দুষ্টগণ সকলেই এই গবেশের দলে। সে নিমিত্ত গবেশকে সকলে ভয় করিয়া চলিতে হইত। গবেশ হিরণ্ময়ীর প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। গবেশ ভাবিলেন,—স্ত্রীলোকটার যেরূপ চাল-চলন দেখিতে পাই, তাহাতে ইহাকে বশ করা কঠিন কথা নয়। আমি দেখিতে মন্দ নই। বয়স আমার অধিক হয় নাই। গোটাকত ভাসা ভাসা ধর্মকথা, তাহার সহিত দুই চারিটা প্রেমের কথা ও প্রেমের গান মিশাইয়া দিলেই এই হিতাহিত জ্ঞান রহিত স্ত্রীলোকটী আমার পদানতা হইয়া পড়িবে। এখন বেটীর সঙ্গে দেখা করি কি করিয়া?" গবেশের এই ভাবনা হইল। হিরণ্ময়ীকে একখানি চিঠি দিবার নিমিত্ত তিনি সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। মাসের পর মাস গত হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু হিরণ্ময়ীকে চিঠি লিখিতে গবেশ কোন সুযোগ পাইলেন না। চাকর-চাকরাণীকে বশ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহাতেও কৃতকার্য হন নাই। বিন্দুর মাকেও বলিয়া দেখিলেন। বিন্দুর মা সাহস করিলেন না।

একদিন প্রাতঃকালে নিকটস্থ একখানি গ্রাম দিয়া গবেশ যাইতেছিলেন। পৌষ মাস, দারুণ শীত, ছেলেরা এক প্রকাণ্ড আগুন করিয়াছে, তাহার চারিধারে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে। ছেলেদের সঙ্গে একজন লম্বা-চওড়া মোটা বলবান পুরুষ বসিয়া আগুন পোহাইতে ছিলেন। সেই পুরুষের মুখখানি গুরু-গম্ভীর, অভিমানে পূর্ণ, অহঙ্কারে মটঃ মটঃ। একটি ছেলে হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"ভাই। এই পৌষ মাসের সকালে আমরা সকলেই শীতে কাঁপিতেছি। কিন্তু কর্তার শীত নাই। কর্তা যদি মনে করেন, তাহা হইলে, এক্ষণি পানাপুকুরে ডুব দিয়া আসিতে পারেন।" সেই পুরুষটাকে গ্রামের

সকলে কর্তা বলিয়া ডাকে। কারণ, তাঁহাকে একটু ফুলাইয়া দিলেই তিনি সকল কাজ করিতেই প্রস্তুত। ছেলেটির সেই কথা শুনিয়া কর্তা বাজখাই স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গামছা আছে?" ছেলেরা অমনি সব বলিয়া উঠিল,—"হাঁ আছে বৈ কি?" অমনি একটি ছেলে আপনার বাড়ী দৌড়িয়া গেল, আর নিমিষের মধ্যে একখানি গামছা লইয়া আসিল। কর্তা সেই গামছাখানি পরিয়া নিকটস্থ একটি পানাপুকুরে গিয়া ডুব দিলেন। ছেলেরা সব হাততালি দিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কর্তা উপরে উঠিয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। কত চেষ্টা করিলেন কিন্তু কাঁপুনিটা নিবারণ করিতে পারিলেন না। পাছে ছেলেদের কাছে বাহাদুরটুকু যায়, তাই কাজেই তাঁহাকে বলিতে হইল,—"একটু কাঁপি, কিন্তু শীত করে না।" গবেশ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া এই রহস্য আগা-গোড়া দেখিলেন।

আর একদিন বৈকাল বেলা গবেশ সেই গ্রাম দিয়া যাইতেছিলেন। ছেলেরা একটি মৌচাক ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছিল। প্যাঁকাটি জ্বালিয়া কত কি করিয়া তাহারা মাছি তাড়াইতেছিল। কিন্তু মৌমাছি পালাইতেছিল না। এমন সময় কর্তা আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একটি ছেলে বলিয়া উঠিল,—"ভাই। আমরা কত কাণ্ড করিতেছি, তবু চাক ভাঙ্গিতে পারিতেছি না। কর্তা যদি মনে করেন, তাহা হইলে এখনি প্রাচীরে উঠিয়া হাত দিয়া চাকটি ভাঙ্গিয়া আনিতে পারেন। বাজখাই আওয়াজে কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মই আছে?" অমনি সকলে বলিয়া উঠিল, "হাঁ আছে বৈ কি।" অমনি দুই চারিজন দৌড়িয়া গিয়া একজনদের বাড়ী হইতে একখানি মই লইয়া আসিল। কর্তা মই দিয়া প্রাচীরে উঠিলেন। প্রাচীরের গর্তে হাত দিয়া চাকটি ভাঙ্গিলেন। চাকটি হাতে লইয়া আস্তে নামিয়া আসিলেন। চাক ভাঙ্গিবার সময় মৌমাছিতে তাঁহাকে চারিদিকে ধরিয়াছিল, সর্বশরীরে হুল ফুটাইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল। কর্তার মুখে কিন্তু কথা নাই। একবার উঃ কি আঃ কিছুই করিলেন না। কিন্তু সর্বশরীর ফুলিয়া উঠিল, সেটি লুকাইতে পারিলেন না। পাছে তাহাতে বাহাদুরি কিছু কম হয়, সেইজন্য আপনার গা পানে চাহিয়া ছেলেদের বুঝাইয়া দিলেন,—"ফোলে জলে না।"

সেইস্থানে দাঁড়াইয়া গবেশ সমস্ত ব্যাপার দেখিলেন। গবেশ ভাবিলেন, এ রহস্য মন্দ নয়। বুঝিলেন, এই কর্তা একটি মহাপুরুষ, ইহার দ্বারা তাঁহার

কার্য সাধন হইবে। কর্তাকে নিকটে ডাকিয়া গবেশ বলিলেন,—মহাশয় দেখিতেছি অতি বীরপুরুষ। ভয়-ডর আপনার কিছুই নাই। পৌষ মাসের প্রাতে পানাপুকুরে ডুব দিলে আপনার শরীর কাঁপে। কিন্তু শীত করে না। মৌমাছির হুলে আপনার সর্ব শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইলে কেবল ফুলিয়া উঠে, কিছু মাত্র জ্বালা করে না। এত দেশ বেড়াইলাম, এত লোক দেখিলাম, কিন্তু আপনার মত মহাপুরুষ কখনও দেখি নাই।—অপরাধ লইবেন না, জিজ্ঞাসা করায় কোন দোষ নাই,—বলি, মহাশয়ের গাঁজাটা-আসটা খাওয়া আছে কি ?"

মৌমাছির হুলে তো ফুলিয়াছিলেন বটেই কিন্তু গবেশের প্রশংসায় কর্তা আরও ফুলিয়া উঠিলেন। অহঙ্কারে তাঁর আর মাটিতে পা পড়ে না। কর্তা উত্তর করিলেন,—গাঁজা। গাঁজা তো প্রতিদিন খাই-ই, না খাইলে চলে না। তার উপর যেদিন আরটা জোটে, তাও খাই। নেশার দ্রব্য ছাড়িতে নিষেধ।"

গবেশ বলিলেন,—"তা বটে, তা বটে, নেশার দ্রব্য ছাড়িতে নিষেধ। কৈলাসে সেই যে গায়ে ছাই মাখিয়া, হাড়ের মালা গলায় দিয়া, কানে ধুতরা ফুল গুজিয়া, ষাঁড়ের উপর শিব বসিয়া আছেন, তাঁর অপমান করা হয়। নেশার দ্রব্য ছাড়িলে ঘোর পাপ হয় আপনি আমার সহিত আসুন। নেশা করিয়া আপনাকে একটি কর্ম করিতে হইবে। আপনি ভিন্ন সে কার্য আর কেহ করিতে পারিবে না।"

আনন্দিত মনে গবেশের সহিত কর্তা চলিলেন। নিমগ্রামে উপস্থিত হইয়া গবেশ কর্তার নিমিত্ত নানারূপ নেশার দ্রব্য আয়োজন করিয়াছিলেন। কর্তা মনের সুখে পেট ভরিয়া নেশা করিলেন।

অবশেষে কি কার্য করিতে হইবে, গবেশ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। হিরণ্ময়ীদের বাটী দেখাইলেন। হিরণ্ময়ীদের খিড়কি দেখাইলেন। খিড়কীতে বাগান। বাগানটি চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের মাথায় বোতলকুচিসন্নিবেশিত। প্রাচীরের বাহিরে দুইজনে একটি উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন সেখান হইতে হিরণ্ময়ীর ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ঘর কর্তাকে দেখাইয়া দিলেন।

গবেশ বলিলেন,—কি উৎকট কার্য সাধন করিতে হইবে, এখন আপনাকে বলি। এই প্রাচীরটি আপনাকে লঙ্ঘন করিতে হইবে। তাহার পর ঐ যে

ঘর দেখিতেছেন, ঐ ঘরের নিকট যে আম গাছটি আছে, তাহার উপর আপনাকে উঠিতে হইবে। ঐ আম গাছের নিকট দোতালায় যে জানালা রহিয়াছে, তাহা দিয়া ঐ ঘরের ভিতর একখানি চিঠি ফেলিয়া দিতে হইবে। ঐ ঘরে একটি স্ত্রীলোক বাস করে। সন্ধ্যাবেলা তাহার স্বামী ঘরে থাকে না। সন্ধ্যাবেলা চিঠি ফেলিতে হইবে।”

কর্তা দেখিলেন, কার্যটি অসম সাহসী বটে। কিন্তু দুরূহকার্যে কর্তা কখনও পরাঙমুখ হন না। কর্তা সম্মত হইলেন। তাহার পরদিন সমুদয় আয়োজন হইল। সন্ধ্যার পর মই দিয়া কর্তা প্রাচীরের উপর উঠিলেন। একখানি কম্বল অনেকবার পাট করিয়া বোতল কুচিতে ঢাকা দিলেন। দড়ি ধরিয়া প্রাচীর হইতে হিরণ্ময়ীদের খিড়কির বাগানে গিয়া নামিলেন। তাহার পর সেই আম গাছে গিয়া উঠিলেন। আম গাছ হইতে জানলা দিয়া হিরণ্ময়ীর ঘরে গবেশের চিঠিখানি ফেলিয়া দিলেন। চিঠি ফেলিয়া পুনরায় সেই প্রকারে ফিরিয়া আসিলেন।

গবেশের চিঠিখানি অতি সুদীর্ঘ। তাহাতে প্রথম ঈশ্বরের নানারূপে স্তুতিবাদ ছিল, তাহার পর হিরণ্ময়ীর অতুল সৌন্দর্যের প্রশংসা ছিল, তাহার পর দুই একটা প্রেমের গান ছিল, অবশেষে গবেশের মনের কথা ছিল। গবেশের মনের কথা এই যে তিনি হিরণ্ময়ীর রূপগুণে একবারে মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রেমময়ী হিরণ্ময়ীর সহিত একবার সাক্ষাৎ না হইলে তিনি বিষ খাইয়া মরিবেন, না হয় জলে ডুবিয়া মরিবেন, যাহা হউক একটা কাণ্ড করিবেন। এ কথাও গবেশ লিখিয়াছিলেন যে, যে লোক আজ এই চিঠি দিল, কাল সে পুনরায় আর একখানি চিঠি লইয়া যাইবে। পত্রের প্রত্যুত্তর সেই লইয়া আসিবে। হিরণ্ময়ী যদি পত্রে ঢিল বাঁধিয়া নীচে ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে সেই লোক কুড়াইয়া লইয়া আসিবে। এই পত্রের প্রতীক্ষায় গবেশ কেবল প্রাণ রাখিলেন, তা' না হইলে কোনকালে আত্মহত্যা করিয়া বসিতেন।

সন্ধ্যার পর খাটে শুইয়া হিরণ্ময়ী গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছিলেন। হঠাৎ উহার ঘরের ভিতর একখানি কাগজ আসিয়া পড়িল। হিরণ্ময়ী প্রথম ভাবিলেন বাতাসে বুঝি কাগজখানি ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিল। কিন্তু তখন সেরূপ বাতাস ছিল না। তাই তিনি উঠিয়া কাগজখানি তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন যে, একখানি চিঠি, আলোর নিকট যাইয়া চিঠিখানি পড়িলেন। পড়িয়া প্রথম তাঁহার রাগ হইল। তাহার পর ভয় হইল। আর দুই একরূপ

পড়িয়া ক্রমে তাঁহার মন ভিজিয়া আসিল। কারণ পত্রখানিতে অনেক ঈশ্বরের স্তুতিবাদ ছিল, অনেক ধর্ম কথা ছিল। হিরণ্ময়ী ভাবিলেন,—"লোকটি দেখিতেছি অতি পবিত্র চরিত্র, ধার্মিক, কেবল ধার্মিক নয়, আবার প্রেমিক, বিশুদ্ধ পবিত্র প্রেমের মর্ম অবগত আছে।"

অনেকদিন ধরিয়া হিরণ্ময়ী এইরূপ পবিত্র প্রেমের জন্য লালায়িত ছিলেন। তাই তিনি ছোঁক্ ছোঁক্ করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু পৃথিবী অতি ভয়ঙ্কর স্থান। পবিত্র প্রেম এখানেও অতি দুর্লভ। মনের মত পবিত্র প্রেমিক লোক তিনি এ পর্যন্ত খুঁজিয়া পান নাই। তাই, তাঁহার প্রাণে সুখ ছিল না। তাঁহার খাইয়া সুখ ছিল না, বসিয়া সুখ ছিল না, কিছুতে সুখ ছিল না। নবীনকে লইয়া কি পরিতৃপ্তি হয়? নবীন কেবল খবরের কাগজ ও পুস্তক লইয়া থাকে। না জানে গান, না জানে বাজনা। না জানে প্রেমের কথা, না জানে রসের কথা। হিরণ্ময়ীর মন এতদিন তাই আঁধার হইয়াছিল। আজ সেই আঁধার মনে আলো, দেখা দিল, উষর জীবনে রস সঞ্চিত হইল। হিরণ্ময়ীর রূপ গুণ আজ সার্থক হইল। অন্ধ নবীন তাহার মর্ম কি জানে? সেইরূপ গুণের প্রশংসা করিতে আজ তিনি একজন যথার্থ প্রেমিক পুরুষ পাইলেন।

তাহার পরদিন ঈশ্বরের স্তুতি পরিপূর্ণ, সাধু ভাব পরিপূর্ণ, নিস্বার্থ প্রেমকথা পরিপূর্ণ গবেশকে হিরণ্ময়ী একখানি পত্র লিখিলেন। সন্ধ্যার সময় কর্তা আসিয়া গবেশের আর একখানি পত্র হিরণ্ময়ীর ঘরে ছুড়িয়া ফেলিলেন। আর সেই সময় হিরণ্ময়ীও আপনার পত্রখানিতে ঢিল বাঁধিয়া নীচে ফেলিয়া দিলেন। কর্তা আম গাছ হইতে নামিয়া সেই পত্রখানি কুড়াইয়া লইলেন। এইরূপে প্রতিদিন চিঠি লেখালেখি হইতে লাগিল। পত্রে ক্রমে ঈশ্বরের মহিমা গান কম হইয়া আসিল। পত্রগুলি কেবল প্রেমের কথায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। হিরণ্ময়ী বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিল, অবশেষে গবেশ সেই প্রস্তাব করিলেন। হিরণ্ময়ী সম্মত হইলেন। কিছুদিন সেই পরামর্শ চলিতে লাগিল। ক্রমে সব ঠিক হইল। কোনদিন, কখন, কিরূপে বাটী হইতে বাহির হইবেন, সকল কথা স্থির করিয়া হিরণ্ময়ী গবেশকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানির প্রথমেই এই কয়টি কথা ছিল,

"সঁপিনু তোমার পায়ে প্রাণ।
যায় যাক্ জাতি কুল মান॥"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় কর্তা আসিলে, হিরণ্ময়ী পূর্বমত পত্রখানিতে ঢিল

বাঁধিয়া উপর হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। আজ সেই সময় হিরণ্ময়ীর একটু হাত কাঁপিল। কর্তা আমগাছ হইতে নীচে নামিয়া পত্র খুঁজিতে লাগিলেন। আশ্চর্য! আজ চিঠি কোথায় গেল? কর্তা চারিদিক খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, চিঠি আর কিছুতেই পান না। এমন সময় খিড়কির বাগানে কে যেন আসিতেছে, এইরূপ সাড়া পাইলেন। আর অধিক খুঁজিবার অবসর হইল না। কর্তা শীঘ্র বাগান হইতে পালাইয়া গেলেন।

৪। বোকেন্দ্র

জ্যৈষ্ঠ মাস। সে বৎসর ভাল আঁব হয় নাই। হিরণ্ময়ীর জানালার কাছে যে আঁব গাছটি ছিল, তাহাতে গুটিকত আঁব হইয়াছিল। হিরণ্ময়ীর শ্বশুর সেই আঁবগুলি গনিয়া রাখিয়াছেন, পাকিলে প্রথমে ঠাকুরদের দিবেন, এই মানসে মাঝে মাঝে আসিয়া সেই আঁবগুলির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন। যে রাত্রিতে কর্তা পত্র খুঁজিয়া পাইলেন না, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে হিরণ্ময়ীর শ্বশুর সেই আঁবগাছ তলায় দাঁড়াইয়া আঁব দেখিতেছিলেন। একটি বড় আঁবের বোঁটা হইতে একগাছি সূতা ঝুলিতেছে দেখিতে পাইলেন। সূতা গাছটির একদিকে একটি ঢিল বাঁধা, অপরদিকে একখানি কাগজ। হিরণ্ময়ীর শ্বশুর ভাবিলেন, আঁব পাড়িবার নিমিত্ত কে ঢিল মারিয়াছিল, কিন্তু ঢিলটি ছোট ও সূতায় বাঁধা, আবার তার সঙ্গে কাগজ, কিছুই বুঝিতে পারেন না। একজন চাকরকে তিনি বলিলেন,—"দেখ তো রে। আঁবের বোটায় ও কি রহিয়াছে?" চাকর গাছে উঠিয়া ঢিল সহিত চিঠিখানি পাড়িয়া আনিল। হিরণ্ময়ীর শ্বশুর দেখিলেন যে, চিঠিখানি গবেশের নামে। চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলেন। চিঠি দেখিয়া তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। তাঁহার গা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। তিনি সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। চাকরকে বলিলেন,—"সহসা আমার শরীর বড় অসুস্থ হইল, তুই আমাকে বাতাস কর্।"

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, হিরণ্ময়ীর শ্বশুর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন ও নবীনকে ডাকিতে পাঠাইলেন, নবীন আসিলে তাঁহার হাতে চিঠিখানি দিলেন। চিঠি পড়িতে পড়িতে নবীনের দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। চিঠি পড়া হইলে পিতা বলিলেন,—"নবীন! কুলাঙ্গারী পাপিয়সীকে আর ঘরে

রাখা হইবে না, স্ত্রী-হত্যা করিব না। পাপিনীর মুখে চুণ-কালি দিয়া এই মুহূর্ত্তে বাড়ী হইতে দূর কর।"

নবীন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, নীরবে কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "বাবা। হিরণ্ময়ী সামান্য অবোধ স্ত্রীলোক বুঝিতে পারে নাই, না বুঝিয়া একটা কুকাজ করিয়া ফেলিয়াছে। এবার তাহাকে ক্ষমা করুন। এখনও সে অসতী হয় নাই। আমরা যদি এখন তাহাকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে তাহার দুর্দশার আর পরিসীমা থাকিবে না। সে দুর্দশার কথা ভাবিলে প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে। আমি কি করিয়া তাহাকে পথে দাঁড় করাই? তাই বলি, বাবা, এবার হতভাগিনীকে আপনি ক্ষমা করুন।"

নবীনের পিতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। হিরণ্ময়ীকে তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে দূর করিতে বারবার আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। বাপের পায়ে ধরিয়া নবীন কত মিনতি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি হিরণ্ময়ীকে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

সবশেষে নবীন বলিলেন,—হিরণ্ময়ীকে যদি একান্তই আপনি বাড়ী হইতে দূর করিবেন, তবে আমিও সেই সঙ্গে আপনার বাড়ী হইতে দূর হইব। সংসারের এই অকূল সমুদ্রে হিরণ্ময়ীকে আমি ভাসাইতে পারিব না।

ক্রোধে তাঁহার পিতা উত্তর করিলেন,—"এই দণ্ডেই। এইরূপ পাপিয়সী কুল-কলঙ্কিনীকে যে স্ত্রী বলিয়া ভাবিতে পারে, সেরূপ পুত্রের মুখ দেখিতে আমি চাহি না। কেবল তুমি কেন? তোমার ঐ ছেলেটাকেও লইয়া আমার বাড়ী হইতে দূর হও। আজ হইতে জানিলাম যে, আমি নির্বংশ হইয়াছি।"

নবীনের মাতা কত কাঁদিলেন। নবীনকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার পিতার রাগ শীঘ্রই পড়িয়া যাইবে, তিনি সব ক্ষমা করিবেন। কিন্তু নবীন বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, সে রাগ আর পড়িবার নয়, হিরণ্ময়ীর এ দোষ ক্ষমা হইবার নয়। স্ত্রী ও পাঁচ বছরের শিশু সুধীরকে লইয়া তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। হিরণ্ময়ীর গহনা প্রভৃতি যাবতীয় বস্ত্র তিনি ছাড়িয়া আসিলেন। পৈত্রিক এক কণামাত্র বস্তুও তিনি সঙ্গে লইবেন না।

নবীনের পিতা অল্পদিন পরে সমুদয় বিষয় বিভব বিক্রয় করিয়া সপরিবারে কাশী যাইলেন। লজ্জায় ঘৃণায় মনোদুঃখে তাঁহাদের শীঘ্রই মৃত্যু হইল। দেব-সেবার নিমিত্ত সমুদয় টাকা তাঁহারা নিয়োজিত করিয়া যাইলেন। পৈতৃক সম্পত্তির নবীন একটি পয়সাও পাইলেন না।

বাটী হইতে বাহির হইয়া নবীন যে কোথায় যাইবেন, তাহা স্থির করিতে পারেন না। তাঁহার শ্বশুর বাড়ীতে আর এখন কেহ নাই। নিধিরামের পরলোক হইলে অল্পদিন পরে এককড়ির মৃত্যু হইল। তাহার পর তাঁহার শিশু সন্তানটিও গেল। অবশেষে হিরণ্ময়ীর মাতারও পরলোক হইল। সে ভিটায় এখন আর কেহ নাই।

পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিবেন এই মানসে নবীন কলিকাতায় আসিলেন। সামান্য একটি বাসা ভাড়া করিয়া সেই স্থানে বাস করেন, আর সমস্ত দিন কর্মকাজের নিমিত্ত ঘুরিয়া বেড়ান। যৎকিঞ্চিৎ নবীনের হাতে যে টাকা ছিল ও কলিকাতায় আসিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু তিনি উপার্জন করিলেন, তাহা দ্বারাই অতি কষ্টে দিনপাত হইতে লাগিল। সুধীর অতি আদরের ছেলে। পিতামহ পিতামহী তাহাকে অতি যত্নে লালনপালন করিতেছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া সুধীরের আর সে যত্ন নাই। একে খাইবার থাকিবার কষ্ট, তাহার উপর আবার হিরণ্ময়ীর মায়ামমতার অভাব। সুধীরের প্রথম জ্বর হইল। সেই জ্বর প্লীহা যকৃতে পরিণত হইল। নবীন যথাসাধ্য ডাক্তার দেখাইলেন, বৈদ্য দেখাইলেন। কিছুতেই কিছু হইল না।

দুঃখে পড়িয়া হিরণ্ময়ীর আচরণ কিছুমাত্র সংশোধিত হইল না। আমোদ প্রমোদ, রস-রঙ্গের ইচ্ছা তাঁহার মনে বরং আরও বলবতী হইল। তাঁহাদের বাসার নিকট একটি স্ত্রীলোকের বাড়ী ছিল। এই বাটীতে একটি পুরুষ আসিয়া মাঝে মাঝে হারমোনিয়ম বাজাইতেন। জানালা দিয়া হিরণ্ময়ী দেখিতেন, আর প্রাণ ভরিয়া হারমোনিয়মের ধ্বনি শ্রবণ করিতেন।

হিরণ্ময়ী "বীরাঙ্গনা" কাব্য পড়িয়াছিলেন। তিনি একজন বীরাঙ্গনা হইবেন, তাঁহার মনে এই সাধ হইল। সেইভাবে সেই অজানিত পুরুষকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি বড়, তবে তাহার সারমর্ম এই,—"তোমার মধুর বাক্যে আমার মন মোহিত হইয়াছে। আমি পাগলিনী, উদাসিনী, প্রেম ভিখারিণী হিরণ্ময়ী। তোমার নিকট আমি প্রেম ভিক্ষা করিতেছি। প্রেমদান করিয়া আমার প্রাণ তুমি পরিতোষ কর।" অবশ্য হিরণ্ময়ী পবিত্র প্রেম ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যেমন হিরণ্ময়ী পবিত্র প্রাণ, সেই লোকটিও সেইরূপ পবিত্রপ্রাণ। বিশেষতঃ তাঁহার দয়ার শরীর। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ হিরণ্ময়ীকে পবিত্র প্রেমদান করিলেন। প্রতিদিন নবীন বাটী হইতে বাহির হইলে

হিরণ্ময়ী সেই স্ত্রীলোকের বাটীতে গমন করেন। সেস্থানে সেই লোকটির সহিত সাক্ষাৎ হয়। সুবিধা পাইলে সেলোকটিও কথন কথন হিরণ্ময়ীর বাটীতে শুভাগমন করেন।

পবিত্র প্রেম কিনা? বলিতে দোষ কি? একদিন হিরণ্ময়ী অতি সোহাগে নবীনকে বলিয়া ফেলিলেন,—"দেখ, এই পাশের বাটীতে একটি স্ত্রীলোক থাকে। অতি সচ্চরিত্রা, অতি ধীর, অতি ভাল স্ত্রীলোক।

আর তাঁহার বাটীতে একটি বাবু আসেন, তাঁর নাম বোকেন্দ্র। তিনি যে কি ভদ্র, আর কত ভাল, তা আর তোমাকে কি বলিব? তাঁর মুখে সদাই ধর্ম কথা। আমাকে তিনি সদুপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁর গল্প শুনিতে আমি বড় ভালবাসি। তিনি আমাকে বাজনা শিখাইবেন বলিয়াছেন। তিনি আমাকে বড় স্নেহ করেন।

নবীন এই কথা শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী, বল কি? তুমি কি লজ্জা শরমের মাথা একবারে খাইয়াছ? হিতাহিত জ্ঞান কি তোমার একেবারে নাই? পিতৃ আজ্ঞা অমান্য করিয়াছি, আমার কপালে যে কি আছে, তা বলিতে পারি না। খবরদার, খবরদার। আর ঐ স্ত্রীলোকের বাটীতে যাইও না। বোকেন্দ্রের সহিত আর সাক্ষাৎ করিও না, তাহা হইলে তোমার মান সম্ভ্রম, ইহকাল পরকাল সব নষ্ট হইবে।"

হিরণ্ময়ী স্বামীর নিকট বার বার ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, স্ত্রীলোকটির বাটীতে আর তিনি যাইবেন না। আর তিনি কখনও বোকেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।

তাহার পরদিন নবীন বাটী আসিয়া দেখিলেন যে, ঘরে একখানি উত্তম বোম্বাই সাড়ী রহিয়াছে, নবীন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"টাকা কোথায় পাইলে?" হিরণ্ময়ী উত্তর করিলেন,—"এখন ধারে কিনিয়াছি, পরে টাকা দিলে চলিবে।" নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী। একাজ তুমি ভাল কর নাই। দেখিতেছ, এখন আমার কিরূপ দুঃসময়, এ সময় কি কোন মূল্যবান দ্রব্য কিনিতে আছে?"

দুই একদিনে নবীন জানিতে পারিলেন যে, হিরণ্ময়ী সে সাড়ী ক্রয় করে নাই। বোকেন্দ্র তাঁহাকে সেই সাড়ী দিয়াছে। সেই কথা শুনিয়া নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী। আর আমার সহ্য হয় না। পিতৃ অভিশাপ এইবার ফলিল, তুমি এই মুহূর্তে ও সাড়ী ফিরাইয়া দাও।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন,—“আমি একদিন একদিন গঙ্গা স্নান করিতে যাই। যখন আমি গাড়ীতে চড়ি, তখন আমার রূপ দেখিয়া রাস্তায় কাতার দিয়া লোক দাঁড়ায়। সে সময় সামান্য একখানি বিলাতি কাপড় পরিয়া আসিতে আমার লজ্জা করে। তুমি আমাকে এইরূপ একখানি বোম্বাই সাড়ী কিনিয়া দাও, তাহা হইলে এখনই আমি বোকেন্দ্রর সাড়ী ফিরাইয়া দিতেছি।”

নবীন আর কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার মনে বড় ধিক্কার জন্মিল। এইবার সংসারের প্রতি তাঁহার ঘৃণা হইল। এখন কেবল সুধীরের জন্য তিনি সংসারে রহিলেন। সুধীর একটু সুস্থ হইলে, তাহাকে লইয়া অতি দূরদেশে গিয়া একবারে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবেন, মনে মনে এই সঙ্কল্প করিলেন। হিরণ্ময়ী গুপ্তভাবে বোকেন্দ্রের নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলেন। দুই তিনদিন তাঁহার সহিত গাড়ী চড়িয়া সহরে বেড়াইতেও গিয়াছিলেন।

৫। সুধীর

সুধীরের পীড়া উপশম হইল না। সুধীর ক্রমে নির্জীব হইয়া পড়িতে লাগিল। নবীন দেখিলেন যে, সুধীরের আর রক্ষা নাই। সুধীরের শোকে তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন।

একদিন প্রাতঃকালে সুধীর বলিল,—“বাবা, আজ আর তুমি বাহিরে যাইও না। আজ আমার শরীর ভাল নাই। বুকের ভিতর কিরূপ করিতেছে। প্রাণ ভরিয়া আমি নিশ্বাস লইতে পারিতেছি না।”

নবীন দেখিলেন যে, সুধীরের আসন্নকাল উপস্থিত। চক্ষের জল কোনরূপে সম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন,—“না বাবা। আজ আমি বাহিরে যাইব না। আজ আমি তোমার কাছে বসিয়া থাকিব। সুধীর, বাবা, তোমার কি কিছু খাইতে সাধ হয়? কুপথ্যই হউক আর সুপথ্যই হউক, আজ তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে খাইতে দিব।”

সুধীর উত্তর করিল,—“না বাবা, আর আমার কোন জিনিষ খাইতে সাধ নাই। যখন বৈদ্যের ঔষধ খাইতেছিলাম, তখন, বাবা, বড় ক্ষুধা ছিল। একদিন পেট ভরিয়া ভাত খাইতে তখন বড় সাধ হইত। এখন আর সে ক্ষুধা নাই, সে সাধ নাই। শোরে করিয়া তোমরা আমাকে দুটি ভাত বাঁধিয়া দিতে। তাহাতে বাবা, আমার পেট ভরিত না, কিছুই হইত না। সব ভাতকটি খাইয়া

পাতের চারিদিকে খুঁজিয়া দেখিতাম, যদি একটিও ভাত কোথায়ও পড়িয়া থাকে। কোনও দিন একটি আধটি পাইতাম, কোনদিন, বাবা, একেবারেই পাইতাম না। পাথরটি আঙুল দিয়া কতবার চাটিতাম। খাওয়া হইয়া যাইলেও কতক্ষণ পর্যন্ত পাতের নিকট বসিয়া থাকিতাম। পাত ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা করিত না।" মায়ের পানে চাহিয়া পুনরায় সুধীর বলিলেন,—"মা, তুমি একটু ওঘরে যাও, বাবার সঙ্গে আমার চুপি চুপি কথা আছে। তুমি এখানে থাকিলে আমি বলিব না।"

হিরণ্ময়ী অন্য ঘরে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নবীন তাঁহাকে বলিলেন,—"যাও এখনি ওঘরে যাও। এ সময় সুধীরের বাক্য শুনিবার তুমি উপযুক্ত পাত্রী নও।" হিরণ্ময়ী উঠিয়া অপর ঘরে যাইলেন।

তখন সুধীর বলিল,—"বাবা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমি কি এই মায়ের পেটে জন্মিয়াছি?"

নবীন উত্তর করিলেন,—"হাঁ বাবা। উনিই তোমার গর্ভধারিণী।"

সুধীর বলিল,—"তবে। বাবা, আমার মা অমন কেন? আর আর ছেলেদের মা তো এরূপ নয়। মা মা বলিয়া আর সব ছেলেরা যখন বাড়ী যায়, তখন তাদের মায়েরা তাদের কোলে করিয়া কত মিষ্ট কথা বলে। আমার মা আমাকে কেবল দূর-ছাই করেন। আমি মনে করি, আমি বুঝি দুষ্ট ছেলে, ভাল ছেলে নই, তাই আমি মায়ের আদর পাই না। তা, বাবা, আমি তো কখনও দোষ করি নাই। তোমরা যা বল, তাই তো আমি শুনি। ঠাকুরদাদা ঠাকুর মা তো আমাকে খুব ভালবাসিতেন। তুমি তো আমাকে খুব ভালবাসো আর সকলে তো আমাকে খুব ভালবাসে। কেবল মা-ই কেন আমাকে ভালবাসেন না? সেই পোরের ভাত যখন ফুরাইয়া যাইত, পাত ছাড়িয়া যখন যাইতে মায়া হইত, পাতের নিকট অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতাম, তখন মা আসিয়া আমাকে মারিতেন। দেখ দেখি বাবা, আমার শরীরে এখন আর কি আছে? হাড় কয়খানি কেবল একটু চামড়া দিয়া ঢাকা আছে। ইহার উপর মা আমাকে মারিতেন, আমার হাড়ে বড় লাগিত। এক একদিন, মা আসিয়া জোর করিয়া আমাকে নড়া ধরিয়া তুলিতেন। তিন চারিদিন আমার হাতে ব্যথা থাকিত। সে সব মনে করিলে, বাবা কান্না পায়।"

সুধীর কাঁদিতে লাগিল। নবীনও কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে

চক্ষু মুছিয়া নবীন বলিলেন,—"সুধীর চুপ কর, আর কাঁদিও না। যাহাতে তোমাকে আর কখনও কেহ না মারে তাহা আমি করিব।"

সুধীর একটু হাসিয়া বলিল,—"পাঁচ বৎসর পার হইয়া আমি ছয় বৎসরে পড়িয়াছি বুঝি? কিন্তু বাবা, আজ আর আমি ছেলে মানুষ নই, মা আর আমাকে মারিবেন না; তাহা আমি জানি। কেন, তাও জানি। আজ আমার কত কি মনে আসিতেছে। চক্ষু বুজিলে আজ আমি কত কি দেখিতেছি। রও, একবার চক্ষু বুজি। কি দেখি তোমাকে বলি।"

সুধীর চক্ষু বুজিল ও মুদিত চক্ষে পিতাকে বলিতে লাগিল,—"সুন্দর লোক সব দেখিতে পাইতেছি। পুরুষ মানুষ, মেয়ে মানুষ, ছেলে, মেয়ে কত! আহা! ইহারা কি সুন্দর দেখিতে। ইহাদের মুখে কি মধুর হাসি। সূর্যের মত ইহাদের রূপ, তবে চাহিয়া দেখিতে পারা যায়। ইহাদের দেখিলে মনে সুখ হয়, ইহারা হাসিয়া হাসিয়া আমাকে আদর করিয়া ডাকিতেছেন। ইহাদের কাছে যাইতে আমার বড় সাধ হইতেছে। উনি কে? ঐ সুন্দর পুরুষ? আপনার নাম নিধিরাম? নিধিরাম কে, বাবা? নিধিরামের কথা তো কখনও শুনি নাই। নিধিরাম কে, জানি না। কিন্তু উনি আমাকে বড় ভালবাসেন, কোলে লইবার নিমিত্ত হাত বাড়াইতেছেন। আবার ইনি কে? বাবা, ইনি আমার ঠাকুরদাদা, ওঁর নাম এককড়ি, তোমার নিকট যাঁহার গল্প শুনিয়াছিলাম যিনি মরিয়া গিয়াছেন। আমার দিদিমাও এঁর সঙ্গে আসিয়াছেন। আর, বাবা, আমার সেই ছোট মামাটি দিদিমার কোলে রহিয়াছে। আমাদের বাড়ীর সেই ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমাকেও দেখিতেছি। আমাকে কোলে লইয়া আদর করিবার নিমিত্ত সকলে এখানে আসিয়াছেন। এঁরা সব মরিয়া গিয়াছেন। দেখ, দেখ, বাবা, তুমিও ঐ একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছ। আর সকলে হাসিতেছেন, আর সকলে মনের সুখে আছেন। তুমি কেন ঘাড় হেঁট করিয়া অত দূরে দাঁড়াইয়াছ? আমার মা কৈ? আমার মাকে তো ইহাদের ভিতর দেখিতেছি না? নিধিরাম আমাকে ডাকিতেছেন। বলিতেছেন, আমার সঙ্গে একটু এস। নিধিরাম আমাকে কোলে লইলেন। আমাকে কোলে লইয়া উড়িয়া চলিলেন। এ আবার কোথায় আসিলাম? এখানে দেখিতেছি সব অন্ধকার, এখানে ভয়ানক দুর্গন্ধ, এখানে কে কাহাকে মারিতেছে? এখানে সব লোক কাঁদিতেছে। ও কে? ঐ পিশাচী, রাক্ষসী?

যাহার নিকট মূর্তি দেখিয়া আমার প্রাণে বড় ভয় হইতেছে? বাবা গো। ঐ পিশাচী, রাক্ষসী আমার মা।”

ভয়ানক চীৎকার করিয়া সুধীর অজ্ঞান হইয়া পড়িল। দাঁত কপাটী ভাঙ্গিয়া, বাতাস করিয়া, মুখে জল দিয়া নবীন তাহার চেতন করিলেন। কিন্তু সুধীরের নিশ্বাস লইতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। সুধীরের প্রাণবায়ু ক্রমেই ফুরাইয়া আসিল।

সুধীর বলিলেন,--“বাবা, আর কথা কহিতে পারি না। হাঁপ লাগিতেছে। আর একটি কথা তোমাকে বলি, তারপর ঘুমাইব। দেখ, বাবা নদীর জল যেমন বহিয়া যায়, আমার প্রাণটি যেন সেইরূপ কুল কুল করিয়া বহিয়া যাইতেছে। নদীর জল ফুরায় না, কিন্তু আমার প্রাণটি শীঘ্র ফুরাইয়া যাইবে। তাহাতে, বাবা, কোনও অসুখ নাই। সর্ব শরীরে যেন বেশ সুখ পাইতেছি। আমি একটু ঘুমাই। ভাল করিয়া আমাকে শোয়াইয়া দাও।”

সুধীর ভাল করিয়া শুইল, আর অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ক্রমে নিশ্বাস-প্রশ্বাস হীনবল হইয়া আসিল। অবশেষে শিশুর প্রাণবায়ু একবারে ফুরাইয়া গেল। তখন নবীন সুধীরকে কোলে তুলিয়া লইলেন। নবীনের অশ্রু-ধারায় সুধীরের সর্বশরীর ভিজিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নবীন সুধীরকে আপনার বুকে তুলিয়া লইলেন। প্রাণসম প্রিয় পুত্রকে নিজেই দাহ করিবার নিমিত্ত গঙ্গার তীরাভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কেবল একটা প্রতিবাসী ছিল।

৬। পরিণাম

পুত্র শোকে হিরণ্ময়ী ঘরে খাটের উপর শুইয়া আছেন। কাপড় দিয়া চক্ষু মুছিতেছেন, চক্ষে এক ফোঁটা জল নাই। কেবল কাপড় দিয়া মুছিয়া চক্ষু-দুইটি একটু রক্তবর্ণ করিয়া দিলেন। তাহা না করিলে লোকে কি বলিবে? এই সময়ে বোকেন্দ্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শোকাকুলা হিরণ্ময়ীকে তিনি বুঝাইতে লাগিলেন, নানারূপ সদুপদেশ দিলেন।

বোকেন্দ্র বলিলেন,—“এই সংসার অনিত্য। মৃত্যু সকলের হইবে, মৃত্যুর হাত কেহই এড়াইতে পারিবে না। সেইজন্য শোক করা বৃথা, এই সংসারে ধর্মই হইল মানুষের সহায়। ধর্ম বিনা মানুষের আর অন্য গতি নাই। সেই নিমিত্ত আমোদ-প্রমোদে যতই ভুলিয়া থাকা যায়, ততই ভাল।”

ধর্ম কথা হইয়া যাইলে তাহার পর বোকেন্দ্র কিঞ্চিৎ পবিত্র প্রেমের কথা পড়িলেন। সঙ্গে ফুল আনিয়াছিলেন, সেইগুলি মনের সাধে হিরণ্ময়ীকে পরাইলেন। সেই ফুল পরিয়া হিরণ্ময়ীর রূপে দশদিক আলোকিত হইল। বোকেন্দ্র হিরণ্ময়ীর রূপগুণের বারবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ীর মুখে পুনরায় হাসির উদয় হইল। মনের সুখে হিরণ্ময়ী বোকেন্দ্রের নিকট ধর্মকথা ও পবিত্র প্রেম কথা শুনিতে লাগিলেন।

বিদায় হইবার পূর্বে বোকেন্দ্র বলিলেন,—হিরণ্ময়ী। পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি, সংসার অনিত্য। ঈশ্বরের লীলা বুঝা ভার। তোমার রূপগুণে আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছি। তোমাকে নিজস্বভাবে না পাইলে আমি সুখী হইব না। এক্ষণে তুমি বিধবা হও, এই আমার প্রার্থনা। বিধবা বিবাহের আমি সম্পূর্ণভাবে পক্ষপাতী। বিধবা বিবাহ প্রচলিত না হইলে সমাজ-সংস্কার হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সমাজ একেবারে উৎসন্ন যাইতেছে। সেজন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে তুমি শীঘ্র বিধবা হও। তোমাকে বিবাহ করিয়া দেশে আমি সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করি। তুমি এক কর্ম করিবে। কাগজের ভিতর এই যে শুভ্রবর্ণ চূর্ণটি দেখিতেছ, ইহার একটু একটু প্রতিদিন নবীন-বাবুকে খাওয়াইবে। তাহা হইলে তোমার ও আমার বিশেষ মঙ্গল হইবে। ইশ্বরকে ধ্যান করিয়া, হারমোনিয়াম বাজাইয়া, নাচিয়া গাহিয়া, চিরকাল, চিরকাল আমরা আমোদ-প্রমোদে কাটাইব।"

হিরণ্ময়ী বুঝিতে পারিলেন। শুভ্রবর্ণ সেই চূর্ণের কাগজটি হাতে লইলেন। বোকেন্দ্র চলিয়া যাইলে কিছুক্ষণ পরে সেই প্রতিবাসী অজ্ঞান অচেতন নবীনকে পাল্কি করিয়া বাটী আনিলেন। চিতায় আগুন দিয়া ঘাটে নবীন হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। এখন নবীনের জ্ঞান হয় নাই। সেই প্রতিবাসী ডাক্তার আনিয়া দিলেন। ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। হিরণ্ময়ী ঔষধের সহিত শুভ্রবর্ণ চূর্ণের কিয়দংশ মিশ্রিত করিয়া নবীনকে সেবন করাইতে লাগিলেন। তিনদিন পরে নবীনের সংজ্ঞা হইল। জ্ঞান হইল বটে। কিন্তু নবীন ডাক্তারের নিকট অন্যপ্রকার নানারূপ অসুখের পরিচয় দিতে লাগিলেন। দুই একদিন নবীনের কথা শুনিয়া অপরাপর লক্ষণ দেখিয়া ডাক্তারের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। নবীন যে ঔষধ খাইতেছিলেন। তাহার কিয়দংশ তিনি বাটী লইয়া যাইলেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাহাতে শঙ্খ বিষ মিশ্রিত রহিয়াছে। ডাক্তারখানায় ক্রমে ক্রমে এই বিষ ঔষধের সহিত মিশ্রিত

হইয়াছে কিনা, সেই সন্ধান করিলেন। জানিতে পারিলেন যে, ডাক্তার-খানায় ভুল হয় নাই।

এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া ডাক্তার তাড়াতাড়ি নবীনের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন যে, নবীনের মৃত্যু হইয়াছে। নবীনের মৃতদেহটি একঘরে পড়িয়া রহিয়াছে। অপর একটি ঘরে হিরণ্ময়ী ও বোকেন্দ্র ধর্ম বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন। ডাক্তার সেই ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"পাপীয়সি। তুই তোর স্বামীকে বধ করিয়াছিস। আর তুই দুরাচার। তাহার সহায়তা করিয়াছিস। রও, এখনি পুলিশ ডাকিতেছি। তোদের দুইজনকে যতদিন না ফাঁসিকাঠে ঝুলাইতে পারি, ততদিন আমার শান্তি নাই।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী ও বোকেন্দ্রের সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। বোকেন্দ্রের শরীর শিহরিয়া উঠিল। ছাতে উঠিবার নিমিত্ত সেই ঘরের নিকট সিঁড়ি ছিল। তাড়াতাড়ি ছাতে উঠিয়া পালাইবার আশায় বোকেন্দ্র ছাত হইতে লাফ দিল। বোকেন্দ্রের দুইটি পা ভাঙ্গিয়া গেল বোকেন্দ্র সেই স্থানে পড়িয়া রহিল। ডাক্তার পুলিশ ডাকিয়া আনিলেন। পুলিশ আসিয়া বোকেন্দ্রকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইল। চারিদিন পরে হাসপাতালে বোকেন্দ্রের মৃত্যু হইল।

হিরণ্ময়ীকে পুলিশে ধরিল। মোকদ্দমা হইল। স্বামী হত্যা অপরাধে হিরণ্ময়ী যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দ্বীপান্তরিত হইল। হিরণ্ময়ীর সুখের শরীর। কারাগারের কঠিন পরিশ্রম সে করিতে পারিবে না। দ্বীপ রক্ষার নিমিত্ত গোরা-ব্যরিক আছে। কর্মচারীরা কৃপা করিয়া হিরণ্ময়ীকে সেই গোরাদিগের পরিচর্যায় নিযুক্ত করিল। সে জঘন্য পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িল। সুতরাং এখন তাহাকে অপরাপর কয়েদির মত কঠিন পরিশ্রম করিতে হইল। পাঁচ বৎসর হিরণ্ময়ী কয়েদ খাটিল। কয়েদ খাটিয়াও অহরহ প্রহরীদিগের বেত খাইয়া হিরণ্ময়ীর সে রূপের আর চিহ্ন মাত্রও রহিল না। পাঁচ বৎসর পরে কারাগারের অধ্যক্ষ সাহেব কতকগুলি কয়েদি ও কয়েদিনীদিগের বিবাহ দিবার মানস করিলেন। একদিকে সারি সারি পুরুষ কয়েদি দাঁড় করাইলেন, অপর দিকে স্ত্রী কয়েদি দাঁড় করাইলেন, সাহেব বলিলেন,—"যাহার যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার গিয়া হাত ধর।" একজন কাফ্রি আসিয়া হিরণ্ময়ীর হাত ধরিল। এখানকার বিবাহের এই রীতি, মন্ত্র তন্ত্র আর কিছুই

পড়িতে হয় না। সেইদিন হইতে হিরণ্ময়ী কাফ্রির পত্নী হইল। দুইজনে একসংগে কয়েদ খাটিতে লাগিল।

অল্পদিন পরে স্ত্রীর সতীত্ব বিষয়ে কাফ্রির মনে সন্দেহ হইল। কাফ্রি হিরণ্ময়ীকে উঠিতে বসিতে প্রহার করিতে লাগিল। কাফ্রির প্রহারে হিরণ্ময়ীর শরীর জরজর হইল। দিবারাত্রি প্রহার করিয়াও কিন্তু কাফ্রির মনে শান্তি হইল না। স্ত্রী লইয়া সে একখানি ছোট নৌকাতে উঠিল। নৌকাখানি অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া চলিল। কাফ্রি মনে করিয়াছিল যে, নৌকাখানি ভাসিতে ভাসিতে হয় ব্রহ্মদেশে, না হয় ভারতবর্ষের কোনও স্থানে গিয়া লাগিবে। পর্বত সমান তরঙ্গের উপর নৌকাখানি নাচিতে নাচিতে চলিল। কোনদিকে যাইতেছে কাফ্রি তাহার কিছুই জানে না। এইরূপে আটদিন কাটিয়া গেল। অনাহার ও তৃষ্ণায় দুইজনই মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। নবম দিনের রাত্রিতে নৌকাখানি তরঙ্গ তাড়নায় সবলে ভূমিতে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। অতি ক্লেশে কাফ্রি ও হিরণ্ময়ীর প্রাণ বাঁচিল। দুইজনে গিয়া উপরে উঠিল। দেখিল যে, চারিদিকে নিবিড় অরণ্য। মনুষ্যের বসবাস নাই। ফল কথা, নৌকাখানি ব্রহ্মদেশে কি ভারতবর্ষে না গিয়া সেই আন্দামান দ্বীপের আর এক ধারে গিয়া পড়িয়াছিল। আন্দামান দ্বীপের যে ধারে কারাগার আছে, সেইধারে কেবল বসতি। দ্বীপের অবশিষ্ট অংশ, ঘোর জঙ্গলে আবৃত। এই জঙ্গলে খর্বাকায় কৃষ্ণবর্ণ উলঙ্গ একপ্রকার অসভ্য জাতি বিচরণ করে। প্রাতঃকাল হইলে তাহাদের একদল কাফ্রি ও হিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ কাফ্রির প্রাণ বধ করিয়া হিরণ্ময়ীকে ধরিল। বোতলকুচি দিয়া প্রথমে তাহারা হিরণ্ময়ীর মস্তক মণ্ডন করিয়া দিল। তাহার পর গেরিমাটি গুলিয়া তাহার সর্বশরীরে লেপন করিল, অবশেষে কাপড় ফেলিয়া দিয়া তাহার কোমরের চারিদিকে কেয়াপত্র পরাইল। এইরূপে বেশভূষা হইলে, কে হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করিবে তাহা লইয়া অসভ্যদিগের মধ্যে বাদানুবাদ হইতে লাগিল। পরস্পরের বিবাদ নিবারণের নিমিত্ত অবশেষে তাহারা সকলেই হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করিল। হিরণ্ময়ী পঞ্চাশ জন অসভ্যের ধর্মপত্নী হইল। গোরাবাবিকে থাকিতে হিরণ্ময়ীর যে পীড়া হইয়াছিল অসভ্যদিগের মধ্যে সে পীড়া ছিল না। হিরণ্ময়ীর আগমনে তাহাদের মধ্যে এক্ষণে সে পীড়ার আবির্ভাব হইল। অপর স্থানে এ পীড়া সাংঘাতিক নয়, কিন্তু অসভ্য শরীর এরূপভাবে গঠিত যে, সেই পীড়াবশতঃ তাহারা পটপট মরিয়া যাইতে লাগিল।

এক সময়ে আন্দামান দ্বীপের নিবিড় অরণ্য এই অসভ্যজাতিতে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু হিরণ্ময়ীর এমনি গুণ যে ইহার সংস্রবে বিনাশ বিনা আর কথা নাই। এই মায়াবিনী রাক্ষসরূপিনী পাপীয়সীর সংস্রবে যে কেহ আসিবে সেই সমূলে নির্মূল হইবে। হিরণ্ময়ীর প্রদত্ত পীড়াবশতঃ অসভ্যেরা প্রায় একেবারে নির্মূল হইয়া আসিয়াছে। অল্প সংখ্যক মাত্র এক্ষণে জীবিত আছে। আর অল্পদিনে এ জাতির জনপ্রাণীও থাকিবে না, তাহা নিশ্চয় কথা। এই নূতন পীড়াবশতঃ অসভ্যেরা যখন মরিতে আরম্ভ হইল, তখন তারা দেখিল যে, হিরণ্ময়ীই তাহাদের বিনাশের হেতু। তখন তাহারা হিরণ্ময়ীর নাক, কান, হাতের ও পায়ের অঙ্গুলি সব কাটিয়া দিল, দুইপাটি দাঁত সমুদয় পাথর দিয়া ভাঙ্গিয়া দিল, ও সর্ব শরীর মাঝে মাঝে ছেঁকা দিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। তাহার পর সেই সব ক্ষতস্থানে উত্তমরূপে বালুকা ও প্রস্তর দিয়া ঘসিয়া তাহার উপর একপ্রকার বৃক্ষ পত্রের রস দিয়া দিল। হিরণ্ময়ী জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় হিরণ্ময়ীকে তাহারা রাত্রিকালে কারাগারের সন্নিকটে ছাড়িয়া গেল। প্রাতঃকালে কারাগারের প্রহরীরা হিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইয়া ধরিল ও সাহেবের নিকট লইয়া গেল। কয়েদ হইতে পলাইবার অপরাধের জন্য সাহেব হিরণ্ময়ীকে পাঁচশত বেত মারিতে আজ্ঞা করিলেন। একেবারে পাঁচশত বেত মারিলে পাছে মরিয়া যায়, সে নিমিত্ত পনর দিন অন্তর পঞ্চাশ করিয়া বেত মারা হইতে লাগিল। ক্ষত স্থান ছাড়িয়া শরীরের অপরাপর অংশে নিয়মিতরূপে এই বেত পড়িতে লাগিল। শরীরের শোণিত পূর্ব হইতে দূষিত ছিল। সে কারণেই হউক, কি অসভ্যদিগের সেই বৃক্ষরসের গুণেই হউক, অথবা বেত্রাঘাতজনিত হউক, হিরণ্ময়ীর নাকে, কাঁনে, মুখে, হাতে, পায়ে, সর্বশরীরে যে স্থানে ক্ষত ছিল, সেই স্থানেই পচ ধরিল। নাক মুখ পচিয়া হিরণ্ময়ীর এরূপ বিকৃতি কদাকার বিকট মূর্তি হইল যে, তাহা দেখিলে আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। হিরণ্ময়ীর সর্বশরীর ধীরে ধীরে গলিয়া খসিয়া যাইতে লাগিল।

এই সকল ক্ষত স্থানে অসংখ্য কীট জন্মিল। কোনও স্থানে হিরণ্ময়ী ক্ষণকালের নিমিত্ত বসিলেই তাহার শরীর হইতে পোকা পড়িয়া সেই স্থানটিতে "কিল বিল" করিয়া বেড়াইত। হিরণ্ময়ীর গলিত শরীরে এরূপ দুর্গন্ধ যে, নাকে কাপড় না দিয়া তাহার নিকট যায় কার সাধ্য, পাছে অন্য কয়েদিরা এই ভয়াবহ পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেই ভয়ে সাহেব হিরণ্ময়ীকে কলিকাতায়

পাঠাইয়া দিলেন। হিরণ্ময়ীর চলত্‌শক্তি একপ্রকার রহিত হইয়াছিল। পায়ে ছিন্ন বস্ত্র বাঁধিয়া কোনও মতে একটু আধটু চলিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতে লাগিল। কিন্তু হিরণ্ময়ীর শরীর হইতে এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয় ও সে যেখানে দাঁড়ায় কি বসে, সেই স্থানটি এরূপ পোকায় পরিপূর্ণ হইয়া যায় যে, সবাই তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। হিরণ্ময়ীর ভিক্ষা মেলা ভার হইল। অনাহারে হিরণ্ময়ী কাতর হইয়া পড়িল। অবশেষে হিরণ্ময়ী ভাবিল,—"যদি আমি একবার আমার বাপের দেশে যাইতে পারি, তাহা হইলে সেখানে আমার ভিক্ষা মিলিবে। প্রতিবাসীরা আমাকে ঘৃণা করিবে না, আমাকে দুটি করিয়া ভাত দিবে।"

এই মনে করিয়া, পায়ে অনেক নেকড়া জড়াইয়া হিরণ্ময়ী গঙ্গার ধার ধরিয়া পিতৃদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। পথে ভিক্ষা করিতে করিতে, অতি কষ্টে, বহুদিন পরে, হিরণ্ময়ী দেশে গিয়া উপস্থিত হইল। দেশে গিয়া দেখিল যে, তাহার পিতার বাটীতে এখন আর ঘর-দ্বার কিছুই নাই, কেবল মাটির ঢিপি পড়িয়া রহিয়াছে। হিরণ্ময়ী প্রতিবাসীদিগের দ্বারে দ্বারে গিয়া বলিল,—"ওগো। আমি সেই এককড়ির কন্যা হিরণ্ময়ী। আমার এই দুর্দশা হইয়াছে। তোমরা আমাকে দুটি করিয়া ভাত দাও। ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমার প্রাণ বাহির হইতেছে।" প্রতিবাসীরা তাহাকে ভাত দিল বটে, কিন্তু তাহার দুর্গন্ধে প্রপীড়িত হইয়া শীঘ্রই তাহাকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইল। হিরণ্ময়ীকে একজন একটি ছেঁড়া মাদুর দিল, একজন একখানি সরা দিল, একজন একটি ভাঁড় দিল। এইগুলি লইয়া হিরণ্ময়ী বাপের ভিটায় সেই ঢিপির উপর গিয়া রহিল। সেই ছেঁড়া মাদুরে হিরণ্ময়ী শয়ন করে, দয়া করিয়া কেহ কিছু খাবার দিলে সেই সরা করিয়া আহার করে, আর ভাঁরটিতে জল খায়। কিন্তু ভাত জল, ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। তাহার গায়ের গন্ধে ও কীটের ভয়ে সকলেই তাহার নিকট যাইতে ভয় করে, সহজে তাহাকে কেহ ভাত জল দিতে যাইতে ইচ্ছা করে না।

অল্পদিন পরে, একদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, গঙ্গাতীরে যে স্থানে নিধিরামের মৃত্যু হইয়াছিল, হিরণ্ময়ীর মৃতদেহটি সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া রাত্রিকালে কোনরূপে বুকে হাঁটিয়া সেইখানে আসিয়া হিরণ্ময়ী আত্মহত্যা করিয়াছে। হিরণ্ময়ীর বাপের বাটীর নিকট একটি কুচিলার গাছ ছিল। জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণের জন্য হিরণ্ময়ী

প্রতিদিন একটু করিয়া কুচিলার বীজ খাইত। আজ সেই বীজ অধিক পরিমাণে খাইয়া আপনার প্রাণনাশ করিয়াছিল। সেই গলিত দেহের দুর্গন্ধে ঘাটে সেদিন কেহ স্নান করিতে পারিল না। তাহার পরদিন মুর্দফরাস আসিয়া, নাকে কাপড় জড়াইয়া, হিরণ্ময়ীর মৃতদেহ পা দিয়া জলে ঠেলিয়া দিল। হিরণ্ময়ীর দেহ জলে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় চলিয়া গেল।

৭। লৌহ

ত্রৈলোক্যনাথ গল্প লিখেছেন, তা' আবার ভূতের গল্প, কখনও বা আজগুবি গল্প,—এইটুকুতেই তাঁর প্রতিভা সীমায়িত, এমনভাবে যদি আমরা তাঁর সম্বন্ধে ভাবি তবে তাঁকে সবটুকু জানা হবে না। কেননা আমরা তাঁর মুখ থেকেই জেনেছি, গল্প লেখা, বা উপন্যাস লেখা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য দেশবাসীর দুঃখ দূর করা, দেশকে শিল্পে ও বিজ্ঞানে উন্নত করে তোলা। তাই তাঁকে শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করতে হয়েছে। ছোটদের পাঠ-উপযোগী করে, নানা ছবি দিয়ে, তিনি যে সব বিজ্ঞান শিক্ষামূলক ছোট প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, সেগুলিও সুন্দর, তাই শিশুমনেও তা' সহজেই রেখাপাত করে। নিম্নে প্রদত্ত প্রবন্ধটিও বিজ্ঞানবিষয়ক। প্রবন্ধটি আয়তনে বিরাট। তবু এই দীর্ঘায়তন প্রবন্ধপাঠে আমাদের এতটুকু ক্লান্তি আসে না। আরম্ভ দেখে তো মনে হয় যেন আমরা কোন গল্পরাজ্যে প্রবেশ করছি। লৌহাসুর কাহিনী বেশ সরস। লৌহাসুরের অচল অটল হয়ে আগুনে বসে থাকা, তারপর লাল হয়ে গলে গলে পড়ার চিত্রটি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। লোহার মত শক্ত কঠিন বস্তুকে বিষয়বস্তু করেও, তিনি তাকেও রসসিক্ত করে তুলেছেন। এই যে গল্প বলার ছলে, হাস্যরস বিতরণ করার ছলে, গুরু-বিষয় আলোচনা করার রীতি, এ তাঁর নিজস্ব রীতি। ত্রৈলোক্যনাথ রচিত প্রবন্ধের মধ্যে যতদূর জানা যায় "লৌহ"ই প্রথম প্রবন্ধ। এই প্রথম প্রবন্ধের "প্রথম-অংশ" উদাহরণরূপে এখানে উদ্ধৃত হল। তাঁর প্রবন্ধ রচনারীতির কিছুটা এ থেকে বোঝা যাবে আশা করি।

উপরে ঐ যে ছবিখানি দেখিতেছ, উহা বামা ও তাহার স্বামী নথুরামের। ইহাদের নিবাস ছোটনাগপুর, লোহারডাগা জিলা, যাহাকে অনেকে রাঁচির জিলা বলিয়া জানেন। জাতিতে ইহারা অগরীয়া। অগরীয়ারা আপনাদিগকে

ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বলে ছোটনাগপুর আমাদের আদিম নিবাস স্থান নহে, আমাদিগের পূর্ব-পুরুষেরা আগ্রা অঞ্চল হইতে আসিয়া এখানে বসতি করিয়াছিলেন। গলায় আমাদের যজ্ঞোপবীত ছিল, জীবিকার জন্য কৃষিকার্য অবলম্বন করিতে হইল বলিয়া আমরা ইহা এখন পরিত্যাগ করিয়াছি। অগরীয়ারা ক্ষত্রিয় হইলেও, ইহাদিগের আচার ব্যবহার কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য সজাতি হিন্দুদিগের মত নয়। ইহাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। মৃতদেহ ভূগর্ভস্থ করিয়া ইহারা অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। তবে কিছুদিন পরে বড় বড় হাড়গুলি তুলিয়া লইয়া গঙ্গার জলে প্রক্ষেপ করিয়া আসে। অগরীয়া ও আগুরি এই দুইটি নামে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে।

যাহা হউক, বামা ও নণ্ডুরামের নাম ধাম কুল-মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের বিশেষ আলোচনার আবশ্যক নাই। ইহারা কি কাজ করিয়া দিনপাত করে তাই লইয়া আমাদের কথা। বামা ও নণ্ডুরাম ও তাহাদের দুইটি ছেলে প্রস্তর হইতে লৌহ বাহির করে ও সেই লৌহ কর্মকারদিগকে বিক্রয় করে। তাহাতেই অতিকষ্টে ইহাদিগের ভরণপোষণ হয়। সেইকাজ করে বলিয়া সকলে ইহাদিগকে লোহা অগরীয়া বলিয়া থাকেন। লোহা হয়, তজ্জন্য রাচি জিলার নাম লোহারডাগা হইয়াছে কিনা, তাহা বলিতে পারি না। রানীগঞ্জের দিকে যাঁহারা কখনও বেড়াইতে গিয়াছিলেন, মাঠে মাঠে বড় কত পাথর পড়িয়াছে, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন। এক একখানি পাথর দেখিতে ঠিক লোহার মত। হাতে তুলিয়া দেখিলে খুব ভারি বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে অধিক পরিমাণে লোহা আছে। অনেক জাতীয় প্রস্তর ও মৃত্তিকায় লৌহ থাকে, সে কথা পরে বলিব। বামার দুইটি ছেলে এইরূপ পাথর কুড়াইয়া আনে ও সকলে মিলিয়া তাহা চূর্ণ করে। আমাদের একটি ভাঁটি আছে। সেই ভাঁটিটা অনেকটা চুণ পোড়াইবার ভাঁটির মত দেখিতে। ইহা মৃত্তিকা দিয়া গঠিত, গোলাকার, প্রায় তিন হস্ত উচ্চ। তলভাগে মেজে, মেজের আধ হাত উপরে ছাদ। ছাদ হইতে ভাঁটির চূড়া পর্যন্ত মাটি দিয়া বুজানো, কেবল মাঝখানে একটি সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের উপর মুখে কিছু দিলেই মেজেতে গিয়া পড়ে।

নণ্ডুরাম প্রথমে মেজেটিতে কাঠের কয়লা ঠাসিয়া দেয়। তারপর উপর হইতে মুঠা মুঠা কয়লা দিয়া সুড়ঙ্গটিও কয়লায় পরিপূর্ণ করে। সুতরাং সুড়ঙ্গের কয়লা ও মেজের কয়লা এক হইয়া পড়ে। তারপর নীচেতে একটু আগুন

দিয়া জাঁতার তাও দিলেই সমুদায় কয়লা ধরিয়া উঠে। জাঁতায় তাও কিছু উপর হইতে দেওয়া যায় না। নীচে হইতেই লোকে দিয়া থাকে। ভাঁটির তলভাগে যে মেজে, সেই এক ধারে একটি ছিদ্র আছে। ছিদ্রটিতে একটি মাটির নল লাগানো থাকে। মাটির নলের সহিত জাঁতায় বাঁশের চোঙের যোগ। যদি মাঝখানে একটু মাটির নল না রাখা যায়, তাহা হইলে বাঁশের চোঙাটি যে পুড়িয়া যাইবে, আর জাঁতাটি যে নষ্ট হইয়া যাইবে। ভাঁটিতে বাতাস দিবার জন্য একজোড়া জাঁতার আবশ্যক। জাঁতাগুলি দেখিতে ঠিক জগঝম্পের মত, কাঠের খোল, ছাগলের ছালে ঢিলে-ঢিলে ছাওয়া। জাঁতার একদিকে বাঁশের চোঙ, যাহা দিয়া ভাঁটির ভিতর বাতাস যায়, অপর দিকে একটি ছিদ্র, যাহা দিয়া বাহির হইতে বায়ু আসিয়া জাঁতাকে পরিপূর্ণ করে। ভাঁটির দুই দিকে দুইটি খুঁটি ঢেকিকল ভাবে ভূমিতে সংলগ্ন আছে। তাহাদিগের মাথায় দড়ি বাঁধিয়া নীচে হইতে টানিলে নুইয়া আইসে, আবার ছেড়ে দিলেই আপনি আপনি উপরে উঠিয়া পড়ে। এই দড়ির অপর দিকটি জাঁতার চর্মের সহিত টানো-টানো ভাবে বাঁধা। উপরে কাঠের টানে জাঁতার চর্ম, তাই সর্বদা বায়ুতে পরিপূর্ণ থাকে। জাঁতার বাহির দিকে যে ছিদ্রটি আছে, তাহাকে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত বন্ধ করিয়া চর্মের উপর চাপ দিলেই, খুঁটি নত হইয়া পড়ে, আর চর্মের ভিতর যে বায়ুটুকু থাকে, তাহা যেমন করিয়া বাঁশের চোঙ দিয়া ভাঁটিতে প্রবেশ করে, বাহিরের ছিদ্রটি এই সময় খুলিয়া দাও, চর্মের উপর চাপটি ছাড়িয়া দাও, অমনি খুঁটির মাথাটি উপরে উঠিয়া পড়িবে। খুঁটিতে আর জাঁতাতে যে দড়ি বাঁধা আছে, তাহাতে টান ধরিবে, আর বাহির হইতে বায়ু আসিয়া চর্মকে পরিপূর্ণ করিবে। এখানকার লোকেরা পায়ে ভর দিয়া জাঁতাকে চাপিয়া ধরে। জাঁতার উপর যেই একবার পা রাখে, অমনি ফোস করিয়া ভাঁটিতে বাতাস যায়, পা তুলিয়া লইলেই জাঁতা বাতাসে পরিপূর্ণ হয়। অপর পায়ের দ্বারা বাহিরের ছিদ্রকে একবার বন্ধ একবার মুক্ত রাখিতে হয়। পাশাপাশি দুইটি জাঁতা রাখিয়া লোকে কাজ করে। একবার এটিতে পা, একবার ওটিতে পা, এই করিয়া ক্রমান্বয়ে দুইটি জাঁতা হইতে অবিরত ভাঁটিতে বাতাস যাইতে থাকে। একেলা দুইটি জাঁতা চালাইতে গেলে ভালরূপ ভর পড়ে না, আর শীঘ্রই নন্দুরাম শ্রান্ত হইয়া যাইবে, তাই সে আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়াছে। পশ্চাৎ হইতে বামা তাহার কোমর ধরিয়াছে, আর স্ত্রী পুরুষে দুজন মিলিয়া জাঁতা চালাইতেছে। অল্পকাল মধ্যে কয়লা ধরিয়া উঠে, ভাঁটির

ভিতর কি মেজেতে কি সুড়ঙ্গে আগুন গন্ গন্ করে। সুড়ঙ্গের কয়লা পুড়িয়া অধোগামী হইতে থাকে। অঙ্গার অধোগামী হইয়া সুড়ঙ্গের উপরিভাগ ক্রমে খালি হইয়া পড়ে, এখন সেই যে সকলে মিলিয়া তাহারা প্রস্তর চূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার কিয়দংশ সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢালিয়া দিতে হয়, তাহার উপর ফের কয়লা সাজাইয়া দিতে হয়। এক থাক পাথরের গুঁড়া, এক থাক কয়লা দিয়া ক্রমাগত সুড়ঙ্গকে পরিপূর্ণ করিতে হয়, যেমন কয়লা পুড়িতে থাকে; পাথরের গুড়াও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেমনই গলিতে থাকে, আর গলিয়া তলায় ভাঁটির মেজেতে গিয়া জমা হয়। এই দ্রবীভূত প্রস্তর চূর্ণের নিম্নভাগে গুরুভার লৌহ অবস্থিতি করে। লৌহ ভিন্ন, প্রস্তরে আর হয় কিছু পদার্থ থাকে, তাহা গলিয়া তরলভাবে উপরে ভাসিতে থাকে। মাঝে মাঝে ভাঁটির গায়ে ছিদ্র করিয়া উপরিস্থিত এই ক্লেদ বাহির করিয়া দিতে হয়। এইরূপ দুই প্রহরকাল পর্যন্ত ক্রমাগত প্রস্তরচূর্ণ ও কয়লা যোগাইলে, ভাঁটিতে অনেকখানি লৌহ জমিয়া যায়। তখন শেষকালে একবার জাঁতায় ঘন ঘন ভর দিয়া অগ্নিকে অধিকতর প্রজ্জলিত করিতে হয়। তারপর ভাঁটির মুখে মাটির নলটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেইপথ দিয়া লৌহ বাহির করিয়া লইতে হয়। এই লৌহ সম্পূর্ণ তরলভাব ধারণ করে নাই, অর্ধ দ্রবীভূত পীণ্ডাকারে ইহা ভাঁটি হইতে বাহির হইয়া আসে, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধও নয়, প্রস্তর নিহিত অপরাপর দ্রব্য (সাধারণ কথায় যাহাকে লৌহমল বলিয়া থাকে) ও কয়লার গুঁড়া এখনও ইহার সহিত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। তাই বাহির করিয়াই রক্তবর্ণ থাকিতে থাকিতে ইহাকে বলপূর্বক পিটিতে হয়, তাহাতে অসার দ্রব্যসমূহ দূরে গিয়া পড়ে ও লৌহ ক্রমে নির্মল হইয়া আসে। একবার পিটিলেই লৌহ সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হয় না। আরও দুই চার বার পোড়াইলে ও পিটিলে তবে ঠিক হয়। কোনও কোনও লৌহ নিষ্কারকেরা লৌহকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করিয়া তবে লোহা কর্মকারদিগকে বিক্রয় করে। আবার কেহ বা তাহা না করিয়া অশুদ্ধ অবস্থাতেই বিক্রয় করিয়া ফেলে। কর্মকারেরা আরও পোড়াইয়া ও পিটিয়া আপনদিগের কর্মোপযোগী করিয়া লয়। ছয় ঘন্টা ধরিয়া পরিশ্রম করিলে ভাঁটি হইতে যে এক খণ্ড লৌহ বাহির হয় তাহাকে "গিরি" বলে।

লৌহের উৎপত্তি বিষয়ে জঙ্গল-মহলে একটা আশ্চর্য প্রবাদ প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীনকালে লোহাসুর নামে একটি দুর্দান্ত দৈত্য ছিল। ঘোরতর তপোবলে সে এরূপ বলশালী হইয়াছিল যে, স্বর্গের দেবতাগণ তাহার

ভয়ে কম্পিত থাকিতেন, এমন কি ইন্দ্রকেও তাহার নিকট পরাজিত হইয়া, স্বর্গসুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। লোহাসুর স্বর্গ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া শচীকে লইয়া পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিল। ইন্দ্রদেব পথের ভিখারী হইয়া কখনও মর্ত্তে, কখনও পাতালে, কখনও মাঠে, কখনও ঘাটে, অতিকষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। রাজদেহ রাজভোগে গঠিত। এ সুকোমল দেহে এরূপ অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ আর ক'দিন সহ্য হইয়া থাকে? আর সহিতে না পারিয়া তিনি রুক্ষকেশে মলিন-বেশে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক কান্না-টান্নার পর দয়াময় মহাদেব তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন। কিন্তু সদয় হইলে কি হইবে অন্যদিকে লোহাসুরকে বর দিয়া বসিয়াছেন যে, বিষ্ণুর চক্রই হউক, ইন্দ্রের বজ্রই হউক, আর বরুণের পাশই হউক, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, পিশাচ, মনুষ্য, মধ্যে যে কোন অস্ত্র প্রচলিত থাকুক, তাহা দিয়া লোহাসুরকে মারিলে তাহার গাঁয়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগিবে না। সুতরাং বড়ই সংকটের কথা। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মহাদেব একটি মানুষের সৃজন করিলেন। তাহাকে কামারের সজ্জায়-সজ্জিত করা হইল। কিন্তু কি স্বর্গে, কি মর্ত্যে কি পাতালে, তখন কুত্রাপি একটিও কামার ছিল না, কামার কাহাকে বলে কেহই জানিত না। তা কামারের সজ্জা কোথা হইতে আসিবে? তাই সেই কৈলাস শিখরবাসী ভক্তাধীন ভবানীপতি নিজের আসবাবই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জাঁতা ও হাতুড়ী প্রভৃতি কর্মকারের আবশ্যকীয় যন্ত্র সমূহ গড়াইয়া দিলেন। ডমরুটি ভাঙ্গিয়া হইল হাতুড়ী, মড়ার মাথার খুলিখানি একটু পিটিয়া পিটিয়া হইল নেঙাই (যাহার উপর স্বর্ণকার ও কর্মকারেরা কোন দ্রব্য রাখিয়া হাতুড়ীর ঘা' মারিয়া থাকে), সাপটিকে বাঁকাইয়া হইল চিমটা। এইরূপ আয়োজন দেখিয়া শঙ্কর বাহন ষাঁড়টিও চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ইন্দ্রের প্রতি সকরুণ হইয়া তিনিও আপনার গায়ের একটু ছাল খুলিয়া দিলেন। তাঁহাতেই জাঁতা জোড়াটি প্রস্তুত হইল। মনুষ্যকে এইরূপ সুসজ্জিত করিয়া ভবানীপতি তাহাকে আদেশ করিলেন, স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া ইন্দ্র অতি ক্লেশ পাইতেছেন, ইন্দ্রের নিমিত্ত তুমি লোহাসুরের সহিত যাইয়া যুদ্ধ কর, সেই দুর্জয় দানবপতিকে শীঘ্র বধ কর, এইরূপে সুসজ্জিত ও আদিষ্ট হইয়া 'যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি' ভৈরব রবে মনুষ্য যাইয়া লোহাসুরের নিকট উপস্থিত হইল। ভীষণ পর্বতাকার লোহাসুর এই কীটসদৃশ সামান্য মনুষ্যকে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী দেখিয়া

যারপর নাই বিস্মিত হইল। মনে মনে ভাবিল, তাই তো এ যে সেই বাঙ্গালার রসময় কবি কলিকালে যাহা বলিবেন, আজ তাহাই দেখিতেছি। দানবেরা যে কতকটা দেবযোনি, তাহাও কি বুঝাইয়া দিতে হইবে না কি? তা না হইলে যুগান্তের পরে রসময় বাবু কি বলিলেন,····· কেমন করিয়া জানিল? রসময় কবি একবার একজন সমৃদ্ধশালী তন্তুবায় জমিদারের বাটীতে কিছু বিদায় পাইবার প্রত্যাশায় গিয়াছিলেন। দক্ষিণাটা কিন্তু মনের মত হয় নাই। এ অবস্থায় কবিলোক চুপ করিয়া চলিয়া আসিবেন, সে কথা তো কখনই হইতে পারে না। গৃহস্বামী পারস্য ভাষায় পড়িতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মনে মনে একটি কবিতা রচনা করিলেন, ও বাবুকে শুনাইয়া বলিলেন,—

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেলেন শল্য সেনাপতি।
মোগল গেলেন পাঠান গেলেন
ফাঁশী খাঁ আজ তাঁতি।

এই কথা বলিয়াই প্রস্থান, লোহাসুর ভাবিল, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু বরুণ সকলেই রণে পরাভাব হইলেন, নন্দনকানন এই স্বর্গদেশে আমি বাহুবলে একাধিপত্য স্থাপন করিলাম। আজ কিনা মর্কটের মত একটা মানুষ আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে চায়। এই রহস্য চিন্তা করিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। হাসিয়া মনুষ্যকে বলিল,—তোমার সহিত আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না, তোমার সহিত আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না। তোমার মত সামান্য কীটকে আমি যখন এক গালে খাইয়া ফেলিতে পারি, তা' আবার তোমার সহিত যুদ্ধ কি করিব? লোকে আমাকে উপহাস করিবে, যার বাছা ঘরে ফিরিয়া যাও। মনুষ্য নিরুপায় দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে দানবকে বলিল, ভালই প্রকৃতই যদি তুমি এত বলশালী, সত্যই যদি তুমি অমর, তোমার অসাধ্য যদি কিছুই না থাকে, তবে আমি একটি কথা বলি, তাহা করিতে পার? তা যদি করিতে পার, তবে আমার মনে বিশ্বাস হয় যে, যথার্থই তুমি অজর, অমর, আর তাহা হইলে তোমার সহিত যুদ্ধ আর কি করিব, কাজে কাজেই ঘরে ফিরিয়া যাইব। দানব উত্তর দিল,—বল, আমি আবার করিতে না পারি কি? মনুষ্য বলিল, একটু রও, আমি এইখানে কাদা দিয়া একটি ভাঁটি গড়ি, সেই ভাঁটির গায়ে আমার এই জাঁতাটি বসাই, আর তাহার ভিতর কয়লা সাজাই, তুমি যদি সেই কয়লার উপর খানিকক্ষণের জন্য স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে, বুঝি, হ্যাঁ দৈত্য বটে। দানব

দৈত্য ভূত প্রেতেরা প্রায়ই বোকা হইয়া থাকে, তাহারা বড় ফেরফন্দি বুঝে না, গায়ের বলেই তাহারা জগতকে শরাখানা দেখে। মন্ত্রবল বুদ্ধিবল যে গায়ের বলের চেয়ে বড়, তাহা তাহারা বুঝে না। তাহার সাক্ষী আরব্য উপন্যাসের দৈত্যটি যে মৎসবধী ধীবরের এক কথাতেই তামার হাডির ভিতর পুনঃপ্রবেশ করিয়াছিল। আর আমাদের দেশের রোজাদের ত কথাই নাই, বুদ্ধি কৌশলে তাঁহারা আজ ও ভূতটি ধরিয়া কুপর ভিতর পুরিতেছেন, কাল যে ভূতটি ধরিয়া কুপর ভিতর জাগাইয়া রাখিতেছেন, তাঁদের কাজই হইল এই। দানব হাসিয়া বলিল,—আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি কি-না উৎকট কাজ করিতে বলিবে। যত বড খুসী ভাঁটি গড়, বলতো আমি না হয় তোমার সহিত কাদার যোগাড় দিব, যতখুশী কয়লা চাপাও, কয়লার আগুন দিয়া যত খুশী জাঁতা বহ। একেলা না পার, তোমার যদি কেহ বামা সুন্দরী থাকে, তারও না হয় ডাকিয়া আন, তোমার কোমর ধরিয়া সেও জাঁতা বহিবে, তারপর যতক্ষণ বল, ততক্ষণ আমি ভাঁটির ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব। ভাঁটি গডা হইল, কয়লা সাজান হইল, জাঁতা বসানো হইল। হাসিতে হাসিতে দানব গিয়া ভাঁটির ভিতর কয়লার আগুন দিয়া জাঁতায় তাও আরম্ভ করিয়া দিল। আগুন ধরিয়া উঠিল, কয়লা রক্তবর্ণ হইয়া টকটক করিতে লাগিল। অসুরের পা পুড়িল, দুঃসহ যাতনা হইল, তবুও (দানব কিনা? গাজুরিটুকু চাই)। যতই কেন কষ্ট হউক না, প্রকাশ করা কিন্তু হবে না তাই লোহাসুর অটল অচল ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে তাহার শরীর লাল হইয়া উঠিল। শরীর গলিতে লাগিল। অবশেষে সমুদয় শরীরটা গলিয়া ভাঁটির বাহিরে গড়াইয়া আসিল। এই যে লোহা দেখিতে পাও, খাঁটি লৌহই বল আর লৌহমল প্রস্তরই বল, এসব সেই লোহাসুরের শরীর। কেবল লোহা নয় পিতল কাঁসাও তাই। আর সেই যে মানুষটি, যিনি কৌশল করিয়া লোহাসুরকে বধ করিয়াছিলেন ও তাহার শরীর গলাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনিও বড় কেও-কেটা নন। তিনি কর্মকার প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু সম্পর্কীয় শিল্পকারদিগের পূর্বপুরুষ। লোহাসুরের দ্রবীভূত শরীর শীতল হইয়া যেই একটু জমিয়া আসিল, অমনি তিনি তাহা পিটিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পিটিয়া পিটিয়া যে কয় প্রকার ধাতু বাহির হইল, তাহা তিনি তাঁহার সন্তানবর্গকে বিভাগ করিয়া দিলেন, যথা—(১) লোহার কর্মকারকে তিনি লোহা দিলেন (২) পিত্তল কর্মকারকে পিত্তল দিলেন, (৩) কাঁসারীকে তিনি কাঁসা দিলেন, (৪) স্বর্ণ কর্মকারকে তিনি স্বর্ণ ও

রোপ্য দিলেন, (৫) ষষ্ঠী কর্মকারকে তিনি এরূপ লোহা দিলেন, যাহাতে অনায়াসে কাজলপাতা, লোহফল ও পুত্তলিকা, বিশেষতঃ লক্ষ্মীপূজার সময় যে পোকের আবশ্যক হয়, তাহা গড়া যাইতে পারে, (৬) চাঁদ কামারকে তিনি এরূপ পিত্তল দিলেন, যাহাতে সুচারু দর্পণ নির্মিত হইতে পারে, (৭) ও (৮) ঢোক্রা ও তাম্রাকে তিনি তাম্র দিলেন। প্রবাদটি মাইল মহলের, সুতরাং যে সকল ধাতুকারদিগের কথা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি নাম কিছু জঙ্গলী জঙ্গলা। ইহাদের মধ্যে অনেকের আচার ব্যবহারও তদ্রূপ। সম্পূর্ণ-ভাবে হিন্দুশাস্ত্র সম্মত নহে। কেহ বা মুরগী পোষে ও মুরগী খায়। আবার কাহারও বা সেই উপাদেয় ভঁইসের মাংস পাইলেই পরম আনন্দ। আবার ভাদ্র মাসে ঘোর নিশীথে যখন এই কর্মকার কুমারীরা হেলিয়া দুলিয়া শ্রীশ্রীভাদু দেবতার স্তুতিসূচক মধুর গান করিতে থাকেন, তখন কার না মন মোহিত হইয়া যায়? পৃথিবীতে যদি এমনও কেউ কঠিন প্রাণ পাষণ্ড থাকে যে, সেই কোকিলকণ্ঠি কর্মকার কুমারীদিগের অলকা-তিলোকা-বিভূষিত সুধাংশু বিনিন্দিত মুখ চন্দ্রমা দেখিয়াও একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে, গানের ভাব বুঝিলে তাহার আর কিছু বাকি থাকে না। বুকে সকলে সাহস বাঁধুন, আমি সেই গানের দুইটি কথা এখানে বলিয়া ফেলি,—

কদম গাছে উঠলে ভাদু কাঁচা কদম ভেঙ্গোনা।
পাকলে কদম সবাই খাবে কেউ কিছু তখন বলবে না॥

অর্থাৎ কিনা হে ভাদু। তুমি দুড় দুড় করিয়া কদমগাছে উঠিলে দেখিতেছি, কিন্তু কদম এখনও পাকে নাই। কাঁচা কদম ফলগুলি ছিড়িয়া বৃথা নষ্ট করিও না। যখন কদম পাকিবে তখন আমরাও খাইব, তুমিও খাইও, যত ইচ্ছা পাড়িও, কেউ তখন তোমাকে মানা করিবে না। বলা বাহুল্য যে এখনকার লোকে পাকা কদম ফল খাইয়া থাকে।

এই গেল, জঙ্গলমহলে লৌহ উৎপত্তি বিষয়ে প্রবাদ। প্রবাদটি সত্য কি মিথ্যা, সে বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। যদি সে শাস্ত্রজ্ঞানই থাকিবে, তাহা হইলে—এই সামান্য নীরস প্রস্তাব লিখিতেই বা প্রবৃত্ত হইব কেন? উপন্যাস রচনা করিতাম, না হয় তীব্র বাক্যে সাহেবদের গালি দিয়া প্রবন্ধ লিখিতাম, আমাদের দেশহিতৈষীরা, মায় তাদের ছানাপোনাটি পর্যন্ত, সাধু সাধু বলিয়া আমার জয় জয় করিতেন। হায়, সে যশ আমার কপালে নাই। আমার যে গতিবিধি, দীনহীন ভিখারী ভারতবাসীদিগের পর্ণ কুটীরে। আমি যে

তাহাদিগকে হাঁড়ি উটকাইয়া জিজ্ঞাসা করি,—কেমন নথুরাম, কাল কতটুকু লোহা নামাইলে কতকে বেচিলে, দুইদিন ছেলেপিলে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে তো? যাহার গতিবিধি পর্ণকুটীরে, অট্টালিকাবাসীরা তাহাকে ভাল বলিবেন কেন? কুটীরবাসীরা কি খায়, কি পরে, যাহার অনুসন্ধান, কাজ, রাজতন্ত্রপরায়ণ জ্ঞানগম্ভীর সহোদরেরা তাহার আদর করিবেন কেন? লোহা প্রভৃতি, পণ্যজাত লইয়া যাহার আলোচনা, আমাদিগের সেই এম. এ, বি. এ, রূপ মণিময় মুকুটধারী পণ্ডিতেরা সে মুখের পানে ফিরিয়া চাহিবেন কেন? সেজন্য আগেই বলিয়া দোষে খালাস হইয়াছি। আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই যে, বিচার করি। এম.এ, বি.এ, নাই যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বায়ুস্ফুলিঙ্গ উদ্গিরণ করিতে করিতে উগ্র ভাবাপন্ন প্রবন্ধ লিখি। তবে একথা বলিতে পারি, যে উৎপত্তি যেরূপেই হইয়া থাকুক, লৌহ একটি মূল বা রূঢ় পদার্থ, যৌগিক পদার্থ নয়, যৌগিক পদার্থ, দুইটি বা ততোধিক মূল পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে হইয়া থাকে। উত্তাপ দ্বারা হউক বা তাড়িত বল প্রয়োগে হউক বা অন্য কোন উপায়ে হউক, যৌগিক পদার্থকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মূল পদার্থে পরিণত করিতে পারা যায়, আবার সেই মূল পদার্থগুলিকে লইয়া, পুনর্বার রাসায়নিক সংযোগে যেরূপ যৌগিক পদার্থ ছিল, তাহা করিতে পারা যায়। তুঁতে একটি যৌগিক পদার্থ। তামা ও গন্ধকচূর্ণ একত্র মিশাইয়া তাপ দিলেই তুঁতে হয়। সুতরাং রাসায়নিক উপায় দ্বারা তুঁতেকে বিয়োগ করিয়া ইহা হইতে গন্ধকটুকু ও তামাটুকু পৃথক করিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু গন্ধককে বা তামাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। তাপই দিই, আর তড়িৎ বল প্রয়োগ করি, যে কোন রাসায়নিক উপায় করি, গন্ধক গন্ধকই রহিয়া যায়, তামা তামাই থাকিয়া যায়। ইহাদিগের ভিতর হইতে আর কোন পদার্থ বাহির করিতে পারি না। তাই, গন্ধক ও তামা মূল পদার্থ, তুঁতে যৌগিক পদার্থ। সেইরূপ লৌহ মূল পদার্থ হীরাকস যৌগিক পদার্থ, পূর্বকালের পণ্ডিতেরা মোটামুটি পাঁচটি মূল পদার্থ ধরিয়া গিয়াছিলেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত ও ব্যোম, এই পঞ্চভূতে সমুদয় পৃথিবী গঠিত বলিয়া মোটামুটি স্থির করিয়াছিলেন। স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ প্রভৃতি দ্রব্য তাঁহারা ক্ষিতির ভিতরেই ধরিয়াছিলেন। কিন্তু এখনকার বিজ্ঞান শাস্ত্রকারেরা ক্ষিতিকে একটি স্বতন্ত্র ভূত বলিয়া গণনা করেন না, ইহাকে যৌগিক বা মিশ্রিত পদার্থ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, গন্ধক, বালুকার আকর, চূণের আকর প্রভৃতি নানা মূল পদার্থের ক্ষিতি একটি সমষ্টি

মাত্র। সেই সকল দ্রব্যের সহযোগে মৃত্তিকা হয়। তা ভিন্ন মৃত্তিকা আর কিছুই নয়, এই কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। কেবল কথায় বলেন না, এক মুঠা মাটী দিলে তোমার সম্মুখে সেই মাটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইয়া দিবেন, কি কি দ্রব্য মিশিয়া ঘুরিয়া—সেই মাটিটুকু হইয়াছে। তাহাতে কতটুকু সোনা আছে, কতটুকু লৌহ আছে, কতটুকু বালির আকর আছে, কতটুকু চূণের আকর আছে, সব কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করিয়া দিবেন। আবার যে হিসাব অব্যর্থ সন্ধান, যেমন দুই আর দুয়ে চারি হয়, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই, সেইরূপ ভাল করিয়া যদি হিসাব করিয়া দেন, তাহা হইলে ইহাদিগের হিসাবে আর কোন সংশয় থাকে না। ইউরোপের লোকে দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া এখন ইহাদের কথার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস করেন। অনেক টাকা দিয়া ইহাদের মত সংগ্রহ বিশ্বাস করেন। অনেক টাকা দিয়া ইহাদের মত সংগ্রহ করিয়া সেই মতানুযায়ী কার্য করেন। শুনিলাম, সেদিন একজন কলিকাতার সাহেব ছোটনাগপুরে একটি পাহাড় কিনিবার কল্পনা করিয়া সেই পাহাড়ের এক মুঠা মাটী পরীক্ষার নিমিত্ত একজন বৈজ্ঞানিকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পাহাড়ে সোনা আছে কিনা, আর কত মাটিতে কতটুকু সোনা পাওয়া যাইতে পারিবে, সেই কথা নিশ্চয়রূপে স্থির করাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। পরীক্ষককে এই মাটী লইয়া দুইদিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, এই দুই দিন পরিশ্রমের মুজরি স্বরূপ তিনি ১১০ টাকা পাইয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়া দিয়াছেন, ভূমিক্রেতা সাহেব অবশ্যই সেইমত কার্য করিবেন। তাহা হইলে ঠকিবার সম্ভাবনা কম। যাঁহারা কৃষি কার্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ভূমি পরীক্ষা করিয়া লন। আমি এ জমিটুকু কিনিবার বাসনা করি, তাহাতে আলুর চাষ করিয়া দুই পয়সা পাইব কিনা, মাটি পরীক্ষা করিয়া আমাকে বলিয়া দিন। আমি ঐ ভূমিটুকুতে গমের চাষ করিয়াছিলাম, ফসল ভাল হয় নাই, জমিতে কি দ্রব্যের অনটন আছে, আর তাহাতে কি দ্রব্য দিলেই বা সেই দোষ দূরীভূত হয়, তাহা আমাকে বলিয়া দিন। নানা ব্যবসায়ীরা আপনাদিগের ব্যবসার উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এইরূপ নিত্য নিত্যই বিজ্ঞানের সহায়তা লইয়া থাকেন। যাহা হউক পূর্বেই বলিয়াছি যে, এখনকার বিজ্ঞানবেত্তারা ক্ষিতিকে বহু মূল পদার্থে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন। তেজ ও আকাশকে বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু জল ও বায়ু যে মূল পদার্থ নয়, তাহা স্থির করিয়াছেন। জগতে যে কোন বস্তু আমরা দেখিতে

পাই, মায় মুসুরিটি মায় সরিষাটি পর্যন্ত, বিয়োগে ও সংযোগে তাহাতে কি পদার্থ আছে, সকলই স্থির করিয়াছেন। ইহাদের কথা আর কি বলিব, কোটী কোটী যোজন দূরে সূর্যমণ্ডলে, আবার তার চেয়ে কোটী কোটী মাইল দূরে নক্ষত্র মণ্ডলে, কোনটিতে কি পদার্থ আছে তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন। জগতের বস্তু সমূহের মধ্যে কেবল ৬৩টি দ্রব্যকে ইহারা কোনও উপায়েই বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা হইতে অন্য পদার্থ বাহির করিতে পারেন না। তাই, এই ৬৩টি পদার্থকে ইহারা মূল পদার্থ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। মূল বা রূঢ় পদার্থদিগের মধ্যে কতকগুলি ধাতু নহে। এইরূপ প্রস্তাবে নানারূপ মূল ও যৌগিক পদার্থ লইয়া আমাদিগের কাজ পড়িবে। সকল সময় গল্প করিয়া বুঝাইতে পারিব না। কাজেই গুটি কত পদার্থের নাম ও গুণের কথা কিছু কিছু বলিতে হইতেছে। অনেকগুলির আবার বাংলা নাম নাই। কতকগুলির বাংলা নাম থাকিলেও ইংরেজী নামই অধিক প্রসিদ্ধ। ইংরেজী নাম করিলে বরং কিয়ৎ পরিমাণে লোকে বুঝিবেন, কিন্তু বাংলা নাম করিলে একেবারেই কেহ দন্তস্ফুট করিতে পারিবেন না। ৬৩টি মূল পদার্থের মধ্যে ৪৮টি ধাতু, আর ১৫টি ধাতু নহে। ৪৮টি ধাতুর মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির নাম এখানে করিতেছি, যথা—(১) এলুমিনিয়াম, ইহাকে সোজাসুজি ফট্‌কিরির পাথর বলা যাইলেও যাইতে পারে। কারণ ইহার সহিত অন্যান্য পদার্থ সংযুক্ত হইয়া বাজারে যে ফট্‌কিরি দেখিতে পাই সেই যৌগিক দ্রব্যটি উৎপন্ন হইয়া থাকে। (২) এন্টিমনি, সুরমার পাথর বলিতে পারি। কারণ ইহা হইতেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা চক্ষে যে সুরমা লাগায়, তাহা প্রস্তুত হয়। (৩) বিসমথ ইহা হইতে শুভ্রবর্ণ একপ্রকার যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত হয়। উদরে বেদনা হইলে ডাক্তারেরা তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। (৪) ক্যাল-সিয়াম, ইহাকে চুণের আকর বলিতে পারা যায়, কারণ ইহা হইতে যৌগিক পদার্থ চুণ উৎপন্ন হয়, খড়ি মাটিও ইহার আর একটি যৌগিক পদার্থ। (৫) কোবাল্ট, জয়পুর অঞ্চলে এক ধাতু পাওয়া যায়, সেখানে ইহাকে সৈতা বলে। (৬) ম্যাগনেসিয়াম, ইহা হইতে ম্যাগনেসিয়া নামক যৌগিক পদার্থটি উৎপন্ন হয়, তাহা সচরাচর চিকিৎসা প্রকরণে ব্যবহার হইয়া থাকে। (৭) ম্যাঙ্গানিজ, এই ধাতুটি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পাওয়া যায়। কাঁচ প্রস্তুত করিতে বিলাতে সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। আধুনিক প্রণালীতে আকর হইতে লৌহ নিষ্কাষণ কার্যেও ইহার বিশেষ আবশ্যক। (৮) নিকেল,

ইহা একটি নূতন আবিষ্কৃত ধাতু। দস্তা, তামা ও এই নিকেল একত্র গলাইয়া নকল রৌপ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাজারে ইহার নাম জার্মাণ সিলভার। ঠিক রূপার মত বাজারে যে চামচা বিক্রয় হয়, তাহা এই নকল রৌপ্য হইতে প্রস্তুত। (৯) পটাসিয়াম, একপ্রকার ক্ষার। নানা প্রকারে নানা বিষয়ে ব্যবহার হইয়া থাকে। (১০) সোডিয়াম, যাহা হইতে সোডা হয়। আপাততঃ এই দশটি ধাতুর নাম করিয়া ক্ষান্ত হইলাম আর বেশী নাম করিতে গেলে সকলে আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন, মনেও করিয়া রাখিতে পারিবেন না। কিন্তু যখন কেবল দশটির নাম করিয়াই সকলকে নিষ্কৃতি দিলাম, তখন পাঠকবর্গকে আমার নিকট ঋণী হওয়া উচিত। অর্থ দিয়া তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না, তাঁহারা যদি এই দশটি ধাতুর মূল পদার্থের নাম মনে করিয়া রাখেন, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব। পুনরায় এই দশটি নাম করিতেছি,—এলুমিনিয়ম বা ফট্‌কিরির আকর, এন্টিমনি বা সুরমার আকর, বিসমথ, ক্যাল-সিয়াম বা চুণ ও খড়ির আকর, কোবাল্ট, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, এই দশটি ছাড়া সোনা, রূপা, তামা, শিসা, লৌহ, পারা, টিন, দস্তা, এ আটটি ধাতুর নাম তো সকলে জানেন। সর্বশুদ্ধ ৪৮টি ধাতুর মধ্যে দশটি আর আটটি মিলিয়া ১৮টির নাম জানা হইল। আশা করি সকলে এই ১৮টির নাম মনে করিয়া রাখিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, যে ৬৩টি মূল বা রূঢ় পদার্থের মধ্যে ১৫টি ধাতু নহে। এই ১৫টির মধ্যে দুইটি অধিক পাওয়া যায় না, কার্যেও বড় লাগে না, তাহাদের ছাড়িয়া বাকি ১৩টির নাম করিতেছি। (১) আর্সেনিক, সখীয়া বা গোঁকো বিষ। ইহা কি তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। (২) বোরণ, ইহা হইতে সোহাগা হয়। (৩) ব্রোমীন, সমুদ্রের জল জাল দিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রোমাইড অফ পটাসিয়াম নামক মহৌষধ ইহা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মূল পদার্থ সমূহের মধ্যে কেবল দুইটি বস্তু তরলভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এক এই ব্রোমীন, দ্বিতীয়টি পারা। এতদ্ভিন্ন অপরাপর পদার্থ হয় কঠিন, না হয় বাষ্প। (৪) কার্বণ বা অঙ্গার, ইহার কথা পরে বলিব। (৫) ব্রোমীন, ইহা একপ্রকার বাষ্প এই বাষ্প ও সোডা সহযোগে লবণ হইয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ বাষ্পকে, দেখিতে পাওয়া যায় না। লবণকে রাসায়নিক উপায়ে বিয়োগ করিলে ইহা পাওয়া যায়। (৬) ফ্লুরিণ, ইহাও এক প্রকার বাষ্প, চূণের আকর প্রভৃতি পদার্থে মিশ্রিত হইয়া থাকে, সহজে

বাহির করা যায় না। (৭) হাইড্রোজেন বা জলজান, ইহার কথা পরে বলিব। (৮) আয়োডীন, সমুদ্রের উদ্ভিজ্জ শরীরে সোডা প্রভৃতি পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। ঔষধাদিতে উহা ব্যবহৃত হয়। (৯) নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান, ইহার কথা পরে বলিব। (১০) অক্সিজেন, অক্সিজেন বা অম্লজান, ইহার কথা পরে বলিব। (১১) ফসফরাস, আমাদের শরীরের নানা অংশে এই দ্রব্য বর্তমান আছে। শরীরের নানা অংশ বিশেষতঃ অস্থি ভস্ম করিয়াই ইহা সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটু ঘসিলেই ইহা হইতে অগ্নি উৎপাদন হয়। ইহার দ্বারাই বিলাতী দিয়াশলাইয়ের কাঠি প্রস্তুত হইয়া থাকে। (১২) সিলিকন বা বালুকার আকর। (১৩) গন্ধক, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বণ এই চারিটি মূল পদার্থের কেবল নাম উল্লেখ মাত্র করিয়াছি, অধিক আর কিছু বলি নাই। এই চারিটি যে কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। প্রাণী মাত্রের ইহারাই জীবন, প্রাণী মাত্রের ইহারাই দেহ, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা ভাষায় রাসায়নিক শাস্ত্রে অক্সিজেন 'অম্লজান' নামে অভিহিত হইয়াছে। কেননা দ্রব্য সমূহের সহিত অক্সিজেন মিশিয়া অম্লগুণ বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে। যত মূল পদার্থ আছে, তাহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অক্সিজেন পরিমাণে অধিক, খাঁটি অক্সিজেন একটি বাষ্প। চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। চারিদিকে যে বায়ুর ভিতর আমরা বাস করি তাহার তিন আনা অংশ অক্সিজেন। আর পৃথিবীতে যত মৃত্তিকা প্রস্তর ইত্যাদি কঠিন পদার্থ আছে, সে সমুদয়কে যদি একেবারে ওজন করি, তাহা হইলে তাহার অর্ধেক অকসিজেন। জলের প্রায় ১৫ আনা ভাগ অক্সিজেন। অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিশিয়া অক্সিজেন যখন একটি স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থ নির্মাণ করে, তখন ইহা কঠিন আকার ধারণ করে। আবার সেই যৌগিক বিয়োগ করিলেই, ইহা স্বতন্ত্র হইয়া পূর্ববৎ স্বীয় বাষ্পীয় আকারে পরিণত হয়। মৎস্য যেরূপ জলের ভিতর থাকে, সেইরূপ বায়ুর ভিতর আমরা ডুবিয়া আছি, সেই বায়ুর তিন আনা ভাগ অক্সিজেন, বাকী নাইট্রোজেন। বায়ুতে যে নাইট্রোজেন, তাহা অক্সিজেনের, সহিত এক সঙ্গে থাকে বটে, কিন্তু দুইটিতে রাসায়নিক সংযোগ হইয়া একটি স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থ ভাবে নাই। পৃথিবীতে আবার অনেক স্থানে হাইড্রোজেনের সহিত অক্সিজেন মিশিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এ মিশ্রণ অন্য

প্রকার, ইহা রাসায়নিক সংযোগ। সংযোগে একটি স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই যৌগিক পদার্থের নাম জল, যাহা আমরা পান করিয়া জীবন ধারণ করি এবং যাহা দ্বারা আমাদিগের আহারীয় শস্যাদি বর্দ্ধিত ও পরিপোষিত হয়। হাইড্রোজেনের রাসায়নিক মিলনে জল হয় বলিয়া হাইড্রোজেনের নাম জলজান। বায়ুতে থাকিয়া অক্সিজেন নানা দ্রব্যের সহিত সর্বদাই মিশিতেছে আর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত নানাভাবে সংযুক্ত হইয়া নানারূপ বিভিন্ন বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করিতেছে। যেস্থানে অক্সিজেন কোন দ্রব্যের সহিত মিশিয়া একটি স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করিতে থাকে, তখন সেখানে উত্তাপ বাহির হয়। সেই উত্তাপ কখনও অধিক হয়, কখনও কম হয়। বাহিরে একখানি লোহা পড়িয়া থাকিলে তাহার সহিত আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে অক্সিজেন মিশিয়া একটি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে, যাহাকে আমরা মরিচা বলি, তখন এত অল্পমাত্র উত্তাপ বাহির হয় যে, আমরা একেবারেই অনুভব করিতে পারি না। আবার কোন দ্রব্যের সহিত খুব শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণে অক্সিজেন মিশে, তখন উত্তাপ এত অধিক হয় যে তাহাতে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়। কাঠ ও কয়লার অধিক পরিমাণে কার্বন থাকে, বস্তুত বিশুদ্ধ কয়লাই কার্বন, তজ্জন্য কার্বনের বাংলা নাম অঙ্গার। এই কার্বনের সহিত যখন অক্সিজেন মিশিয়া একটি স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে থাকে, তখন সেই মিশ্রণ কার্যের সময় কি হয় তাহা সকলেই জানেন। কাঠ ও কয়লাস্থিত কার্বনে যে উত্তাপটুকু সঞ্চিত থাকে, তাহা বাহির হইয়া পড়ে, জলন্ত শিখা হইয়া আগুন জলিতে থাকে। কাঠ বা কয়লাস্থিত কার্বন ও বায়ুস্থিত অক্সিজেন এই দুইটি পদার্থ এইরূপে রাসায়নিক ভাবে সংযুক্ত হইয়া একটি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। সে যৌগিক পদার্থটি বাষ্প, তাহা বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়, চক্ষে দেখিতে পাই না। কাঠ ও কয়লার যা কিছু ধাতব পদার্থ আছে, তাহাই ছাই হইয়া পড়িয়া থাকে। কার্বন ও অক্সিজেন সংযোগে যে যৌগিক পদার্থটি উৎপন্ন হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়, তাহাকে কার্বনিক অম্ল বা কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাস বলে। এই বাষ্পটি ভয়ানক বিষ। যেখানে ইহা অধিক পরিমাণে আছে সেখানে কোনও প্রাণীই বাঁচিতে পারে না। নিশ্বাসের সহিত লইয়া মরিয়া যায়। কয়লায় অধিক পরিমাণে কার্বণ আছে, সুতরাং কয়লা জ্বালাইলে অধিক পরিমাণে কার্বনিক অম্ল উৎপন্ন হয়। ঘরের বাহিরে, কিম্বা যে ঘরে দ্বার জানলা খোলা আছে, এরূপ ঘরে কয়লা জ্বালাইলে

কার্বনিক অম্ল উত্থিত হইয়া বায়ুরাশির সহিত মিশিয়া যায়। তাহাতে মনুষ্য জীবনের কোন অপকার হয় না। কিন্তু ঘরের দ্বার জানলা বন্ধ করিয়া কয়লা কি গুল জ্বালাইলে, ঘরের অক্সিজেন লইয়া কার্বনিক অম্ল উৎপাদন করে। সেই বাষ্প ঘরেই রহিয়া যায়, বাহিরে যাইতে পারে না। বাহির হইতে অক্সিজেন আসিয়াও ঘরের বায়ুকে সংশোধিত করিতে পারে না। এ অবস্থায় অতীব দুর্ঘটনার আশঙ্কা। অনেকেই না জানিয়া এই বাষ্প হইতে প্রাণ হারাইয়া থাকেন। শুইবার ঘর কিংবা আতুড় ঘর উত্তপ্ত রাখিবার জন্য, দোষাদোষ না জানিয়া কেহ কেহ ঘরে কয়লা বা গুল জ্বালাইয়া, দ্বার জানলা বন্ধ করিয়া শুইতে যান। শীঘ্রই তাঁহারা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন। ইহকালে সে কালনিদ্রা আর ভঙ্গ হয় না। কখন মরিলাম, তাহা টেরও পান না। এইরূপ দুর্ঘটনার কথা প্রায়ই শুনা গিয়া থাকে। ফরাসী দেশে অনেকে এই উপায়ে আত্মহত্যা করে। এই বিষে বিষাক্ত হইয়া একবার আমিও মরিতে মরিতে রহিয়া গিয়াছি। আমার জ্বর হইয়াছিল। শীতকাল। গায়ের শীত শীত ভাব আর কিছুতেই ভাঙ্গে না। তাই ভাবিলাম, ঘরে গুলের আগুন করিয়া শুই। কার্বনিক অম্লের কথা জানিতাম। তাই বাহিরে গুল ধরাইলাম, যখন খুব ধরিয়া গুলগুলি লাল টক্‌টক্ করিতে লাগিল, তখন ঘরের ভিতর লইয়া আসিলাম, মনে করিলাম, ইহাতে আর কোন দোষ হইবে না। কিন্তু এরূপ করিয়াও ঘরের বায়ু বিলক্ষণ দূষিত হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে জ্বর হইয়াছিল। শরীরে অসুখ ছিল। তাহার জন্য একেবারে নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি নাই। খানিক রাত্রিতে শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল, মাথা আর তুলিতে পারি না। উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলেই অমনি ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাই।* অতি কষ্টে দ্বার খুলিয়া দিলাম, জানলা খুলিয়া দিলাম। বাহির হইতে অক্সিজেন আসিয়া ক্রমে ঘর হইতে কার্বনিক অম্লকে দূরীভূত করিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে তবে আমি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হইলাম। কয়েক বৎসর গত হইল। সিমলার পাহাড়ে কার্বনিক অম্লের দ্বারা একেবারে চৌদ্দজন লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। তখন আমি সিমলায় ছিলাম। শীতকাল বরফ পড়িতেছে। গাছপালা পাহাড় পর্বত সমুদায়ই বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে। ভারত সেনাপতি নেপিয়র সাহেব সেই সময় সিমলা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে তাহার কুলি ছিল। রাত্রিকালে কুলিয়া শিবিরের ভিতরে যাইত। একটি তাঁবুতে চৌদ্দজন কুলি শুইত। বড় শীত; পাহাড়ী লোক হইলে

কি হয়, গরিব মানুষ অধিক কাপড়-চোপড় তো নাই। শীতে তাহাদিগের কাজে কাজেই কষ্ট হইতেছিল। একদিন দিনমানে তাহারা কোন জমিদারের নিকট হইতে দুই ঝুড়ি কয়লা পাইয়াছিল, রাত্রিকালে তাঁবুর মাঝখানে একটি গর্ত করিয়া সেই গর্তে কিছু আগুন দিয়া তাহার উপর দুই ঝুড়ি কয়লা একেবারে ঢালিয়া দিয়াছিল। গর্তের ভিতর কয়লা পুড়িতে লাগিল। চারিদিক ঘেরিয়া কুলিরা শুইল। তাঁবুর নিম্নভাগে যে এক-আধটু ফাঁক ছিল, রাত্রিতে বরফ পড়িয়া সে ফাঁকটুকুও বুজিয়া গেল। সকাল হইলে সকলে দেখিল, ১৩ জন লোক একেবারে মরিয়া গিয়াছে, কেবল তাঁবুর দ্বারের নিকট যে লোকটি শুইয়াছিল, তাহার ঈষৎমাত্র শ্বাস বহিতেছে। কয়লার খনি জাহাজের খোল ও পুরাতন কূপেও কার্বনিক অম্লের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এবং তাহা হইতেও অনেক লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। এক বৎসর অধিক হইল, বিলাত হইতে কলিকাতায় একখানি জাহাজ আসিতেছিল। তাহাতে এই বাষ্প দ্বারা সাত আট জন লোকের মৃত্যু হয়। প্রায় দুই বৎসর হইল, চুঁচড়ার ষাঁড়েশ্বরতলায় একটি পুরাতন কূপে এইরূপে চার-পাঁচ জন লোকের মৃত্যু হয়। সেই কূপে প্রথম যে লোকটি নামিল, সে তলভাগে পৌছিতেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। উপরে যাহারা ছিল, তাহারা বুঝিতে পারিল না যে কি হইয়াছে। নীচে যে লোকটি নামিয়াছে, তার কোন সাড়া শব্দ নাই কেন? দেখিবার জন্য আর একজন লোক নামিল। নীচে না পৌছিতে সেও মূর্চ্ছিত হইল। এইরূপে একে একে তারপর যে কয়জন নামিল, সকলেরই প্রাণ নষ্ট হইল। পুরাতন কূপ, যাহা অনেক দিন ধরিয়া ব্যবহার হয় নাই, কিম্বা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নামিতে হইলে প্রজ্জলিত দীপ বা উদ্দীপ্ত বাতিতে দড়ি বাঁধিয়া তাহার ভিতর ঝুলাইয়া দিতে হয়। যদি দীপ বা বাতিটা ভিতরে গিয়াই টুপ করিয়া নিবিয়া যায়, তাহা হইলে জানিবে যে, প্রাণ প্রদীপও সেখানে টুপ করিয়া নিবিয়া যাইবে। বাতি তাহার ভিতর জলিতে থাকিলে জানিবে যে কার্বনিক অম্ল সেখানে হয় একেবারেই নাই কিংবা যৎসামান্য ভাবে আছে। অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে আছে। অক্সিজেন না থাকিলে দাহন কার্য হয় না, অক্সিজেন কোন একটি বস্তুর সহিত মিশিয়া অপর একটি যৌগিক পদার্থকে উৎপন্ন করার নামই পোড়া। উত্তাপ বাহির হওয়া সেই মিশ্রণ কার্যের লক্ষণ মাত্র। সুতরাং যেখানে অক্সিজেন নাই, সেখানে কোন বস্তু দগ্ধ হইতে পারে না, সেখানে প্রদীপ জলিতে পারে না, প্রাণাগ্নিও সেখানে নির্বাণ হইয়া যায়। তাই

অক্সিজেন প্রাণীমাত্রের জীবনস্বরূপ। এই যে আমাদের দেহে রাবণের চিতার ন্যায় আগুন, ইহা দিবা রাত্রি হু-হু করিয়া জ্বলিতেছে। আগুন নিভিলেই মৃত্যু। আমাদের খাদ্যসামগ্রী সমুদয় নাইট্রোজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিশেষরূপে এই চারিটি মূল পদার্থের সহযোগেই নির্মিত। সুতরাং আহারের সঙ্গে সর্বদাই শরীরে কার্বন প্রবেশ করিতেছে। কাঠ ও কয়লারূপে এই কার্বন জীবনাগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখিতেছে। যেমন আহারের সঙ্গে কার্বনের যোগান চাই, তবে অগ্নি জ্বলিতে থাকিবে, তেমনি অক্সিজেনের যোগান চাই, তবেই এই প্রাণ হুতাশন জ্বলিবে। পান ভোজনের সহিত যেটুকু অক্সিজেন উদরস্থ হয়, তাহাতে এ কার্য সম্পন্ন হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মৎস্য যেরূপ জলে থাকে আমরাও সেরূপ বায়ুর ভিতর ডুবিয়া আছি। বায়ুতে প্রচুর অক্সিজেন আছে। এই অক্সিজেন আমরা অহরহ নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছি। অক্সিজেন শরীরের ভিতর গিয়া কি করে? শরীরের ভিতর যে কার্বন আছে, তাহার সহিত রাসায়নিক ভাবে মিশ্রিত হয়। অক্সিজেন যখন কার্বনের সঙ্গে মিশিতে থাকে, তখন কি লক্ষণ উপস্থিত হয়? অগ্নি হয়, উত্তাপ হয়, তাহাই জীবনাগ্নি। এই মিশ্রণ কার্যের লক্ষণ অগ্নি বটেও, কার্বনে যে উত্তাপ সঞ্চিত ছিল, তাহা অক্সিজেনের সহিত মিশিবার সময় বাহির হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু কার্বন ও অক্সিজেন মিশিয়া ফল কি হইল, কি নূতন যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই দুই বস্তুর সহযোগে উৎপন্ন হয়, সেই ভয়ানক বিষময় কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাস। এই বিষময় বাষ্পটি শরীরে থাকিয়া পাছে রক্তকে দূষিত করে, তাই প্রশ্বাসের সহিত আমরা ইহাকে বাহির করিয়া দিই। সুতরাং এক ঘরে অনেক লোক শয়ন করিলে সকলে মিলিয়া অক্সিজেনটুকু টানিয়া লন, কার্বনিক অম্ল প্রশ্বাসের সহিত ছাড়িয়া ঘরটি তাহাতেই পরিপূর্ণ করেন। কাজেই ঘরে কয়লা জ্বালাইয়া শয়ন করাও যা, আর একঘরে অনেক লোক শোয়াও তা। ইহাতে পীড়া হইবার কেন সম্ভাবনা, তাহা বুঝিলেন তো? আচ্ছা, এই যে অসংখ্য জীব-জন্তু, অসংখ্য মনুষ্য কাল-কালান্তর হইতে অহোরাত্র অবিরত প্রশ্বাসের সহিত কার্বনিক অম্ল বাহির করিয়া দিতেছে, সে কার্বনিক অম্ল কোথায় যায়? পৃথিবী কেন তাহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া যায় না? তা যদি যাইত, তাহা হইলে এই ধরাধামে আজ একটি প্রাণীও জীবিত থাকিত না। ঈশ্বরের আশ্চর্য কৌশল শুন। আমরা যেমন নিঃশ্বাসে অক্সিজেন লই, প্রশ্বাসে কার্বনিক অম্ল ত্যাগ করি, গাছেরা তাহার ঠিক বিপরীত করে, তাহারা

কি হয়, গরিব মানুষ অধিক কাপড়-চোপড় তো নাই। শীতে তাহাদিগের কাজে কাজেই কষ্ট হইতেছিল। একদিন দিনমানে তাহারা কোন জমিদারের নিকট হইতে দুই ঝুড়ি কয়লা পাইয়াছিল, রাত্রিকালে তাঁবুর মাঝখানে একটি গর্ত করিয়া সেই গর্তে কিছু আগুন দিয়া তাহার উপর দুই ঝুড়ি কয়লা একেবারে ঢালিয়া দিয়াছিল। গর্তের ভিতর কয়লা পুড়িতে লাগিল। চারিদিক ঘেরিয়া কুলিরা শুইল। তাঁবুর নিম্নভাগে যে এক-আধটু ফাঁক ছিল, রাত্রিতে বরফ পড়িয়া সে ফাঁকটুকুও বুজিয়া গেল। সকাল হইলে সকলে দেখিল, ১৩ জন লোক একেবারে মরিয়া গিয়াছে, কেবল তাঁবুর দ্বারের নিকট যে লোকটি শুইয়াছিল, তাহার ঈষৎমাত্র শ্বাস বহিতেছে। কয়লার খনি জাহাজের খোল ও পুরাতন কূপেও কার্বনিক অম্লের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এবং তাহা হইতেও অনেক লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। এক বৎসর অধিক হইল, বিলাত হইতে কলিকাতায় একখানি জাহাজ আসিতেছিল। তাহাতে এই বাষ্প দ্বারা সাত আট জন লোকের মৃত্যু হয়। প্রায় দুই বৎসর হইল, চুঁচড়ার ষাঁড়েশ্বর-তলায় একটি পুরাতন কূপে এইরূপে চার-পাঁচ জন লোকের মৃত্যু হয়। সেই কূপে প্রথম যে লোকটি নামিল, সে তলভাগে পৌঁছিতেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। উপরে যাহারা ছিল, তাহারা বুঝিতে পারিল না যে কি হইয়াছে। নীচে যে লোকটি নামিয়াছে, তার কোন সাড়া শব্দ নাই কেন? দেখিবার জন্য আর একজন লোক নামিল। নীচে না পৌঁছিতে সেও মূর্চ্ছিত হইল। এইরূপে একে একে তারপর যে কয়জন নামিল, সকলেরই প্রাণ নষ্ট হইল। পুরাতন কূপ, যাহা অনেক দিন ধরিয়া ব্যবহার হয় নাই, কিম্বা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নামিতে হইলে প্রজ্বলিত দীপ বা উদ্দীপ্ত বাতিতে দড়ি বাঁধিয়া তাহার ভিতর ঝুলাইয়া দিতে হয়। যদি দীপ বা বাতিটা ভিতরে গিয়াই টুপ করিয়া নিবিয়া যায়, তাহা হইলে জানিবে যে, প্রাণ প্রদীপও সেখানে টুপ করিয়া নিবিয়া যাইবে। বাতি তাহার ভিতর জ্বলিতে থাকিলে জানিবে যে কার্বনিক অম্ল সেখানে হয় একেবারেই নাই কিংবা যৎসামান্য ভাবে আছে। অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে আছে। অক্সিজেন না থাকিলে দাহন কার্য হয় না, অক্সিজেন কোন একটি বস্তুর সহিত মিশিয়া অপর একটি যৌগিক পদার্থকে উৎপন্ন করার নামই পোড়া। উত্তাপ বাহির হওয়া সেই মিশ্রণ কার্যের লক্ষণ মাত্র। সুতরাং যেখানে অক্সিজেন নাই, সেখানে কোন বস্তু দগ্ধ হইতে পারে না, সেখানে প্রদীপ জ্বলিতে পারে না, প্রাণাগ্নিও সেখানে নির্বাণ হইয়া যায়। তাই

অক্সিজেন প্রাণীমাত্রের জীবনস্বরূপ। এই যে আমাদের দেহে রাবণের চিতার ন্যায় আগুন, ইহা দিবা রাত্রি হু-হু করিয়া জলিতেছে। আগুন নিভিলেই মৃত্যু। আমাদের খাদ্যসামগ্রী সমুদয় নাইট্রোজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিশেষরূপে এই চারিটি মূল পদার্থের সহযোগেই নির্মিত। সুতরাং আহারের সঙ্গে সর্বদাই শরীরে কার্বন প্রবেশ করিতেছে। কাঠ ও কয়লারূপে এই কার্বন জীবনাগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখিতেছে। যেমন আহারের সঙ্গে কার্বনের যোগান চাই, তবে অগ্নি জলিতে থাকিবে, তেমনি অক্সিজেনের যোগান চাই, তবেই এই প্রাণ হুতাশন জলিবে। পান ভোজনের সহিত যেটুকু অক্সিজেন উদরস্থ হয়, তাহাতে এ কার্য সম্পন্ন হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মৎস্য যেরূপ জলে থাকে আমরাও সেরূপ বায়ুর ভিতর ডুবিয়া আছি। বায়ুতে প্রচুর অক্সিজেন আছে। এই অক্সিজেন আমরা অহরহ নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছি। অক্সিজেন শরীরের ভিতর গিয়া কি করে? শরীরের ভিতর যে কার্বন আছে, তাহার সহিত রাসায়নিক ভাবে মিশ্রিত হয়। অক্সিজেন যখন কার্বনের সঙ্গে মিশিতে থাকে, তখন কি লক্ষণ উপস্থিত হয়? অগ্নি হয়, উত্তাপ হয়, তাহাই জীবনাগ্নি। এই মিশ্রণ কার্যের লক্ষণ অগ্নি বটেও, কার্বনে যে উত্তাপ সঞ্চিত ছিল, তাহা অক্সিজেনের সহিত মিশিবার সময় বাহির হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু কার্বন ও অক্সিজেন মিশিয়া ফল কি হইল, কি নূতন যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই দুই বস্তুর সহযোগে উৎপন্ন হয়, সেই ভয়ানক বিষময় কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাস। এই বিষময় বাষ্পটি শরীরে থাকিয়া পাছে রক্তকে দূষিত করে, তাই প্রশ্বাসের সহিত আমরা ইহাকে বাহির করিয়া দিই। সুতরাং এক ঘরে অনেক লোক শয়ন করিলে সকলে মিলিয়া অক্সিজেনটুকু টানিয়া লন, কার্বনিক অম্ল প্রশ্বাসের সহিত ছাড়িয়া ঘরটি তাহাতেই পরিপূর্ণ করেন। কাজেই ঘরে কয়লা জ্বালাইয়া শয়ন করাও যা, আর একঘরে অনেক লোক শোয়াও তা। ইহাতে পীড়া হইবার কেন সম্ভাবনা, তাহা বুঝিলেন তো? আচ্ছা, এই যে অসংখ্যা জীব-জন্তু, অসংখ্য মনুষ্য কাল-কালান্তর হইতে অহোরাত্র অবিরত প্রশ্বাসের সহিত কার্বনিক অম্ল বাহির করিয়া দিতেছে, সে কার্বনিক অম্ল কোথায় যায়? পৃথিবী কেন তাহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া যায় না? তা যদি যাইত, তাহা হইলে এই ধরাধামে আজ একটি প্রাণীও জীবিত থাকিত না। ঈশ্বরের আশ্চর্য কৌশল শুন। আমরা যেমন নিঃশ্বাসে অক্সিজেন লই, প্রশ্বাসে কার্বনিক অম্ল ত্যাগ করি, গাছেরা তাহার ঠিক বিপরীত করে, তাহারা

নিশ্বাসে কার্বনিক অম্ল লয়, প্রশ্বাসে অক্সিজেন ত্যাগ করে। গাছেদের তো নাক নাই, তবে কি করিয়া তাহারা নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য সমাধা হয়। সুতরাং আমরা যে কার্বনিক প্রশ্বাসের সহিত ত্যাগ করি, যাহা বায়ুতে মিলিয়া যায়, গাছেরা তাহা নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করে। মনে আছে তো,—কার্বনিক অম্ল একটি যৌগিক পদার্থ। মূল পদার্থ নয়, ইহা কার্বন ও অক্সিজেন সহযোগে হইয়াছে। গাছেরা এই বাষ্পকে নিশ্বাসের সহিত লইয়া সূর্যালোকের সহায়তায় কার্বনকে একদিকে আর অক্সিজেনকে একদিকে পৃথক করিয়া ফেলে। কার্বনটুকু লইয়া ছাল কাঠ করিয়া আপনার দেহ পরিবর্ধন করে, আর অক্সিজেনটুকু ছাড়িয়া দেয়। একদিকে জীবজন্তু, অপরদিকে উদ্ভিজ্জ, এই দুইদলে ক্রমাগত এইরূপে কার্বন ও অক্সিজেনের বিনিময় চলিতেছে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উদ্ভিজ্জ শরীর হইতে অন্ধকারে অক্সিজেন বাহির হয় না। অন্ধকারে কার্বনিক অম্ল বাহির হয়। সুতরাং রাত্রিকালে শুইবার ঘরে অধিক ফলফুল পাতা রাখা ভাল নয়। বিলাতে দুই একজন কমলালেবু ব্যবসায়ীর এইরূপে মৃত্যু হইতে শুনিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি। যেখানে অক্সিজেন নাই, সেখানে অগ্নি জ্বলিতে পারে না। আবার যদি খাঁটি অক্সিজেনের ভিতর কোন দ্রব্য দগ্ধ করা যায়, তাহা হইলে অতি সত্বর হু-হু করিয়া সেই দ্রব্যটি পুড়িয়া যায়। বিশুদ্ধ অক্সিজেনের ভিতর থাকিলে, খাঁটি অক্সিজেনের নিশ্বাস লইলে, পাছে আমাদের এই প্রাণাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া সত্বর আমরা পুড়িয়া মরি, তাই যে বায়ুর ভিতর আমরা ডুবিয়া আছি, তাহা শুধু অক্সিজেন নয়, অক্সিজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেন নামক বাষ্প আমাদিগের এই বায়ুতে বিস্তার রহিয়াছে। এই নাইট্রোজেন একটি মূল পদার্থ, ইহা হইতে সোরা, নিষাদল প্রভৃতি বস্তু সমূহ উৎপন্ন হয়। সেইজন্য ইহার নাম যবক্ষারজান।

এতক্ষণ ধরিয়া বড়ই নীরস বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল। কিন্তু কি করি, আজকালের যে কোনও ব্যবসার কথা বলিতে যাইব, তাহাতেই এই অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন প্রভৃতি পদার্থের, বিয়োগ সংযোগ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম ব্যবহার। একেত জ্ঞান উপার্জন করাই কঠিন, তাতে আবার সেই জ্ঞান, পার্থিব পদার্থে প্রযুক্ত হইয়া কিরূপে অর্থ উপার্জিত হয়, তাহা বুঝাইতে হইবে। ইংরেজেরা ছাই মুঠাটা ধরিয়া কিরূপে সোনা মুঠাটা করেন, তাহা বলিতে হইবে। কাজেই এ ভাবের প্রস্তাব আগাগোড়া গালগল্পের মত হইতে

পারে না। প্রকৃত পক্ষেই সাহেবেরা ছাই-মুঠাটা ধরিয়া সোনা মুঠাটা করিয়া থাকেন। সেখানে বামা ও নণ্ডুরাম পাথর হইতে লোহা বাহির করে, সেখান হইতে কেবল মাটি কাটিয়া কলিকাতায় আনিতে যা খরচ পড়ে, বিলাত হইতে ইংরাজেরা লোহা আনিয়া আমাদিগকে সেই দামে বিক্রয় করিয়া থাকেন। তাতে আর বামার ঘরে অন্ন থাকিবে কি? বামার ছেলেপিলে কেননা পেটের জ্বালায় পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে? কিন্তু দোষ কার? বামার দোষ নয়, নণ্ডুরামেরও দোষ নয়। আহা। ইহারা কি জানে, দোষ আমার ও আমার স্বজাতি ব্রাহ্মণ বর্ণের। সেই না আমরা, যাহারা নানাশাস্ত্র রচনা করিয়া জগৎকে একদিন শিক্ষা দিয়াছিলাম, বড় কথা দূরে থাকুক। ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি অতি সামান্য কয়টি অঙ্ক রচনা করিয়াছিলাম, তাহাতেই আজ জগৎ চলিতেছে। আজও জগতের লোক সেই অঙ্ক সন্নিবেশ প্রণালীর চাতুর্য দেখিয়া চমকিত হইতেছে। বীজগণিত প্রভৃতি উচ্চশাস্ত্রের কথায় আর কাজ কি? কিন্তু আজ আমাদের পানে একবার চাহিয়া দেখ। জগতের শিক্ষাদাতা, জগতের পূজ্য না হইয়া, আমরা সেদিন হইলাম "কাফের", আবার আজ হইয়াছি 'নিগার'। কেন বল দেখি? একটি বিশেষ কারণ এই, আমরা "ক্ষিত্যাপ তেজো মরুদ্ব্যোম" বলিয়া বসিয়া রহিলাম। কালে 'ক' অক্ষর এদেশে অখাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইল, পূর্বার্জিত ধন একে একে সকলই গালে দিলাম, হায়। আমাদের যাহা কিছু ছিল, ক্রমে সকলই লোপ হইল। কিন্তু অন্যান্য জাতিরা এই ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নানা অপূর্ব শাস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন, নানা অপূর্ব পদার্থের রচনা করিলেন, আর এই বিশ্বসংসার নিহিত ভীষণ আসুরিক বল-সমূহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। তাই আজ তুরস্ক আরব্য, পারস্য, গান্ধার, ভারত, শ্যাম, চীন, মহাচীন, সমস্ত পৃথিবী, এই যশঃ-প্রদায়িনী, ধনপ্রদায়িনী, বলপ্রদায়িনী, বিদ্যার নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। এই মহাবিদ্যা তোমারও নন, আমারও নন। "গোদাবাড়ি ছাঁদনদাড়ী, তুমি কার? না, যখন যার কাছে থাকি, তখন তার।" যাঁহার হৃদয়ে এক্ষণে এই মহাবিদ্যা বিরাজ করিতেছেন, আজ তিনি বিপুল বলশালী, তাঁরই ঘর ধনধান্যে উচ্ছলিত, ধরাধামের তিনিই অধীশ্বর। আর তাঁর কাছে ব্রাহ্মণ বল, শূদ্র বল, সকলেই গলবস্ত্র। মনের কালী যায়, চক্ষের জল মুছিয়া হাসি,—যদি এই মহাবিদ্যাকে আনিয়া সতীহারা শিবসদৃশ উদাসীন ছন্নছাড়া পিতৃভূমি জন্মভূমিকে ফিরিয়া দিতে পারি। সকলে এস ভাই সেই মহাবিদ্যার অন্বেষণ করি। যেখানে পাই তাঁকে সেইখানে থেকে ধরিয়া আনি।

লোহার বিষয় এখনও কিছুই হয় নাই, সূচনা হইয়া রহিল, বাকি পরে বলিব।

(৮) পাপের পরিণামে (উপন্যাস) ১৩১৫ সাল (২০শে সেপ্টেম্বর ১৯০৮)

(৯) ডমরু চরিত (গল্প) ইংরাজী ১৯১৩, ১০ই আগস্ট।

ত্রৈলোক্যনাথ বিজ্ঞানবোধ (ইং ১৮৯৬) নীতি শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, প্রভৃতি কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তকও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথের কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তক আছে, তন্মধ্যে এই কয়খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(1) A descriptive catalogne of Indian Products contributes to the Amsterdam Exhibition 1883.Cal, 1883, P. 190.

(2) A Hand-Book of Indian Products (Art Manufacturers and Raw Materials) Cal, 1883. P. 175.

(3) A list of Indian Economic Products compiled from the catalogue of Economic Products of Indian, Exhibited in the Economic Court, Calcutta International Exhibition, 1883—84. Cal, 1884, P. 93.

(4) Art manufacturers of India (specially complied from the Glasgow International Exhibition 1888) Cal 1888. P. 45

(5) A visit to Europe (with a preface by N. N. Ghose, Bar-At-Law) Cal 1889 P 404.

নির্ঘণ্ট